

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমার জীবনানন্দ
আবিক্ষার ও জন্যন্দ



আমার জীবনানন্দ আবিষ্কার ও অন্যান্য

বে -কোনও ধরনের গদ্যরচনায় সুনীল
গঙ্গোপাধ্যায় পাঠককে মায়ামুক্তি করে
রাখতে পারেন। তাঁর উপন্যাস ও গল্পের আশ্চর্য
নির্মিতি সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই।
বিপুল পরিমাণ কথাসাহিত্য ছাড়াও তিনি এ যাবৎ
যেসব অজস্র প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন, সেগুলিও
এক-একটি আশ্চর্য সৃষ্টি। বিভিন্ন সময়ে লেখা,
বিভিন্ন বিষয়ের সেইসব রচনা নামী-অনামী
পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।
অগ্রস্থিত এইসব লেখা থেকে বাহাই করে বক্তৃশাস্তি
ছোট-বড় রচনা সংকলিত হয়েছে এই প্রাষ্ঠে।
রচনাগুলি মূলত বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত
কিংবা বিস্ময় শ্রষ্টা ও তাঁদের সৃষ্টি সম্পর্কে
লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতির বাণীরূপ।
অন্তরঙ্গ স্মৃতির ছৈয়ায় প্রতিটি রচনা প্রাণবন্ত।
স্বচ্ছ অন্যায়স গদ্যের নিবিড় স্পর্শে আদ্যস্ত
সুখপাঠ্য। একই সঙ্গে আবার বহু অজ্ঞান
স্মৃতিরসের ঝলকে উজ্জ্বলিত। জীবনানন্দ দাশ,
বুদ্ধদেব বসু, সতীনাথ ভাদুড়ী, কমলকুমার
মজুমদার, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিভূতিভূষণ
বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সৈয়দ মুজতবা আলী,
শিবরাম চক্রবর্তী, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, জ্যোতিরিণ্ড্র
নন্দী, কাঞ্জী নজরুল ইসলাম, জগদীশ শুণ্ঠ, শান্তি
চট্টোপাধ্যায়, আবু সয়দ আইয়ুব প্রযুক্ত আরও
অনেকের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা, সম্মান, প্রীতি,
ভালুলাগা এবং ভালবাসার অকৃত্রিম আত্মকথন
ধরা রইল এই ভিস্ময়াদের প্রাষ্ঠে।

আমার জীবনানন্দ আবিষ্কার ও অন্যান্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়





সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ২১ ডাক্ট ১৩৪১ (৭
সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪), ফরিদপুর, বাংলাদেশ।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ। টিউশনি দিয়ে
কর্মজীবনের শুরু। তারপর নানা অভিজ্ঞতা।
বর্তমানে আনন্দবাজার সংস্থার ‘দেশ’ পত্রিকার
সঙ্গে যুক্ত।

শখ : ভ্রমণ। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেছেন।
‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।
প্রথম উপন্যাস : ‘আত্মপ্রকাশ’। শারদীয় ‘দেশ’
পত্রিকায় প্রকাশিত।
প্রথম কাব্যগ্রন্থ : ‘একা এবং কয়েকজন’। ঠিক
এই নামেই তিনি পরে একটি উপন্যাস
লিখেছেন।

ছোটদের মহলেও সমান জনপ্রিয়তা। প্রথম
কিশোর উপন্যাস—‘ভয়ংকর সুন্দর’। ছয়নাম
'নীললোহিত'। আরও দুটি ছয়নাম—‘সনাতন
পাঠক’ এবং ‘নীল উপাধ্যায়’।

আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন বহু আগে।
১৯৮৩-তে পান বকিম পুরস্কার। সাহিত্য
আকাদেমি পুরস্কার, ১৯৮৫-তে।
একাধিক কাহিনী চলচিত্রে, বেতারে ও টিভির
পর্দায় রূপায়িত ও পৃথিবীর নানা ভাষায়
অনুদিত।

প্রয়াণ: ২৩ অক্টোবর ২০১২

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৯
চতুর্থ মুদ্রণ আগস্ট ২০১৩

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্ত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপার্যের (আফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুৎপাদনের সূর্যোগ সংবলিত তথ্য-সমষ্টি করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত সজ্ঞিহত হলে উপরুক্ত আইনি ব্যবস্থা প্রাপ্ত করা যাবে।

ISBN 81-7215-960-9

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মির কর্তৃক প্রকাশিত এবং
ক্রিয়েশন ২৪বি/১বি, ড. সুরেশ সরকার গ্রোড
কলকাতা ৭০০০১৪ থেকে মুদ্রিত।

AMAR JIBANANANDA ABISHKAR O ANYANYO

[Essay]

by

Sunil Gangopadhyay

Published by Ananda Publishers Private Limited

45, Beniatala Lane, Calcutta-700009

নিবেদিতা রায় ও
অমিতাভ রায়-কে

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের

অন্যান্য বই

•

অর্ধেক জীবন

ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ

ছবির দেশে কবিতার দেশ

ভূমিকা

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে আমি অনেক আলোচনা ও প্রবন্ধ লিখেছি, তার বেশিরভাগই অগ্রস্থিত হয়ে আছে। এই গ্রন্থে শুধু নানান লেখকদের সম্পর্কে রচনাগুলিই সংকলিত হয়েছে। তবে সেই সব লেখকদের সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টির বিশ্লেষণ এসব লেখায় নেই, সে কাজ আমার নয়। আমার রচনাগুলি কিছুটা স্মৃতিমূলক এবং আলোচ্য লেখক ও তাঁদের কিছু কিছু লেখা সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রতিফলন। একই লেখককে নিয়ে বিভিন্ন উপলক্ষে একাধিকবার লিখেছি, যেমন জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, কমলকুমার মজুমদার, সমরেশ বসু বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সেইজন্য কিছু কিছু পুরুষকে থেকে গেছে, সেগুলি বাদ দিইনি, কেননা উক্ত লেখকদের সম্পর্কে ঐ কথাগুলিই হয়তো আমি জোর দিয়ে বলতে চাই।

রচনাগুলি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত, শুধু জগদীশ গুপ্ত-সতীনাথ-কমলকুমার-এর ছোটগল্প বিষয়ক দীর্ঘ প্রবন্ধটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি স্মারক বক্তৃতা উপলক্ষে রচিত। নজরুল সম্পর্কে ক্ষুদ্র রচনাটি একেবারে শেষে স্থান দিয়েছি বিশেষ কারণে। এটি প্রবন্ধ বা আলোচনা বা স্মৃতিকথা, কিছুই নয়, অন্য লেখাগুলির সঙ্গে কোনও মিলই নেই, উক্ত ধরনের রহ্যরচনা বলা যেতে পারে, যাটোর দশকে নজরুলের জীবদ্ধশায় লিখেছিলাম। রচনাটি হারিয়ে যেতে দিতে চাই না বলেই এই বইতে যুক্ত রইল।

সূচিপত্র

- আমার জীবনানন্দ আবিষ্কার ১১
প্রজ্ঞলস্ত সৃষ্টি এবং সাতটি তারার তিমির ২০
ধানসিডি নদীর সঙ্ঘানে ৩০
নতুন করে দেখা ৩৯
কাব্যসংগ্রহের ভূমিকা ৪৭
আমাদের ঝণ ৫০
বুদ্ধদেব বসু ৫৫
টুকরো টুকরো স্মৃতি ৫৭
বুদ্ধদেব বসুর জীবনাবসান ৬৩
একশ পঁচিশ বছরের রবীন্দ্রনাথ ৬৭
আধুনিকতা ও আইয়ুব ৭৫
বিভূতিভূষণ ও বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা ৭৯
সুধীন্দ্রনাথের ‘দৃঃসময়’ ৮৫
প্রেমেন্দা ৯০
সৈয়দ-দা ৯৬
সবার যিনি এক বয়েসি ৯৯
বাংলা ছোটগঞ্জের তিন দিকপাল ১০২
পূর্ণিয়া জেলার উইলিয়াম ফ্রেন্সেন্স ১৩০
দৈত্যকাহিনী ১৩৪
বিশ্বৃত লেখক ১৪৯
জ্যোতিরিঙ্গ নন্দী ১৫২
বৈঠকী মেজাজের এক উপেক্ষিত সাহিত্যিক ১৫৮
আমার মাস্টারমশাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৬৭
অ্যালেন গিন্সবার্গের কবিতা এবং কলকাতা ১৭২
সমরেশদা ১৮০
সমরেশ ছিলেন আসক্ত, রসিক, আবার উদাসীন, সম্ম্যাসীও ১৮৮
শক্তির সঙ্গে একটি দিন ১৯২
চিলার ওপর থেকে শক্তিকে ডানা মেলে উড়তে দেখেছি ২০৭
শক্তির কবিতা ২০৯
খেলাচ্ছলে দিনগুলি ২১১
যদি ২১৪

আমার জীবনানন্দ আবিষ্কার

আমার স্কুল জীবনে জীবনানন্দ দাশ নামে কোনও কবির রচনা পাঠ দূরে থাক, নামও শুনিনি। আমার কৈশোর ছিল প্রধানত গদ্যবিহারী, তার কারণও ছিল। পড়ার ক্ষুধা ছিল প্রবল। কিন্তু বই কেনার ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং অতিমাত্রায় লাইব্রেরি-নির্ভর। তখনকার অধিকাংশ লাইব্রেরিতেই কবিতার বই রাখার রেওয়াজ ছিল না। নিতান্ত নিয়মরক্ষার জন্য দুচারজন কবিকে স্থান দেওয়া হলেও সেই সব কবির মধ্যে নজরুল ইসলামই ছিলেন কনিষ্ঠতম। জীবনানন্দ দাশ নজরুলের সমবয়স্ক হলেও তখন প্রায় অজ্ঞাত।

আমাদের পরিবারে কবিতার কোনও আবহাওয়া ছিল না। সদ্য দেশবিভাগে বিপর্যস্ত শুধুমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তায় বাবা-জ্যাঠারা সব সময় ব্যতিব্যস্ত। এর মধ্যে কবিতার স্থান হবে কী করে? অল্পচিন্তা চমৎকারা কা তরে কবিতা রূপঃ। আমার বাবার সংগ্রহে কয়েকখানি ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ ছিল, (তার মধ্যে টেনিসনের কাব্যসংগ্রহ অন্যতম, যে বইটি আমাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়েছে একসময়) তিনি বাংলা কবিতার ধার ধারতেন না। অন্য বইও পড়ার সময় পেতেন না বিশেষ। একমাত্র আমার মায়ের ছিল গঞ্জের বই পড়ার নেশা। তাঁর জন্য পাড়ার লাইব্রেরি থেকে প্রায় প্রতিদিন দু'খানি করে গল্প-উপন্যাস আমাকেই এনে দিতে হত। আমাদের স্কুলে যে ছেট লাইব্রেরিটি ছিল তার সমস্ত শিশু-কিশোর-পাঠ্য বই ততদিনে আমি একাধিকবার পড়ে শেষ করে ফেলেছি। তখনও খিদে লকলক করছে, তাই মায়ের জন্য আনা বইগুলিও পড়তে শুরু করি। ছেট বয়েসেই বড়দের বই পড়তে কোনও অসুবিধে বোধ করিনি, বরং যেন নিষিদ্ধ গোপন আনন্দের স্বাদ পাই। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ফালুনী মুখোপাধ্যায় থেকে প্রবোধকুমার সান্যাল পর্যন্ত কোনও লেখককেই বাদ দিইনি। স্কুলজীবন শেষ করার আগেই আমি বুদ্ধদেব বসুর অনেকগুলি উপন্যাস পড়ে ফেলেছি। কিন্তু তিনি যে প্রধানত একজন কবি, তা আমাকে বলে দেয়নি কেউ।

অবশ্য একেবারে কবিতা-বর্জিত ছিল না সে বয়েস। শৈশবে একজন মাস্টারমশাই কেন যেন মনে করেছিলেন, আমার মধ্যে এক আবৃত্তিকার হয়ে উঠার সম্ভাবনা আছে। তিনি ছিলেন নজরুলের ভক্ত, প্রায় জোর করেই নজরুলের বেশ কয়েকটা কবিতা মুখস্থ করিয়েছিলেন আমাকে দিয়ে। বিভিন্ন পাড়ায় জলসায় তিনি আমাকে মধ্যে উপস্থিত করাতেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আবৃত্তিকার হিসেবে আমার বেশ খ্যাতি হয়েছিল। দু'একটা মেডেল টেডেলও পেয়েছিলাম। তা আমার প্রতিভার গুণে নয়, শিশুশিল্পী হিসেবে। মধ্যে দাঁড়িয়ে একটা 'আট-ন'-বছরের গুটগুটে ছেলে হাত-পা ছাঁড়ে লম্বা লম্বা কবিতা মুখস্থ বলে যাচ্ছে, এতেই শ্রোতারা হাততালি দিত।

দু'এক বছরের মধ্যেই ও ব্যাপারে আমার উৎসাহ চলে যায়। সেই মাস্টারমশাই ডাকতে এলে ছাদে জলের ট্যাঙ্কের পাশে লুকিয়ে থাকতাম। শৈশব থেকে কৈশোরে উন্নীর্ণ হতেই দারুণ লাজুকতা আমাকে পেয়ে বসে। আজ্ঞায়স্বজনদের বাড়িতে নেমন্তন্ত্র খেতে গেলে কোথাও কোনও বই আছে কিনা খুঁজে নিয়ে সেই বইতে বিভোর হয়ে বসে থাকতাম এক কোণে। সেই রকমই কোনও একটা বাড়িতে পেয়ে যাই রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা'। স্কুলে প্রত্যেক বছরই পাঠ্যবইতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা থাকত কয়েকটি, তার বাইরের রবীন্দ্র-পাঠ সেই আমার প্রথম, তখন খুব সন্তুষ্ট আমার ক্লাস এইট-বয়েস। কেন যে সঞ্চয়িতাকে প্রথমেই অত ভাল লেগে গেল জানি না। মনে হল, এ একটা মণি-মাণিক্যের খনি। এই বই আমার চাই-ই চাই। সাত-আট টাকা দিয়ে বই কেনার সাধ্য আমার ছিল না। হাতখরচ পেতাম মাত্র চার পয়সা।

চুরি করে কিংবা কারও কাছ থেকে ফেরত দেব বলে নিয়ে এসে না দিয়ে কিংবা যে প্রকারেই হোক সঞ্চয়িতা একটি সংগ্রহ করেছিলাম ঠিকই। তারপর পাগলের মতন কবিতাগুলি মুখস্থ করতে শুরু করি। পুরো সঞ্চয়িতাই আমার অনেকদিন মুখস্থ ছিল। অতখানি রবীন্দ্র-আসন্তির অন্য একটি কারণও ছিল। পরের বছর যে কিশোরীটির সঙ্গে আমার প্রণয়স্থ হয়, সে ছিল খুবই রবীন্দ্র-অনুরাগিণী। কথায় কথায় বা চিঠিতে সে প্রচুর রবীন্দ্রনাথের কবিতার উদ্ধৃতি দিত, তার উদ্ধৃতির পরের লাইনগুলি বলে দিতে পেরে আমি পৌরুষের হাতাবোধ করতাম।

স্কুলে আমার সহপাঠী দীপক মজুমদার সমস্তিজ্জগৎ সম্পর্কে আমার চেয়ে অনেক বেশি অবহিত ছিল। আমি যাদের ছিলি না এমন লেখক, যেমন জগদীশ শুণ্ঠ, গোপাল হালদার, ধূর্জিপ্রিসাদ মুখ্যোধ্যায়ের নামও তার মুখে আমি শুনেছি। (দীপকও এরকম আরও অনেক সীমাই ভাল জানত, বই বিশেষ পড়ত না) কিন্তু জীবনানন্দ দাশের কথা সে কখনও বলেনি। আধুনিক কবিতা ব্যাপারটাই যেন ছিল কোনও গোপন সম্প্রদায়ের নিজস্ব সাংকেতিক প্রচার-পত্রের মতন। অধিকাংশ বাঙালি পাঠকের কাছে ঠাট্টা- তামাশার বিষয়। কলেজে এসেও কিছু কিছু ছাত্রের কাছে বুদ্ধিদেব বসু বা বিষ্ণু দে-র কথা শুনেছি, জীবনানন্দের নাম সেই তুলনায় কম উচ্চারিত। অধ্যাপকরা আধুনিক কবিতা বিষয়ে মশকরা করার সময় জীবনানন্দ দাশ নামে এক কবির দু'এক লাইন উদ্ধৃতি দিতেন। এমনকী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতন তৎকালে অত জনপ্রিয় লেখক এবং অধ্যাপকও 'সুরঙ্গা, তোমার হৃদয় আজ ঘাস', এই উদ্ধৃতি দিয়ে ছাত্রদের হাসাতেন খুব।

সেই ১৯৫১-'৫২ সালে জীবনানন্দ দাশ থাকেন কলকাতার বাইরে, খড়গপুরের কলেজের একজন লেকচারার। তাঁর বইগুলি প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। সাকুল্যে বই বেরিয়েছে মাত্র পাঁচটি (তার মধ্যে একটি ঘোলো পৃষ্ঠার), সেই সময় 'ঝরা পালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী' এর কোনওটিই ছাপা নেই, শুধু পাওয়া যায় 'সাতটি তারার তিমির'। অর্থাৎ তিনি একখানি বইয়ের কবি।

জীবনানন্দের কবিতাকে প্রথম প্রকৃত মর্যাদা দেয় সিগনেট প্রেস। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই, সিগনেট প্রেসের কর্তৃতার দিলীপকুমার শুণ্ঠ বাংলা

কবিতার জন্য যেসব অসাধারণ কাজ করেছেন, তার ইতিহাস একদিন লেখা হবে নিশ্চিত। সেই সময়ের শিশুরা সুকুমার' রায়ের কবিতাও পড়ত না, তার কারণ, সুকুমার রায়ের কোনও বই-ই পাওয়া যেত না, কোনও প্রকাশক পুনর্মুদ্রণের কথা চিন্তাও করেননি। সিগনেট প্রেস থেকে 'আবোল-তাবোল'-এর নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হবার পরেই সুকুমার রায় প্রত্যেক বাংলাভাষীর অবশ্যপাঠ্য। সুকুমার রায়ের অগ্রস্থিত কবিতাগুলি নিয়ে প্রকাশিত হল তাঁর নতুন বই 'খাই খাই'। সেইসঙ্গে 'পাগলা দাণ' ও নাটকগুলি। উপেক্ষকিশোর রায়চৌধুরীও এইভাবে পুনরাবিস্থৃত হন।

ছাতবয়েসে দিলীপকুমার গুপ্তর গৃহশিক্ষক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। এই শিক্ষক পাওয়া ক'জন ছাত্রের ভাগ্যে ঘটে? সেইজন্যই দিলীপকুমার গুপ্তর, সংক্ষেপে যাঁকে ডি-কে বলে সবাই ডাকত, তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে উচ্চরুচি ছিল। বিশেষ ভালবাসতেন কবিতা, আধুনিক কবিতাকে সমস্মানে পাঠকদের কাছে পৌছে দেবার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা নিয়েছিলেন তিনি।

বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে কিছু কিছু কবিতার বইও প্রকাশ করতেন তাঁর সমসাময়িক কবিদের। মাত্র ঘোলো পৃষ্ঠার চাটি বই, দাম চার আনা বা ঘোলো পয়সা। অর্থাৎ এক পাতার দাম এক পয়সা, সেইজন্যই সিরিজটির নাম 'এক পয়সায় একটি'। সেইভাবে বেরিয়েছিল জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন'। ছিল মাত্র ১২টি কবিতা। ছাপা বাঁধাই কিছুই ভাল নয়। স্মারীতি কিছুদিনের মধ্যেই সে বই অবলুপ্ত হয়ে যায়। ডি-কে সেই বইটি খুঁজে বাঁধ করে তার সঙ্গে আরও ১৮টি কবিতা জুড়ে, অসাধারণ মুদ্রণ-সৌকর্যে, সত্যাঙ্গে রায়-কৃত প্রচ্ছদপটে প্রকাশ করলেন 'বনলতা সেন'-এর নতুন সংস্করণ। স্কুল দু' টাকা। পাতা-জোড়া জোড়া বিজ্ঞাপন দিলেন পত্রপত্রিকায়। অনেকেই জীবনানন্দ দাশকে সেই প্রথম চিনল। এই বইয়ের বিজ্ঞাপনের কপিতে এই কবির কবিতাকে যে রবীন্দ্রনাথ চিত্রকৃপময় বলেছিলেন, সেই সার্টিফিকেট জুড়তে হয়েছিল। তখনও পর্যন্ত, কল্পোলের কবিদের বিরোধিতা সম্বন্ধে, রবীন্দ্র-প্রাবনে আচ্ছন্ন ছিল বাংলা সাহিত্য। তার মধ্য থেকে মাথা তুলে দাঁড়ানো ছিল কোনও কবির পক্ষে দৃঢ়সাধ্য।

আমাকে জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রথম দীক্ষা দেয় আমার কলেজের দুই সহপাঠী, মোহিত চট্টোপাধ্যায় এবং শিবশঙ্কু পাল। ইদানীংকালের সার্থক নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় তখন ছিল কবি। শিবশঙ্কু প্রচুর কবিতা লিখেছে। দু'জনেই খুব পড়ুয়া। তখন বুদ্ধদেব বসু এবং বিষ্ণু দে-ই আধুনিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়, দু'জনে দুটি গোষ্ঠীর অধিপতি, যাদের বলা হয় বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব। সুধীন্দ্রনাথ দস্ত, অমিয় চক্রবর্তী, এমনকী প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অজিত দস্ত প্রমুখের লেখা নিয়েও তর্কাতর্কি হত। সিগনেট সংস্করণ 'বনলতা সেন' প্রকাশের আগে পর্যন্ত জীবনানন্দই ছিলেন সবচেয়ে কম আলোচিত। মোহিত-শিবশঙ্কু একদিন আমায় বলেছিল, তুমি জীবনানন্দ পড়োনি? পড়ে দেখো! আমি তখন সর্বভুক্তের মতন যাবতীয় বাংলা বই গোগ্রাসে গিলি, আমাকে কেউ 'এইটা পড়োনি' বললে খুব আঁতে ঘা লাগত, সেইদিনই সেই বই বা সেই লেখকের রচনা যে-কোনও উপায়ে সংগ্রহ

করে পড়ে নিতাম। সেইভাবে ‘সাতটি তারার তিমির’ আমার হাতে আসে।

কী করে সেই বইটি সংগ্রহ করেছিলাম, তার একটি কাহিনী আছে।

তখন সপ্তাহে একদিন রেশনের দোকানের লাইনে দাঁড়ানো ছিল কলকাতার নাগরিক জীবনের অঙ্গ। রেশনের দোকানের বাইরে চাল-ডাল-গম-চিনি মানেই ব্ল্যাক মার্কেট। অনেক দাম। আমাদের বাড়িতে ‘কাজের লোক’ ছিল না। বাজার করা, রেশন আনা ইত্যাদির ভার ছিল আমার ওপরে। মনে আছে সেই দিনটি, উত্তর কলকাতায় একটা রেশনের দোকানের লাইনে দাঁড়িয়ে আছি প্রায় দশ-বারোজনের পেছনে, অনেকটা সময় লাগবে। এই সময়টা খুবই বিরক্তিকর, অন্যমনস্থ হতে না পারলে বিরক্তি আরও বাঢ়ে। হঠাৎ লক্ষ করলাম, আমি আপন মনে কী যেন বিড়বিড় করছি। কয়েকটি কবিতার লাইন :

বিকেলের থেকে আলো ক্রমেই নিষ্টেজ হয়ে নিভে যায়—তবু

চের স্মরণীয় কাজ শেষ হয়ে গেছে

হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিড়ে;

স্বাতের ইশারায় কঙ্কালের পাশাশলো একবার সৈনিক হয়েছে;

সঙ্ঘল কঙ্কাল হয়ে গেছে তারপর;

বিলোচন গিয়েছিল বিবাহ ব্যাপারে;

প্রেমিকেরা সারাদিন কাটায়েছে গণিকার বারে;

সভাকবি দিয়ে গেছে বাক বিভূতিকে গালাগাল।

এক এক সময় নিজের ব্যবহারে আমিরো নিজেরাই খুব বিস্মিত হই। এ কবিতা আমার মুখস্থ হয়ে গেল কী করে? সচেতনভাবে চেষ্টা করিনি, খুব একটা পছন্দও করিনি। তবু মনের মধ্যে গেঁথে ফেলে।

সেই গরম, ঘাম, লোকজনের কর্কশ চ্যাঁচামোচি, অসততার গন্ধ, তার মধ্যেই আমি ওই কবিতার পঙ্ক্তিশুলিতে মগ্ন হয়ে রইলাম। সেই কবিতা থেকে বিচ্ছুরিত হতে লাগল আলো, প্রত্যেকটি শব্দ বাজতে লাগল অন্যরকম সুরে। যেমন, ‘চের’ শব্দটি অতি সাধারণ, কিন্তু জীবনানন্দই ব্যবহার করেন বেশি, ‘অনেক’-এর চেয়ে ‘চের’ তাঁর কবিতায় অন্য একটি মাত্রা পেয়েছে যেন! ‘হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিড়ে’, এটা না বোঝার কী আছে? এরকম অসাধারণ পঙ্ক্তিটা আগে খেয়াল করিনি? এ তো সারাঙ্গীবন স্মরণযোগ্য। ‘সঙ্ঘল কঙ্কাল হয়ে গেছে তারপর’, এখনও খানিকটা ধোঁশটে-, গেছে বটে, কিন্তু তখনই আমার একটি উপলব্ধি হল। একটি কবিতার সব কটি পঞ্ক্তি এবং শব্দের পারম্পর্য মিলিয়ে অর্থ খোঁজার চেষ্টা এক ধরনের ছেলেমানুষী ছাড়া কিছুই নয়। কবিতা কি সব কিছু বুঝিয়ে দেয়, না একটা অনুরূপ জাগিয়ে তোলে? জীবনানন্দ তে? ঠিকই বলেছেন, ‘কবিতা কী? কবিতা অনেক রকম’। কিছু কিছু রচনা স্পষ্টভাষ্যী হয়েও সার্থক কবিতা হতে পারে, আবার কিছু কিছু কবিতার রহস্যময় অনুরূপনই স্মৃতিকে আলোড়িত করে।

তখনই একটা ব্যাকুলতা বোঝ করি, জীবনানন্দের একটি কাব্যগ্রন্থ সংগ্রহ করার জন্য। শুধু পত্র-পত্রিকায় নয়, তাঁর একটা কবিতার বই নিজের কাছে রেখে বারবার

পড়তে হবে। কিন্তু বই কেনার পয়সা পাব কোথায়? হাত খরচ পাই দৈনিক মাত্র চার পয়সা, জীবনানন্দ দাশের ‘সাতটি তারার তিমির’-এর দাম দু’ টাকা।

মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। রেশন থেকে চুরি করলে কেমন হয়? চাল আর চিনি যদি কিছু কিছু কম নিই, বাড়িতে ধরতে পারবে না। ধরলেও বলব, আমাকে ওজনে ঠকিয়েছে। সেরকম তো অহরহ ঠকায়। একটা যুক্তি খাড়া করলাম। ম্যান ডাজ নট লিভ বাই ব্রেড অ্যালোন। শুধু ভাত ঝটি খেয়ে বেঁচে থাকার কোনও অর্থ হয় না। কবিতাও পড়তে হবে। একটু কম ভাত খেয়ে, চায়ে একটু কম চিনি দিয়ে, সেই পয়সা বাঁচিয়ে একটা কবিতার বই অবশ্যই কেনা যেতে পারে।

সেইদিনই সঙ্কেবেলা কবিতার বইটি কিনে বাড়ি ফিরে, পাগলের মতন কতবার যে পড়তে লাগলাম তা কে জানে!

স্তুলজীবনে আমি কবিতা রচনা করার কথা কল্পনাই করিনি। আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল একটাই, জাহাজের নাবিক হওয়া। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরের ছুটিতে খেলাছলে দু-তিনটি কবিতা লিখেছিলাম, তার একটি ‘দেশ’ পত্রিকায় পাঠাতে ছাপাও হয়ে গেল। ছেলেবেলায় বন্ধুদের মধ্যে দীপক মজুমদারই ছিল একমাত্র কবি, প্রথম থেকেই সে বেশ জোরাল কবিতা লিখত। বলতে গেলে দীপকের অনুসরণেই আমি কবিতা লিখতে শুরু করি। সেই সঙ্গে শুরু হয় নতুন করে কবিতা পাঠ। কল্লোল যুগের কবিদের বহু কবিতা বারবার পড়া সম্ভুক্ত বেশি ভাল লেগে গেল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা, কিন্তু জীবনানন্দের কবিতা প্রথম পড়ার পর কেউ যেন দু’-চোখে ঘূসি মেরেছিল। বিমুঢ় হয়ে বস্তে থাকার মতন অবস্থা। এ কী! এসব কবিতা আগে পড়িনি? এ যে সম্পূর্ণ নতুন ভাস্ফি:

হাইড্রান্ট খুলে দিয়ে কুষ্টরোগী চেটে নেয় জল
অথবা সে-হাইড্রান্ট হয়তো বা গিয়েছিল ফেঁসে
এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে
একটি মোটর কার গাড়লের মতো গেল কেশে...

এর মধ্যে প্রথম লাইনটিতে অসাধারণত কিছু নেই। কিন্তু দ্বিতীয় লাইনটি? ‘অথবা সে-হাইড্রান্ট হয়তো বা গিয়েছিল ফেঁসে’? হাইড্রান্ট উপচে উঠেছিল, তাকে কবি লিখলেন ‘ফেঁসে’? এই শব্দ তাঁর মাথায় এল কী করে?

পিতৃলোক হেসে ভাবে, কাকে বলে গান
আর কাকে সোনা, তেল, কাগজের খনি

এর মধ্যে ‘কাগজের খনি’ লেখার সাহস আর কারও হত? দিনের শেষে তিনজন আধো আইবুড়ো ভিথিরির মন অত্যন্ত প্রশান্ত হতেই পারে। কিন্তু পরবর্তী দুটি লাইনে, ‘ধূসর বাতাস খেয়ে এক গাল—রাস্তার পাশে/ ধূসর বাতাস দিয়ে করে নিলো মুখ আচমন’, কল্লোল যুগের আর কোনও কবির সঙ্গে এর একেবারেই মিল নেই। ‘জলিফলি ছাড়া/ চেঁলার হাট থেকে টালার জলের কল আজ। এমন কি হতো জাঁহাবাজ?’ ঠিক মানে বুঝি না, তবু যেন স্তুতি করে দেয়, নিয়ে যায় এক রহস্যময় দেশে, যা শুধু কবিতারই নির্মাণ।

মাঠের ফসলগুলো বার-বার ঘরে

তোলা হতে গিয়ে তবু সমুদ্রের পারের বন্দরে
পরিষ্কৃত ভাবে চলে গেছে

এর মধ্যে রয়েছে অনেক বৎসনার করুণ কাহিনী, তাতে ‘পরিষ্কৃত’ শব্দটি একেবারে
অভাবনীয় এবং অসাধারণ। এরকম একটি-দুটি শব্দের ব্যবহার আমাদের অভিজ্ঞতায়
সম্পূর্ণ নতুন। তাতেই কবিতাগুলির যেন ফট করে রূপ খুলে যায়।

আমি পাগলের মতন জীবনানন্দ দাশের ভক্ত হয়ে গেলাম। ভক্ত কিংবা
ক্রীতদাসও বলা যেতে পারে। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনের রেলিং-এর পুরনো
বইয়ের দোকান থেকে একদিন মাত্র চার আনায় এক কপি ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ কিনে
মনে হয়েছিল যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছি।

চারিদিকে নুয়ে পড়ে ফলেছে ফসল

তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল;

প্রচুর শস্যের গন্ধ থেকে থেকে আসিতেছে ভেসে

পেঁচা আর ইন্দুরের দ্রাঘি ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশে।

শরীর এলায়ে আসে এইখানে ফলস্ত ধানের মতো ক’রৈ

যেই রোদ একবার এসে শুধু চলে যায় তাহার ঠোঁটের চুমো ধরে

আহুদের অবসাদে ভরে আসে আমাদুর শরীর

চারিদিকে ছায়া—রোদ—খুদ—কুঁড়ো—জ্ঞাতিকের ভিড়;

চোখের সকল কৃধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিফ কান,

পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে ক্লিপশালি-ধানভানা রূপসীর শরীরের দ্রাঘ...

এমন আবেশময়, এমন মায়ারী কবিতা পাঠ যেন জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার মনে
হয়েছিল সেই বয়েসে। ইংরিজি ‘সেনসুয়াস’ শব্দটি যেন এই রকম কবিতা সম্পর্কেই
সঠিক ব্যবহার করা যায়। কেন এত সেমিকোলন, কেন হঠাত একটা লাইনে, অকারণ
চারটে ড্যাশ? জনার প্রয়োজন নেই। জীবনানন্দ দাশ কখনও উচ্চকিতভাবে
রবীন্দ্র-বিরোধিতা করেননি। কল্পনার অন্যান্য কবিতা যতই চ্যাচামেটি করুন, তাঁরা
রবীন্দ্রনাথেরই স্বাভাবিক উত্তরসূরি, কিন্তু জীবনানন্দের ভাষারীতিই রবীন্দ্রনাথের
থেকে অনেক দূরের। ফসলের স্তন থেকে ফোঁটা ফোঁটা শিশিরের জল পড়ার বর্ণনা
লেখার সাধ্য ছিল না রবীন্দ্রনাথের।

অচিরকালের মধ্যেই আমরা ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকা প্রকাশ করি। তখন সবাই
জীবনানন্দ দাশে আচ্ছন্ন। কফি হাউসে তরুণ কবিদের আজ্ঞার বিষয় হিসেবে বুদ্ধদেব
বসু ও বিশু দে ক্রমশ স্থানচ্যুত হয়ে সেখানকার সিংহাসনে বসানো হয় জীবনানন্দ
দাশ-কে। বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দকে নিয়ে প্রথম প্রবন্ধ লিখেছিলেন, এ কৃতিত্ব তাঁর
অবশ্যই প্রাপ্ত। কৃত্তিবাসের দলবলই যে প্রথম প্রকাশ্যে জীবনানন্দকে নিয়ে একটা
হইচই শুরু করে, এটাও দাবি করা যেতে পারে।

আমরা অবশ্য লেখায় জীবনানন্দকে অনুসরণ করিনি। এক একজন কবি বা লেখক
হন আউটস্ট্যান্ডিং, যেমন জীবনানন্দ, যেমন কমলকুমার মজুমদার, এঁরা থাকেন মূল

ধারা থেকে দূরে, এন্দের অনুকরণ বা অনুসরণ আঞ্চলিকভাবেই সমান। শক্তি অল্প কিছুদিনের জন্য জীবনানন্দীয় ফাঁদে পা দিয়েছিল, আবার চট করে বেরিয়েও এসেছে। আমি জীবনানন্দের অত ভক্ত হয়েও তাঁর ভাষারীতির একটি ব্যাপার অপছন্দ করতাম। তিনি অধিকাংশ কবিতাই লিখেছেন পয়ারে, তাতে অনেক সময়ই যুক্তিশ্রবকে দু'-মাত্রা ধরেছেন, যেমন ‘অতীত নিষ্ঠকতা’, ‘অবিনশ্বর পথে ফিরে’, ‘মনে হবে পরম্পরার প্রিয় প্রতিষ্ঠ মানব’, ‘অগণন নার্সের ভাষা’, ‘আন্তাবলের ঘাণ’, ‘ভয় পায় ভ্রান্তিবশত’, ‘কৃতকর্ম নবীন’ ইত্যাদি এরকম এলানো ব্যবহার জীবনানন্দ দাশের কবিতায় তবু মানিয়ে যায়, কিন্তু পয়ার ছন্দ কথ্য ভাষার কাছাকাছি এসে আরও সংবচ্ছ হয়েছে, সেখান থেকে আর ফিরে যাওয়া চলে না।

সৌভাগ্যবশত এই সময়টায় সিগনেট প্রেস ও দিলীপকুমার গুপ্তের সঙ্গে আমার বেশ যোগাযোগ ঘটেছিল। শুধু ‘কৃতিবাস’ পত্রিকার সূত্রেই নয়, ডি-কে একটা থিয়েটারের দল খুলেছিলেন, আমি তার সেক্রেটারি, সুতরাং ওই বাড়িতে প্রায় সম্ম্যাতেই যাতায়াত করতাম আমি। জীবনে সেই প্রথম আবু সয়ীদ আইয়ুব, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সৈয়দ মুজতবা আলী, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ মহারথীদের সামনাসামনি দেখে চক্ষু সার্থক করি। জীবনানন্দ দাশকেও দু'-তিনবার দেখেছি। নতুন সংস্করণ ‘বনলতা সেন’ দেখে তিনি খুবই খুশি হয়েছিলেন, তবে শুনেছি, মলাটের ছবিটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, রাজকুমারী অম্বত কাউরের মতন দেখতে হয়ে গেছে। রাজকুমারী অম্বত কাউর খুবই রোগা পাতলা মহিলা, তখন ভারত সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন।

সিগনেট প্রেসের বাড়িতে জীবনানন্দকে দেখেছি, কথা বলিনি। সাহস পাইনি। কৃতিবাস ছিল প্রথম যুগে তরুণতম কবিদের মুখ্যপত্র। প্রতিষ্ঠিত খ্যাতিমান কবিদের কাছে লেখা চাইতাম না, তাঁদের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করাও অভ্যেস ছিল না। সেই সব কবিদের সম্পর্কে এমনই সন্তুষ্মের ভাব ছিল যে মনে হত, ওঁদের সঙ্গে কথা বলার মতো কী যোগ্যতা আছে আমার? শুধু একবারই শক্ত চট্টোপাধ্যায় নিয়ে গিয়েছিল জীবনানন্দ দাশের বাড়িতে, ল্যাঙ্গড়াউন রোডের কাছাকাছি কোথাও থাকতেন। দরজা খুলেছিলেন তিনি নিজে, ঘরে নিয়ে গিয়েও বসিয়েছিলেন, ঘরের মেঝেতে অনেক পূরনো খবরের কাগজ ছড়ানো ছিল, কবি ছিলেন খালি গায়ে, আমাদের দেখেও গায়ে জামা দেননি। আমরা গিয়েছিলাম দল বেঁধে, অন্যরাই বেশি কথা বলেছে, আমি ছিলাম পেছনের দিকে, নীরব।

আমরা কৃতিবাসের দল বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব কোনও ক্যাম্পেই যোগ দিইনি। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসুর বাড়িতে আমি গেছি অবশ্য, সে বাড়ির জামাই জ্যোতির্ময় দণ্ডের সঙ্গে বঙ্গুত্বের সূত্রে। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আমাদের তর্কই হত বেশি।

জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে এক মধ্যে কবিতা পাঠ করার সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল। বাংলার ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিশাল এক কবি সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল সেই সময়ে। প্রকাণ্ড সিনেট হলে দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান। মূর্খরা সেই ঐতিহ্যপূর্ণ সিনেট হলটি পরে ভেঙে ফেলেছে। সেই কবি সম্মেলনের আহ্বায়ক

ছিলেন যদিও নীহারঞ্জন রায় ও আবু সয়দ আইয়ুব, কিন্তু প্রধান উদ্যোক্তা ও সবকিছুর দায়িত্ব নিয়েছিলেন সিগনেটের দিলীপকুমার শুল্প। পরিকল্পনা ও ব্যয়ভার তাঁরই। সে সময় কবি হিসেবে স্থীরতি পাওয়ার একমাত্র মান ছিল বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ‘কবিতা’ পত্রিকায় স্থান পাওয়া। আমার গোটা দু’এক কবিতা তখন ওই পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তাই ওই কবি সম্মেলনে মনোনীত হয়েছিলাম। তালিকার শীর্ষে নাম ছিল জীবনানন্দ দাশের, একেবারে শেষে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে আমার নাম। মনে আছে, মাইকের সামনে কী করে সুষ্ঠুভাবে কবিতা পাঠ করতে হয়, ডি-কে অনেক কবিকে আগে দু’একদিন তার রিহার্সাল দিইয়েছিলেন। শিখিয়েছিলেন শত্রু মিত্র।

জীবনানন্দ রিহার্সাল দেননি। তাঁর পাঠ করার ভঙ্গিটি ছিল অঙ্গুত। হলে কয়েক হাজার দর্শক। তিনি তাদের দিকে একবারও তাকাননি। বইতে আবদ্ধ ঢোখ। যাঁর কবিতায় এত কমা, সেমিফোলন ও ড্যাশ, তিনি কিন্তু পাঠের সময় একটুও যতি দেন না, পড়েন অতি দ্রুত, যেন শেষ করার জন্য ব্যস্ত। শ্রোতাদের অনুরোধে তিনি সাত-আটটি কবিতা পড়েছিলেন। অনুরোধকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উইংসের আড়ালে দাঁড়ানো দিলীপকুমার শুল্প স্বয়ং।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্র-পরবর্তী প্রধান পঞ্চ কবির মধ্যে সবচেয়ে ভাল কবিতা পাঠ করতেন সুধীলুনাথ দত্ত। যেমন সুপ্রসিদ্ধ, তেমনই সুলিলিত কষ্টস্বর। একটু টেনে টেনে সুর করে পড়তেন, মোহিত করে দিতেন একেবারে।

সে সময়ে ‘নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন’ বলে একটা বাংসরিক ব্যাপার ছিল, যাতে শুধু রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্রস্মৃতিনাট্য, গীতিলাট্য এইসব হত কয়েকদিন ধরে। খুব জনপ্রিয় ছিল সেই উৎসব। নতুন ‘বনলতা সেন’ প্রকাশিত হবার পর সেই সম্মেলন কর্তৃপক্ষ এই বইটিকে ১৩৫৯ সালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হিসেবে গণ্য করে কবিকে পুরস্কার দেন। পুরস্কারের অর্থমূল্য ছিল একশো টাকা। যতদূর জানি, জীবন্দশায় ওই একবারই পুরস্কৃত হয়েছিলেন তিনি। উনিশশো চুয়াম সালে প্রকাশিত হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা। সেটাও একটা পুরস্কার বলা যেতে পারে। প্রকাশক নাভানা। তাঁরা সিগনেট প্রেসেরই অনুসারী, অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে কবিতার বই প্রকাশ করতেন, ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বিরাম মুখোপাধ্যায়, যিনি নিজেও এক সময় কবিতা লিখতেন। সিগনেট ও নাভানা, দুটিরই আজ প্রায় অস্তিত্ব নেই বলা যায়।

এই শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় জীবনানন্দের একটি কথা আমাকে বিস্মিত করেছিল। তিনি লিখেছেন, ‘বিভিন্ন অভিজ্ঞ পাঠকের বিচার ও রুচির সঙ্গে যুক্ত থাকা দরকার কবির।’ যার কবিতা পড়ে মনে হয় সম্পূর্ণ আস্থানিমগ্ন, সেই কবিও পাঠকের কথা চিন্তা করেন। আর একটি বিশ্যবকর ব্যাপার, ওই গ্রন্থে ছাপা তাঁর পাণ্ডুলিপির নমুনা। আমার ধারণা ছিল, তিনি চিন্তার শ্রেতের মধ্যে কোনও যুক্তির জাল না ছড়িয়ে সাবলীলভাবে লিখে যান। অটোমেটিক রাইটিং-এর মতন। সুরিয়ালিস্টরা যেরকম চেষ্টা করতেন। অথচ, জীবনানন্দের লেখায় এত কাটাকুটি, অর্থাৎ অত্যন্ত সচেতনভাবে তিনি প্রতিটি শব্দ প্রয়োগ করেছেন। ‘এখানে বনের ধারে ক্যাম্প আমি

ফেলিয়াছি' ধরনের লাইন মনে হয় বেশ দুর্বল ধরনের, কিন্তু এটা তাঁর ইচ্ছাকৃত, এটা তাঁর স্টাইল। এই মৌলিক স্টাইলের উজ্জ্বাল মৌলিক প্রতিভার মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে পূর্বে অগ্রস্থিত কবিতাগুলির মধ্যে রয়েছে কিছু কিছু অসাধারণ পঙ্ক্তি, যেমন, 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব/থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে/প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে'। কিংবা 'কোথাও পরের বাড়ি এখনি নিলাম হবে—মনে হয়, /জলের মতন দামে।/সকলকে ফাঁকি দিয়ে স্বর্ণে পৌছোবে/ সকলের আগে সকলেই তাই'...।

'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রকাশের পর জীবনানন্দের খ্যাতি অনেক বেড়ে যায় কিন্তু সেই খ্যাতি তিনি বেশিদিন উপভোগ করতে পারেননি। বইটি বেরোল এপ্রিলে, অক্টোবর মাসে সেই ট্রাম দূর্ঘটনা। শাস্ত্রনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে কয়েকদিন জীবনমরণের লড়াই চলেছিল, দেখতে যাবার সুযোগ হয়নি। জীবনানন্দের প্রাক্তন ছাত্র অরবিন্দ শুহ গোচেন দু'একবার, তাঁর মুখে খবর শুনতাম।

শবানুগমনে খুব বেশি লোক হয়নি। আমাদের অল্পবয়েসি কাঁধ বেশ শক্ত, আমরা কয়েকজন কাঁধ দিয়েছিলাম পালা করে। জীবনে একবারই মাত্র সেই কবির শরীর আমি স্পর্শ করেছি, তখন নিম্পন্দ। ক্যাওড়াতলায় তখনও বিদ্যুৎচুলি হয়নি, তাঁকে চিতায় পোড়ানো হয়েছিল। কবির শরীর যখন চিটায় ছলছে, কিছুদূরে একটা ফাঁকা জায়গায় বসে আমরা কয়েকজন অনর্গল তাঁর কবিতা বলছিলাম। কার কটা মুখস্থ আছে, যেন তার একটা প্রতিযোগিতা চলছিল। জীবনে সেদিনই প্রথম আমি সিগারেট খাই। অনভ্যাসের জন্য কাশছিলাম কুকু, আর ধোঁয়ায় ঢোকে জল এসে গিয়েছিল।

প্রজ্বলন্ত সূর্য এবং সাতটি তারার তিমির

ধরা যাক তিরিশের দশকের কাছাকাছি সময়ের কথা। কী করছেন তখন রবীন্ননাথ? বিশ্ববিখ্যাত তো বটেই, বিষম ব্যস্ত, অনেক রকম ভূমিকা, কবি বলে চেনাই যায় না। শাস্তিনিকেতনের তিনি গুরুদেব, যে-শাস্তিনিকেতন আর শুধু ব্ৰহ্মচৰ্য আশ্রম নয়, বিশ্বভারতীৰ রূপ নিছে, তাৰ অৰ্থ সংগ্ৰহেৰ প্ৰধান দায়িত্বও তাঁৰ। দেশেৰ যে-কোনও সংকটে দেশবাসী তাঁৰ মতামত জানতে চায়। পৃথিবীৰ নানান দেশ থেকে তাঁৰ আমন্ত্ৰণ আসে, যেখানেই যান তাঁকে প্ৰদৰ্শিত হয় রাজকীয় সম্মান। জার্মানি ভ্ৰমণেৰ সময় অমিয় চক্ৰবৰ্তী সঙ্গী ছিলেন রবীন্ননাথেৰ। তিনি লিখেছেন, “সন্ধাটেৰ মত জারমেনি পৱিত্ৰ কৱেচি—শ্ৰেষ্ঠ যা কিছু আপনিই আমাদেৱ কাছে এসে পড়েছে।” গাঙ্গীজিৰ লবণ আন্দোলনেৰ আগে পৰ্যন্ত, রবীন্ননাথই পৃথিবীৰ সব দেশে সবচেয়ে পৱিত্ৰিত ভাৱতীয়।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিৰ শুল্ক নোবেল পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্তিৰ পৰ থেকেই। সেও তো অনেকদিন হয়ে গেল। এই সময়টায় রবীন্ননাথেৰ খ্যাতি যেন কবিৰ চেয়ে বেশি দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ হিসেবে, সাংস্কৃতিক দৃত হিসেবে, এমনকী ভাৱতেৰ এক প্ৰসিদ্ধ পৱিত্ৰাবৱেৰ প্ৰতিভূত হিসেবে। আমেৰিকাৰ ভ্ৰমণেৰ সময় নিউ ইয়ার্কেৰ প্ৰখ্যাত সাংগীতিক ‘স্যাটার্ডে রিভিউ’-তে তাঁৰ এক সংৰ১্ধনা সভা প্ৰসঙ্গে লেখা হয়েছিল, “নিমজ্জিতেৰ তালিকাটিতে ব্যবসায়ী ও ধনী লোকদেৱ অনেক দেখা গেল, একজনও কবিৰ নাম তো পেলাম না—এমনকী একজন লেখকেৰও নাম নয়। এমন ব্যাপার কি ফ্ৰাঙ্গে হতে পাৰত?”

তাঁৰ এই সময়কাৰ একটা ভ্ৰমণসূচি দেখা যাক:

অক্সফোর্ডে হিবোর্ট বক্তৃতাৰ জন্য আমন্ত্ৰণ পেয়েছেন। অনেক আগেই পৱিত্ৰাবৱেৰ কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে যাবা কৱলেন ইউৱোপেৰ দিকে। ১৯৩০ সালেৰ মাৰ্চেৰ গোড়ায়। প্ৰথমে ফ্ৰান্সে, তাৰপৰ ইংল্যান্ডে, সেখান থেকে জার্মানিতে, তাৰ নানা প্রাণ্তে ঘোৱাঘুৱি কৱে এলেন ডেনমাৰ্কেৰ এলসিনোৱে শহৱে, ওখান থেকে কোপেনহেগেন হয়ে ফেৰ বালিন। পৱেৱ মাসে সুইজাৱল্যান্ডেৰ জেনিভায়, সেখান থেকেই প্ৰথম সোভিয়েত রাশিয়ায় যাবা। তাৰপৱেও দেশে না ফিৱে চললেন আমেৰিকায়। মাস তিনিক সে দেশে কাটিয়ে পৌছলেন লন্ডনে। দেশে ফেৱা হল প্ৰায় এক বছৱ পৱে।

এত ঘোৱাঘুৱি যখন কৱছেন, তখন কবিৰ বয়েস সন্তুৰ।

এ সময় তাঁৰ কবিত্বশক্তি প্ৰায় শুকিয়ে গেছে। মাৰে মাৰে দু' একটা যা লিখছেন, তাৰ অকিঞ্চিতকৰ। নিজেও অনুভব কৱছেন তা, সেজন্য বেদনাৰোধও আছে।

এতগুলি দেশ পরিভ্রমণে প্রচুর ভাষণ দিতে হয়েছে তাঁকে, অধিকাংশই, যাকে বলে বাগাড়স্বরপূর্ণ। এরকমই দিতে হয়, এরকমই মানায়। কবিকে মনীষী সাজতে হয়।

এই দীর্ঘ প্রবাসে দু' একটি ব্যাপারে ব্যর্থতাবোধ মেনে নিতে হলেও, কয়েকটি ব্যাপারে গভীর তৃপ্তি পেয়েছেন। এই সময়কালে কবিতা তাঁকে ছেড়ে গেলেও তাঁর সৃজনশীলতা আকস্মিকভাবে বিকশিত হয়েছিল অন্য এক দিকে। কিছুকাল ধরে তিনি মনের খেয়ালে ছবি আঁকছিলেন, কোনও নিয়ম না মেনে, সেইসব ছবি যেন অন্য এক শৃষ্টার, যা রবীন্দ্র অনুরাগীদেরও অচেনা। স্বদেশে এইসব ছবির সমবাদার পাওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই সন্দিহান ছিলেন, কোথাও প্রদর্শন করেননি। চিত্রশিল্পের পীঠস্থান ফরাসি দেশ, সেখানে সবরকম নতুন পরীক্ষাও চলে, সেখানে চিত্রশিল্প অনেকগুলি স্তর পার হয়ে পরাবাস্তবতায় পৌছেছে। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছে ছিল, প্যারিসেই তাঁর ছবিগুলি প্রথম দেখানোর। কিন্তু প্যারিসে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার।

সৌভাগ্যবশত সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন দুই ধনবতী মহিলা, প্যারিসের কঠেস দ্যনোআই এবং আর্জেন্টিনার সেই ভিস্টোরিয়া ওকাম্পো। এর পর বার্লিনেও তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হল উকুর সোলিনা নামে এক বিদূষী মহিলার আগ্রহে। রবীন্দ্রনাথের বাস্তবী ভাগ্য বরাবরই ভাল। ইউরোপে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবিগুলির শিল্প-স্বীকৃতি পেয়ে গেলেন। আর সমাজতন্ত্রিক রাশিয়া দর্শনও বিরাট অভিজ্ঞতা। সমবায়, সমবণ্টন ও সমাজতন্ত্রের আদর্শের ভিত্তিতে শ্রেণীহীন দেশগঠনের পরীক্ষা দেখে তিনি মুঝ হয়েছিলেন। আবার তাঁর সূক্ষ্ম স্পর্শকাতর মনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের বিলোপ এবং একলায়কতন্ত্রের সংস্কারনার বিপদের ইঙ্গিতও ধরা পড়েছিল।

কিন্তু প্রধানত যিনি কবি এবং রোমান্টিক কবি, তিনি কবিতা থেকে দূরে থাকছেন কী করে? তাঁর জীবনে যখনই কবিতার উৎস কিছুটা শুকিয়ে গেছে, তখনই যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন। জলপ্রাণী যেমন ডাঙায়, কবিতা বর্জিত জীবন তাঁর কাছে তেমনই যন্ত্রণাময়। সেই যন্ত্রণারই প্রকাশ ছবিগুলিতে?

এই পঞ্চম দেশ সফরের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর সঙ্গী ছিলেন দুজন প্রতিভাবান আধুনিক কবি। অমিয় চক্রবর্তী ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, একের সঙ্গে তাঁর নানা সময়ে আলোচনা হয়, কিন্তু তিনি কবিতার আধুনিকতার লক্ষণগুলি ধরতে পারছেন না কিছুতেই। এক এক সময় তিনি ভাবছেন, নিছক ছন্দ-মিল পরিত্যাগ করার নামই বুঝি আধুনিকতা। ‘রাজা ও রানী’ নাটকটি সংস্কার করতে গিয়ে এই ধরনের একটি কথা বলে ফেলেছিলেন। নাট্য-কাব্য ‘রাজা ও রানী’র পরিবর্ধিত রূপটি হয়ে গেল গদ্য ‘তপত্তি’। এর ব্যাখ্যা হিসেবে তিনি জানালেন, “নেড়া ছন্দে ‘ল্যাক্ষ ভার্স’ এ নাটক লেখা থেকে গদ্যে তার চেয়ে চের বেশি জোর পাওয়া যায়। সাহিত্যে পদ্যটা প্রাচীন, গদ্য ক্রমে ক্রমে জেগে উঠছে...গদ্য রচনায় আঘাশঙ্কির সুতরাং আঘাপ্রকাশের ক্ষেত্র খুবই প্রশংসন।...ভাষা এখন সাবালক হয়েছে, ছন্দের কোলে চড়ে বেড়াতে তার লজ্জা হবার কথা। ছন্দ বলতে বোঝাবে বাঁধা ছন্দ।” এই ব্যাখ্যা মানতে পারেননি

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি মন্তব্য করেছেন, ‘ইহা ছন্দোবদ্ধ নাটক ও নাট্যকাব্য রচনার অক্ষমতার কৈফিয়ৎ কিনা জানি না। গ্রেটে বৃদ্ধ বয়েসে তাঁর ফাউন্ট-এর উত্তরাধি লেখেন, রবীন্দ্রনাথকে সেরূপ কোনও বৃহৎ সৃষ্টির মধ্যে দেখা যায় না।’ জীবনীকারের পক্ষে এহেন মন্তব্য বিস্ময়কর, আবার এই পর্বে গ্রেটের সঙ্গে তুলনা আন্তও বটে। শতাব্দীর ব্যবধান আছে, এরকম দুই লেখকের আঙ্গিকের বিচার চলে না। শেঙ্গপিয়ার বিংশ শতাব্দীতে জগ্নালে সন্তুষ্ট তাঁর নাটকগুলি গদ্যেই লিখতেন। আবার, গদ্য শক্তিশালী হয়েছে বলেই রবীন্দ্রনাথের ছন্দকে মায়ের কোলে চড়া শিশুর সঙ্গে তুলনা নেহাত উপমার ঝোঁকেই উপমা, ছন্দের আরও গভীর সঞ্চারী হবার কথা।

‘পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ গদ্য কবিতা সম্পর্কে তাঁর মত আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি তখন ছন্দ ভাঙার জন্য অত্যুৎসাহী। সারা জীবন ছন্দে রাশি রাশি কবিতা লিখে এসে তিনি সন্তুষ্ট বছর বয়েসে ছন্দ বর্জন করতে উদ্যত হলেন। শুধু তাই নয়, তিনি সত্ত্বেন্দ্রনাথ দস্তকেও অনুরোধ করলেন বিনা ছন্দে লিখতে (সত্ত্বেন্দ্রনাথ অবশ্য সেই শুরুবাক্য অনুসরণ করেন নি, ছন্দকেই আঁকড়ে থেকেছেন)। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়ে লিখিয়েছেন কয়েকটা, তারপর নিজেই লিখতে শুরু করলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর এতকাল ব্যবহৃত পদ্য ভাষাকে তিনি ‘সমজ্জ সলজ্জ অবগুঠন প্রথা’য় আবদ্ধ বলত্তেশ্বর দ্বিধা করলেন না। বললেন, ‘অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সন্তুষ্ট, এই আমার বিশ্বাস।’

তোমাকে পাঠালুম আমার লেখা
এক ই-ভরা কবিতা
তারা সবাই ঘেঁষাঘেঁষি দেখা দিল
একই সঙ্গে এক খাঁচায়।
কাজেই আর সমস্ত পাবে
কেবল পাবে না তাদের মাঝখানের ফাঁকগুলোকে।
যে অবকাশের নীল আকাশের আসরে
একদিন নামলো এসে কবিতা
সেইটেই পড়ে রাইলো পিছনে।

(পত্র: পুনশ্চ)

এবাবে দেখা যাক, ওই সময়ে আর এক কবির কী অবস্থা। কবি হিসেবে অবশ্য তাঁকে ঢেনে অল্প লোকে। রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিগোষ্ঠীর তিনি অন্যতম যদিও, কিন্তু তাঁর তুলনায় অন্যরা এর মধ্যেই অনেক বেশি পরিচিত এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত। জীবনানন্দ দাশ তাঁর সমসাময়িক বৃক্ষদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ দস্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিশুণ্ড দে'র চেয়ে বয়েসে বড়, কিন্তু তখনও তাঁর কবিতা পত্র-পত্রিকা থেকে ফেরত আসে, নতুন কবিতা সংকলনে তাঁর স্থান হয় না।

আধুনিক কবিদের বিষয়ে রচিত প্রবক্ষে তাঁর নামের উল্লেখ থাকে না।

ব্যক্তিগত জীবন তখন অসহনীয় অবস্থায় পৌছেছে। বিবাহিত, কিন্তু দাম্পত্য জীবনে চরম অসুখী, থাকেন কলকাতার এক মেসে, উপাৰ্জনহীন সম্পূর্ণ বেকার, চাকরি পাবার জন্য তিনি 'কুকুর বেড়ালের কাছেও মাথা নুইয়েছেন'।

জীবনানন্দ গবেষক ভূমেন্দ্র শুহৰ ভাষায়: "এই সময়ে তিনি কৰ্মহীনতার দৈনন্দিন বিড়ম্বনায় অত্যন্তই বিশ্রান্ত ছিলেন; দারিদ্র্যের ও পরমুখাপেক্ষিতার কারণে হতাশাগ্রস্ত, অপমানাহত, বিশ্বুদ্ধ, আঘাতিকার পীড়িত, এবং কল্পনা কখনও কখনও সামান্য পরশ্রীকাতর এবং ঈর্ষান্বিত।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জীবনানন্দের ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক অবস্থানের একটা তুলনা কৌতুহলোদ্দীপক হতে পারে।

দু'জনেই ব্রাহ্ম, কিন্তু জীবনানন্দ ব্রাহ্মদের সম্পর্কে আস্থা হারিয়ে ফেলছেন। ব্রাহ্মদের চুৎমার্গ ও নীতি-কঠোরতা তিনি পছন্দ করতে পারছেন না। ভাগ্যের এমনই পরিহাস, ব্রাহ্ম নীতিবাগীশদের জন্যই তিনি চাকরি হারিয়েছেন এবং অন্য কোনও ভাল চাকরি পাননি। ব্রাহ্ম হলে সেই সময় অনেক সুবিধে পাওয়া যেত, কারণ তখন বহু স্কুল-কলেজ, শিক্ষা বিভাগে ছিল ব্রাহ্মদের আধিপত্য। সেই হিসেবে, ইংরেজিতে এম এ পাস করার প্রায় সঙ্গেই ব্রাহ্ম পরিচালিত সিটি কলেজে সহজেই চাকরি পেয়েছিলেন। সেই চাকরি রক্ষা করতে পারলে আনন্দকে সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারতেন জীবনানন্দ। গওগোল বাখে সরস্বতী পুজো নিয়ে। বাংলার প্রায় সব স্কুল-কলেজেই সরস্বতী পুজো হয়, সিটি কলেজের অধিকার্শ ছাত্রই হিন্দু, তারাও সরস্বতী পুজো করতে চেয়েছিল। কলেজ কর্তৃপক্ষের তাতে ঘোর আপত্তি। এখনকার সহজ বুদ্ধিতে মনে হয়, ব্রাহ্ম কর্তৃপক্ষ অতথানি কটুর না হয়ে যদি ছাত্রদের বুবিয়ে বলতেন, কলেজ কম্পাউন্ড বাদ দিয়ে একটু বাইরে শিয়ে পুজো করো না বাপু, তা হলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু তা হয়নি। কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্ররা জেদ ধরে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের ধিক্কার দিয়ে প্রবক্ষ লেখেন। সুভাষ বসু এসে ছাত্রদের 'বেশ করেছ' বলে যান। অধ্যাপকদের মধ্যে কয়েকজন, জীবনানন্দ সমেত, ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল, এই অভিযোগ ওঠে। সেই কয়েকজন অধ্যাপকের চাকরি যায়। কিছু ছাত্রও কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়। পরে আর একবার জীবনানন্দ এই সিটি কলেজেই চাকরির চেষ্টা করেছিলেন, তখন তাঁর কবিতা অল্পীল, এই ছুতো দেখানো হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের বাস্তবী ও অনুরাগিণী ভাগ্য ঈর্ষণীয়। জীবনানন্দের স্তুর সঙ্গে প্রায় প্রথম থেকেই বনিবনা হয়নি, আর একটি মাত্র রমণীর প্রতি তাঁর দুর্বলতার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাঁর নামটি এখনও কেউ জানে না, দিনলিপিতে য অক্ষরে চিহ্নিত। অধরা এই রহস্যময়ী নারী হতভাগ্য কবিটির সঙ্গে কৌতুক করেছেন বলেই মনে হয়।

খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন খুঁতখুঁতে, রূপোর থালা-বাসনে তাঁর অন্ন পরিবেশিত হত। আর মেসে থাকার সময় জীবনানন্দের আহার বাবদ ব্যয় দৈনিক তিনি পয়সা থেকে ছ' পয়সা।

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনে অনেক রকম ব্যবসাও করেছেন, পাট থেকে পশু চামড়া পর্যন্ত। জীবনানন্দও ছাতার বাঁটের ব্যবসা করবেন ভেবেছিলেন, পারেননি। জীবনবীমার দালাল হতে চেয়েছিলেন, পারেননি। রাস্তায় রাস্তায় খবরের কাগজের হকারি করতেও চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণে অঙ্গুষ্ঠ। বিশ্বপর্যটন করেছেন কয়েকবার, বৃক্ষ বয়েস পর্যন্ত। একান্তর বছর বয়েসে পারস্যের শাহেনশাহ-এর আমন্ত্রণে প্রেনে চেপেছেন, তারও পরে একবার অসুস্থ শরীর নিয়েও এলাহাবাদ থেকে মোটরগাড়িতে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে যান লাহোরে। আর জীবনানন্দ একেবারেই ঘরকুনো, বাংলা ছেড়ে কোথাও যেতে চান না। আঞ্চলিকস্বজনরা তাঁর জন্য পঞ্জাবে কিংবা শিলং-এ চাকরি ঠিক করে সেখানে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছেন, বেকার জীবনের অত কষ্ট সংস্কেত জীবনানন্দ যাননি। একবার বাধ্য হয়ে দিল্লির এক কলেজে কাজ নিয়েছিলেন, কয়েক মাস পরেই ছুটির সময় পালিয়ে এসে আর ফিরে যাননি।

অন্য কোনও দেশে পা দেননি জীবনানন্দ, কিন্তু তাঁর কবিতায় মিশর থেকে লিবিয়া পর্যন্ত অনেক দেশের নাম পাওয়া যায়। আর পৃথিবীর যে-প্রাণে বসেই লিখুন, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় শুধু বাংলার কথা।

তিরিশ বৎসর বছর বয়েসেই রবীন্দ্রনাথ রীতিমত্তন প্রতিষ্ঠিত, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, আর এ বয়েসে জীবনানন্দের মাত্র একখানা কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে, তাও বিশেষ কেউ পাস্তা দেয়নি, পত্র-পত্রিকা থেকে তাঁর কবিতা ফেরত আসে।

এই দুই কবি সম্পূর্ণ দুই বিপরীত মেরুর, প্রকৃতপক্ষে এঁদের কোনও তুলনাই চলে না।

জীবনানন্দের একমাত্র সম্মত আত্মবিশ্বাস। কবিতার জগতে নতুন কিছু ঘটাবার জন্য তিনি সচেতন। হন্তে হয়ে অধ্যাপনার চাকরি খুঁজেছেন, বাধ্য হয়ে শেষজীবন পর্যন্ত ওই চাকরিই করেছেন। কিন্তু কলেজে পড়ার কাজ তাঁর কোনওদিনই পছন্দ ছিল না। সদ্য আবিস্তৃত ডায়েরিতে তাঁর স্বগতোষ্ঠি: Very often I think that instead of frittering away my energy, I ought to just do that for what I stand and in which I excel & delight & which is my true vocation: literature (Poems & Publication) through a profession or calling which nourishes it...। (বিভাব: জীবনানন্দ স্মরণ সংখ্যা)

বেকার অবস্থায়, অমন দারিদ্র্য ও হীনস্মন্যতার মধ্যে বিশেষ কিছু লিখতেও পারছেন না জীবনানন্দ। মাঝে মাঝে পুরনো লেখাগুলো গুছোন। বুদ্ধের বসু কবিতা ছাড়াও গল্প-উপন্যাস-নাটক লিখছেন বলে কিছুটা ঈর্ষাণ্বিত। হয়তো সেই দৃষ্টান্তেই তিনি গল্প-উপন্যাস লিখতে শুরু করলেন ওই সময়ে। (যদিও একটি চিঠিতে জানা যায়, ছেলেবেলা থেকেই তাঁর গল্প উপন্যাস লেখার ইচ্ছে ছিল।) রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরীর মতন খ্যাতি অর্জনেরও বাসনা ছিল, দিনলিপিতে তার প্রতিফলন আছে। যাই হোক, এক দেড় বছরের মধ্যে তিনি প্রবল বেগে লিখেছেন অস্তত চোদ্দটি গল্প

ও একটি উপন্যাস। অনেক পেশাদার গদ্য লেখকের পক্ষেও এত লেখা সম্ভব নয়। জীবনানন্দ ওর একটা লেখাও ছাপতে দেননি। আজীবন তিনি কবি হিসেবেই পরিচিত রয়ে গেলেন, জীবৎকালের মধ্যে একটাও গল্প বা উপন্যাস মুদ্রিত হয়নি, অর্থ মৃত্যুর পর আবিস্কৃত (এখনও শেষ হয়নি) সংখ্যায় ও পরিমাণে এত গল্প ও উপন্যাস দেখে আমরা স্তম্ভিত।

বাংলা তিরিশের দশকের গোড়ায় ‘কল্পল’, ‘কালিকলম’ প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটা সাহিত্য আন্দোলন শুরু হয়, যাতে ছিল রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রমের প্রয়াস। একে রবীন্দ্রবিদ্রোহ বলা যায় না, ব্যক্তিগতভাবে এইসব তরঙ্গ কবি ও গল্পকারৱার রবীন্দ্র অনুরাগী এবং রবীন্দ্রনাথের স্মেহধন্য। তবে রবীন্দ্রচনা রীতিকে অনুসরণ করার বদলে নতুন সাহিত্যধারা সৃষ্টির চেষ্টাও স্বাভাবিক। কিন্তু এইসব তরঙ্গরা ঘোষণায় যতখানি রবীন্দ্র-উন্নত সাহিত্যের কথা বলেছেন, তাঁদের রচনায় তার তেমন প্রতিফলন নেই। জীবনানন্দ এই দলের গৌণ সদস্য, কিন্তু আন্দোলন-প্রবণতা তাঁর ছিল না, প্রকাশ্যে রবীন্দ্ররীতিকে অস্বীকার করার কথাও বলেননি। তিনি বলেছিলেন, নতুন ধারা সৃষ্টি হতে পারে ভাষার নতুন ব্যবহারে। কবিতার ইতিহাস তার আঙ্গিকের ইতিহাস।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর আঙ্গিক বদলাতে চাইছিলেন। সেইজন্য বলেছেন ছন্দ বর্জনের কথা। কিন্তু তিনি তখনও ঠিক ধরতে পারেননি স্টেগন্ডে লেখাই আধুনিকতা নয়, ছন্দ থাকা বা না থাকাতেও কিছু আসে যায় না। ক্ষয়েক বছর পরেই অবশ্য রবীন্দ্রনাথ আবার বেশ কিছু অসাধারণ ও স্মরণযোগ্য কবিতা লিখেছেন।

জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থটি আঙ্গিকশংকর। পরের কাব্যগ্রন্থ ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ পড়তে পড়তে মনে হয়, আগের ক্ষেত্রে, ‘ঝারা পালক’ যেন একই নামের অন্য কোনও কবির লেখা। এত আঙ্গিক পরিবর্তন কী করে হল, তা জানা সম্ভব নয়। তবে সচেতনভাবেই যে তিনি এই পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই।

‘পরিচয়’ পত্রিকায় ছাপা হয় ‘ক্যাম্পে’ কবিতাটি। বিক্ষু দে হাতে করে নিয়ে গিয়েছিলেন বলেই কি কবিতাটি ছাপা হয়? কারণ, উচ্চ-ভূরু সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দন্ত জীবনানন্দের কবিতা পছন্দ করতেন না। এর আগে ডাকে পাঠানো কবিতা ফেরত দিয়েছিলেন। কোন কবিতাটি ফেরত গিয়েছিল, তা জানতে পারলে বড় ভাল হত!

‘ক্যাম্পে’ কবিতাটি সম্পর্কে নাকি অশ্লীলতার অপবাদ উঠেছিল। এ এক মহাবিশ্বয়। তন্মতম করে খুঁজেও এ কবিতায় তথাকথিত অশ্লীলতার অভিযোগ ওঠার মতন কিছুই পাওয়া যায় না। শুধু এরকম একটি লাইন আছে: ‘মানুষ যেমন করে দ্রাঘ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে’। ‘নোনা মেয়েমানুষ’ দোষের? বলতে ইচ্ছে করে, হা কপাল! ওইখানে ওই ‘নোনা’ শব্দটা ব্যবহার করে জীবনানন্দ অপর কবিদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন।

এই কবিতায় কোনও বক্তব্য নেই। আঙ্গিকহীন আঙ্গিক। ছন্দ আছে খুব অলস ভাবে, অনেক পুনরুক্তি, সব মিলিয়ে এক ব্যর্থ প্রেমের বিষণ্নতা। ক্রোধহীন, অভিযোগহীন, পড়তে পড়তেই অনুভব করা যায়, এ এক নতুন কাব্যভাষা। ‘এখানে

বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি', এরকম একটা অতিশয় দুর্বল পঙ্ক্তি লেখার দুঃসাহস আর কোনও শিক্ষিত কবি দেখিয়েছেন কি? ইচ্ছে করেই তিনি সাধু, চলতি ক্রিয়াপদ মিশিয়েছেন, যেমন এই কবিতাতেই:

মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে
জেগেছে বিশ্বয়
লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম-স্বপ্নস্ফুট হয়ে
উঠিতেছে সব দিকে
আজ এই বসন্তের রাতে;
এইখানে আমার নকটাৰ্ন—।

এই কাব্যভাষা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অনুধাবন করা হয়তো সম্ভব ছিল না। তিনি জীবনানন্দের কবিতাকে 'চিরপময়' বলেছিলেন। বিভিন্ন লেখক-কবিকে উদারভাবে সার্টিফিকেট দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনেক শব্দ বানাতে হয়েছিল, এটাও সেরকম সার্টিফিকেটের ভাষা। কিছুই বোঝায় না। জীবনানন্দ নিজেও এই বিশেষণ মেনে নেননি।

কাছাকাছি সময়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা:

ঘরের মেঝেতে ফিকে নীল রঙের জাঞ্জিম পাতা
খয়েরি রঙের ফুল-কাটা।
দেয়াল বাসন্তী রঙের,
তাতে ঘন কালো রেখার পাড়
একটুখানি বারান্দা সুবের দিকে,
সেইখানে বসি সুর্যোদয়ের আগেই।

এই পঙ্ক্তিগুলিই বরং চিরপময়। কারুকার্য আছে, ব্যক্তিমূলেই।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে বেশ কিছু বৎসর কবিতায় হাত মকশো করেছেন বলা যায়। উল্লেখযোগ্য বা স্মরণযোগ্য সৃষ্টি বিশেষ নেই। যৌবন থেকে মধ্যজীবনই তাঁর কাব্যরচনার শ্রেষ্ঠ সময়। একাই তিনি বাংলা কাব্যকে তুলে নিয়েছেন বিশ্বস্তরে। বিশ্ববাসী পরবর্তীকালে তাঁর রচনা তেমনভাবে মনে রাখুক বা না রাখুক, এই পর্বের কবিতা বাঙালিকে আজও মাতিয়ে রেখেছে। যখন তিনি সন্তুর-উত্তীর্ণ, তখনও লিখে যাচ্ছেন প্রচুর, অভ্যসবশত, কিন্তু 'পুনর্জ', 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী', 'আকাশপ্রদীপ', 'নবজাতক', 'সানাই'—এইসব কাব্যগ্রন্থে প্রথিত কবিতাগুলিতে আর সে সুর বাজেনি, বারবার পাঠযোগ্য বা স্মরণযোগ্য কবিতা এই শেষ দশকে খুবই কম। নিজেও তিনি হয়তো সচেতন, তাই এরকম লেখা বেরিয়ে আসে:

পূর্ব যুগে অশোক গাছে নারীর চরণ লেগে

ফুল উঠতো জেগে

কলিযুগে লেখনীরে সম্পাদকের তাড়া

নিভাই দেয় নাড়া

ধাক্কা খেয়ে যে-জিনিসটা ফোটে খাতার পাতে

তুলনা কি কভু তার অশোক ফুলের সাথে...

মধ্য জীবনেও তিনি সম্পাদকের তাড়ায় কিংবা নানান অনুষ্ঠান উপলক্ষে ফরমায়েশি কবিতা লিখেছেন, তবু তা হয়ে উঠেছে অসামান্য। স্বতন্ত্র। এখন এসে যাচ্ছে কষ্টকল্পনা। আধুনিক কবিদের ধারা থেকে তিনি পিছিয়ে পড়তে চান না, যে-কোনও কবির পক্ষেই তা বেদনাদায়ক। এত যশ, এত সার্থকতার পরও একথা তিনি ভুলতে পাচ্ছেন না। সেইজন্যই ‘আকাশপ্রদীপ’ কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করলেন তাঁর বঙ্গপৃষ্ঠ ও আধুনিক কবিদের অন্যতম পুরোধা সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে। উৎসর্গপত্রে লিখলেন, ‘তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে, এমনতরো অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনিনি। তাই আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে, এই আশা করে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম, তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো।’

লক্ষণীয়, কিছুদিন আগে তিনি ছন্দকে বর্জন করে গদ্যকে কবিতার ভাষার উপযোগী বলে যে ঘোষণা করেছিলেন, পরে তার অসারতা বুঝতে পেরেছিলেন। আবার ফিরে এসেছিলেন প্রথাগত ছন্দমিলে। রবীন্দ্রনাথের ধারণা হয়েছিল, আধুনিকরা বাস্তবতার নামে কৃৎসিত কর্দম্য বিষয় নিয়ে বাড়াবাঢ়ি করে। রবীন্দ্রমানসের সঙ্গে তা কিছুতেই মেলে না, তবু দু'একবার পাল্লা দেবার চেষ্টা করে এরকম লেখেন:

কাঁঠালের ভূতি পচা, আমটি মাছের যত আঁশ
রামাঘরের পুঁশ,
মরা বিড়ালের দেহ পেঁকো নর্দমায়
বীভৎস মাছিস্কল ঐকতান বাদন জমায়।
ক্ষেষ রাত্রে মাতাল বাসায়
স্তীকে মারে, গালি দেয় গদগদ ভাষায়...
(অনসুয়া: সানাই)

বলাই বাহল্য, এরকম পঞ্জকি আধুনিকও নয়, কবিতাও নয়।

আধুনিকতা মানে শুধু বাস্তবতা নয়, তা ক্ষণে ক্ষণে পৌছে যায় পরাবাস্তবতায়। অনুভবের নানান স্তর এসে পড়ে সেখানে। পশ্চিমী দেশগুলির চিত্রকলার বিবর্তনে আমরা দেখতে পাই, অনেক শিল্পী অত্যুৎসাহে পরাবাস্তবতার স্তরও পেরিয়ে যেতে চেয়েছেন সম্পূর্ণ বিমূর্ততায়, যার ফল সুবকর হয়নি। সম্পূর্ণ বিমূর্ততায় শ্রষ্টার সঙ্গে দর্শক-পাঠকদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়, সৃষ্টির উদ্দেশ্যই নষ্ট হয় তাতে। অনেক সময় বিমূর্ততা পর্যবসিত হয়েছে উন্টপন্নায় কিংবা পাগলামিতে। কবিতাতেও এমন হয়েছে। সেই সব কবি ও শিল্পী আবার ফিরে এসেছেন কিছুটা বাস্তব আঙিকে।

জীবনানন্দ দাশ তা আগেই বুঝেছিলেন। তাই তাঁর কবিতা কখনও বাস্তবচূর্যত নয়, মাঝে মাঝে বিমূর্ততার ছায়া এসে রহস্যের বাতাবরণ দিলেও আবার ফিরে আসে চেনা জগতে। তাই পাঠককে বিমুখ করে না। যেমন:

হিমের রাতে শরীর 'উম' রাখবার জন্য দেশোয়ালীরা
সারারাত মাঠে আগুন জ্বেলেছে—

মোরগফুলের মতন লাল আঞ্চন;
শুকনো অশ্বথ পাতা দুমড়ে এখনো আঞ্চন

জ্বলছে তাদের;

সূর্যের আলোয় তার রঙ কুসুমের মতো নেই

আর

হয়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ

ইচ্ছার মতো।

সকালের আলোয় টলমলে শিশিরে চারিদিকের

বন ও আকাশ

ময়ুরের সবুজ নীল ডানার মতো খিলমিল

করছে...

সহজ, বর্ণনাময় কবিতা। ‘মোরগফুলের মতন লাল’, ‘কুসুমের মতো’, কিংবা ‘ময়ুরের সবুজ নীল ডানার মতো’, এই উপমাগুলি উপভোগ্য এবং স্বন্দর। কিন্তু ‘রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো’ উপমা ভূ-ভারতে কেউ আগে শোনেনি। ওই পঙ্ক্তিটিই কবিতাটির দিকে আমাদের বারবার আকৃষ্ট করে।

এ গেল একটা দিক। জীবনানন্দর কোনও কৃতিতেই আঁটোসাঁটো বাঁধন নেই। একই পঙ্ক্তি বা একই শব্দ বারবার ব্যবহার করা হয়েছে, তার ফলে সৃষ্টি হয় এক আবেশের তন্ত্রয়তা। জীবনেরই মতন, এইসব কবিতায় কোনও মানচিত্র নেই, চেনা পথ নেই। এক পঙ্ক্তি থেকে আর একটি পঙ্ক্তি যেন বিছিন্ন, যেন পারম্পর্যহীন, সেই মাঝখানের ফাঁকগুলিতে রাজে গেছে অনেক ইশারা ও ইঙ্গিত। সেইজন্যই এইসব কবিতা বারবার টানে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে জীবনানন্দর এই কবিতার আঙ্গিক অনেক দূরে। তাঁর সমসাময়িক কবিদের থেকেও দূরে। সেইজন্যই, অন্ন বয়েসে অকালমৃত্যুর পরেও জীবনানন্দর কবিতা আমাদের মুক্ত করে রেখেছে। একটা বয়েস পর্যন্ত আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রচুর পাঠ করে, আপ্নুত হয়ে, জীবনানন্দে পৌছবার পর রবীন্দ্রনাথকে একপাশে সরিয়ে রেখেছি।

এহ বাহ্য। শুরু করেছিলাম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জীবনানন্দের প্রতিতুলনা দিয়ে। দুই কবির মধ্যেই সত্যিই কি তুলনা হয়? জীবনানন্দের সৃষ্টির জগৎটি বেশ ছোট। তাঁর প্রতি আমাদের মুক্তা অনেকটা মোহগ্রস্তর মতো। যাঁরা অকালমৃত, জীবিতকালে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত, কিংবা নেশাগ্রস্ত বোহেমিয়ান হয়ে নিজেই জীবনকে ক্ষয় করেন, তাঁদের প্রতি আমাদের বিশেষ সহানুভূতি থাকে, কিন্তু কীটসের কবিতার ভক্ত হয়েও কি তাঁকে শেঁকপীয়ারের ঢেয়ে বড় কবি বলা যায়? জীবনানন্দের মৃত্যুর পর আবিঙ্গত, অপ্রকাশিত গল্প ও উপন্যাসগুলি অন্য আলোচনার বিষয়। কিন্তু ‘বেলা অবেলা কালবেলা’র পর জীবনানন্দের যে-সব অপ্রকাশিত কবিতাগুলি পাওয়া যাচ্ছে, মনে হয়, তিনি ইচ্ছে করেই সেগুলি প্রকাশ করেননি। অধিকাংশই বেশ দুর্বল, যেন

একই কবিতার বিভিন্ন খসড়া, নতুন কোনও বিশ্ময়কর ঝলক নেই। গবেষকদের কাছে প্রয়োজনীয় হতে পারে, পাঠকদের নয়। তাঁর সীমাবদ্ধতাও আমাদের জানা হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ, গ্যেয়টে, শেক্সপীয়ার বা ভিট্টের হৃগোর মতন কবিদের সৃষ্টিক্ষমতা অনেক ব্যাপক। এঁরা নিছক কবির মতন লাজুক, নিভৃতচারী হন না, হন দারুণ বাস্তবতা স্তানসম্পন্ন, পরিশ্রমী, ভোগী, অণু থেকে ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে কৌতুহলী। সাহিত্য ছাড়াও অন্য অনেক দিকে ছড়িয়ে থাকে এঁদের আগ্রহ, গ্যেয়টে যেমন বহু রমণীচর্চা করেছেন, তেমনই গবেষণা করেছেন গাছপালা নিয়ে। উদ্ধিদিবিজ্ঞানী হিসেবেও তাঁর স্বীকৃতি আছে, রাজনীতির সঙ্গেও সম্পর্ক তো ছিলই। রবীন্দ্রনাথ যেমন ছবি এঁকেছেন, ব্যবসা করেছেন, সারা দেশের বিবেক-প্রতিভূ হয়েছিলেন, একটি সাধারণ ছোট্ট বিদ্যালয়কে পরিণত করেছেন মহীরুহে, আবার অত ব্যন্ততার মধ্যেও শেষ জীবনেও রচনা করেছেন অসামান্য কিছু গান, লিখেছেন ‘যোগাযোগ’-এর মতন গভীর উপন্যাস, অনবদ্য গদ্যে ‘চার অধ্যায়’।

রবীন্দ্রনাথকে আঘাত বা অস্বীকার করা পরবর্তী লেখকদের ব্যসন। কিছুটা প্রয়োজনীয়ও বটে। লেখার সময় আঘাতবিশ্বাস খানিকটা নড়বড়ে হয়ে গেলে এটা কাজে লাগে। তা ছাড়া রবীন্দ্রভক্তদের অতিরিক্ষ বাড়াবাঢ়ির জন্যও এরকম প্রতিক্রিয়া হয়। কোনও প্রাঞ্জ সমালোচক যখন বলেন, রবীন্দ্রনাথের পর বাংলায় আর কোনও কবিতাই লেখা হয়নি, তখন অনেকে বলতে চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের চেয়েও জীবনানন্দ বড় কবি। কখনও কখনও এরকম আমিও বলেছি, তা উচ্ছ্বাসের আতিশয় ছাড়া কিছুই নয়। জীবনানন্দ আমাদের অন্যরকম কবিতার স্বাদ দিয়েছেন, সেখানেই তাঁর সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই। দুধের দাঁত পড়ার বয়েস থেকে শেষ নিশ্চাসগুলি খরচ করা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবন জুড়ে আছেন।

ধানসিডি নদীর সঙ্কানে

অবিভক্ত বাংলার পূর্ববঙ্গে, ফরিদপুর জেলার এক গন্ধগ্রামে আমার জন্ম। কিন্তু বাল্যকালে ফরিদপুর থেকে কলকাতায় অনেকবার এসেছি বটে, কিন্তু ওদিকে, আরও পূর্বে কখনও যাওয়া হয়নি। এমনকী ঢাকা শহরও দেখিনি। আমার প্রথম ঢাকা-দর্শন পাকিস্তান আমল শেষ হবার পর, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রথম মাসে।

তারপর বাংলাদেশে যাওয়া আসা করেছি অনেকবার, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকবারই আটকে গেছি ঢাকায়। বার দু'এক চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ভ্রমণ করেছি যদিও, কিন্তু অন্য জেলাগুলি দেখার সুযোগ ঘটেনি। ঢাকার বন্দুরা অন্য অনেক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বটে, কিন্তু আজ্ঞার নেশায় মেতে প্রতিবারই ঘনিয়ে এসেছে ফেরার দিন।

একবার অপ্রত্যাশিত সুযোগ এসে গেল।

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন গণতন্ত্রের দিক থেকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই নির্বাচন সুস্থ ও নিরস্তোক হয় কিনা তা পর্যবেক্ষণের জন্য পৃথিবীর বহু দেশ থেকে প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছিলেন। সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি থেকেও প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়েছিল, তার মধ্যে ভারত থেকে দশজন, সেই ভারতীয় দলটির মধ্যে কী করে যেন দৈবাং আমাকে অঙ্গুক্ত করা হল। অ-রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল পর্যবেক্ষক হিসেবে। এই দলে আরও দু'জন বাঙালি ছিলেন বটে, প্রখ্যাত সাংবাদিক নিখিল চক্রবর্তী এবং বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক আশিস নন্দী, দু'জনেই দিল্লি প্রবাসী, পশ্চিমবাংলা থেকে আমিই একমাত্র।

নির্বাচনের পর্যবেক্ষক, তাই সরকারি ভাবে দারুণ খাতির যত্নের ব্যবস্থা। বিমান থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে কূটনৈতিক বিভাগীয় ব্যক্তিরা ভি আই পি লাউঞ্জে নিয়ে গেলেন, তারপর তুললেন ঢাকার সর্বোচ্চম হোটেল। সর্বক্ষণের ব্যবহারের জন্য ড্রাইভার সমেত গাড়ি। যাওয়া-দাওয়ার স্বাচ্ছন্দ্যের কথা আর বর্ণনা দিয়ে কাজ নেই। কে বলবে যে এক দরিদ্র দেশে এসেছে আর এক দরিদ্র দেশের মানুষ!

ইউরোপ-আমেরিকা-জাপান থেকেও পর্যবেক্ষকরা এসেছেন, সকলকে শুধু ঢাকায় বসিয়ে রাখার কোনও মানে হয় না। তাই প্রস্তাব নেওয়া হল যে, পর্যবেক্ষকদের ভাগ ভাগ করে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বিভিন্ন জেলায়। আমাদের আপ্যায়নের ভার যাঁরা নিয়েছেন, বাংলাদেশের সেইসব কর্তাব্যক্তিদের অনেকের সঙ্গেই আমার আগে থেকে চেনাশুনো, তাঁরা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোনও বিশেষ জেলা আমার পছন্দ কিনা। তা হলে তাঁরা সেখানেই আমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা

করে দেবেন। প্রায় কিছু না ভেবেই আমি বললাম, বরিশাল।

তাঁরা বেশ অবাক হয়েছিলেন। অনেকেই জানতেন যে, আমার জন্মস্থান ফরিদপুর তথা মাদারিপুরে। আগে মহকুমা ছিল, এখন মাদারিপুর একটি স্বতন্ত্র জেলা। আমি তো ইচ্ছে করলেই মাদারিপুর বেছে নিয়ে সেখানে গিয়ে স্মৃতি রোমস্থনের সুযোগ পেতাম। কিন্তু সেখানে যেতে আমার ইচ্ছে করে না।

আরও তো জেলা ছিল, তবু বরিশাল আমি বেছে নিলাম কেন? বরিশালে আমার তেমন চেনাশুনো কেউ নেই। আলাদা কোনও আকর্ষণ নেই। তবে কিছুদিন আগে তপনমোহন রায়চৌধুরীর লেখা স্মৃতি-রমাকাহিনীতে বরিশাল সম্পর্কে অনেক কিছু পড়েছিলাম, সেইজন্য কি বরিশাল নামটা প্রথমে মনে এসেছিল?

আর একটি চমৎকার ব্যাপার ঘটল। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আর একজন যে পর্যবেক্ষককে আমার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হল, সে আমার পূর্ব পরিচিত তো বটেই, আমার প্রিয় ও বিশেষ স্নেহভাজন ইমদাদুল হক মিলন। মিলন বাংলাদেশের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার, অল্প বয়েস থেকেই সে দারুণ জনপ্রিয়, তা ছাড়াও তার মতন পড়ুয়া আমি খুব কম দেখেছি। বাংলা সাহিত্যের যাবতীয় রচনা তার পড়া, তার স্মৃতিশক্তিও ভাল। মিলনের সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়। আমাদের তত্ত্বাবধানের জন্য পররাষ্ট্র দফতরের এক তরুণ অফিসারকেও সঙ্গে দেওয়া হল, তার নাম আনোয়ার। বয়েস বেশ কম, প্রথম প্রথম তার ব্যবহার বেশ আড়ষ্ট মনে হয়েছিল। সে আমাকে মিস্টার গঙ্গোপাধ্যায় বালি সম্মোধন করছিল, কোনও বাঙালির মুখে এ রকম সম্মোধন শুনলে আমার পিস্তল ছলে যায়। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, এ ছেলেটি মেধাবী ছাত্র, পরীক্ষা দিয়ে চাকুর পেয়েছে। কেরিয়ার ডিপ্লোম্যাট হতে চায়, সাহিত্যের ধারে ধারে না, আমি মেকিছু লিখি টিখি তা সে জানেও না। একদিন পরেই ভুল ভেঙেছিল, আনোয়ার অসলে বেশ লাজুক, রোমান্টিক, সাহিত্য প্রেমিক, নিজেও কিছু কিছু লেখে। আমি তার তুলনায় অনেক বয়স্ক লেখক বলেই সে প্রথমে স্বাভাবিক হতে পারেনি। এক সময় মন্দু গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, আমি কি আপনাকে সুনীলদা বলে ডাকতে পারি?

নির্বাচনের দু দিন আগে আমরা গাড়িতে যাত্রা করলাম বরিশালের দিকে। গাড়িতে বরিশাল? পূরনো আমলের মানুষেরা একথা শুলে বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলবেন। বরিশাল অনেক নদী ও জলাভূমি ঘেরা জেলা, ট্রেন লাইন নেই, স্থলপথে যাবার কোনও উপায়ই ছিল না বহুকাল। নৌকো বা স্টিমারই ভরসা। পরাধীন আমলে সাহেবরা খুলনা থেকে বরিশাল পর্যন্ত যাত্রিবাহী স্টিমার চালাতেন। তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে জ্যোতিরিণ্ড্রনাথ ঠাকুর স্বদেশী স্টিমার সার্ভিস চালু করে সর্বস্বাস্ত হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের পথঘাটের এখন অনেক উন্নতি হয়েছে। পশ্চিমবাংলার সঙ্গে কোনও তুলনাই চলে না। সর্বত্রই মসৃণ রাস্তা। এত নদী, সব জায়গায় এখনও ব্রিজ তৈরি হয়নি, কিন্তু গাড়ি কিংবা বড় বড় যাত্রিবাহী বাস ফেরিতে পার করে দেবার সুন্দর ব্যবস্থা। ফেরিঘাটে বেশিক্ষণ অস্পেক্ষা করতে হয় না। মোট ন'বার ফেরিতে নদী পার

হতে হয়েছে, তার মধ্যে এক জায়গাতে সময় লেগেছে পৌনে দুঃখটা।

ঢাকা থেকে এদিকে আসতে গেলে দুটি ঘাট দিয়ে পদ্মা পার হতে হয়। আরিচা আর মাওয়া। আমরা এসেছিলাম বিক্রমপুরের মধ্য দিয়ে মাওয়া ঘাটে। এই বিক্রমপুরে ইমদাদুল হক মিলনের পৈতৃক বাড়ি। সে চলন্ত গাড়ি থেকে হাত তুলে কিছুদূরে তার বাড়িটা দেখালো। আমি ওই ভাবে আমার নিজের বাড়ি দেখাতে পারব না। আমাদের মতন যাদের বাড়ির অস্তিত্ব এখনও ওই অঞ্চলে আছে, সেগুলি নাকি ‘শক্র সম্পত্তি’। আমি কী করে আর একজন বাঙালির শক্র হয়ে গেলাম, তা জানি না।

মাওয়া ঘাট থেকে যে স্টিমারে ওঠা হল, সেটি মস্ত বড়, প্রায় জাহাজের মতন। দিগন্ত বিস্তৃত পদ্মা। এখনকার ক্যান্টিনে খাওয়া হল ইলিশ মাছের ঝোল আর ভাত। খুব যে আহামরি লাগল তা নয়। সাধারণ রাঙ্গা। এককালে এইসব স্টিমারের খালাসিদের রামার খুব খ্যাতি ছিল। গরম গরম ঝাল ঝাল মুর্গির ঝোল ছিল অনবদ্য। আজকাল পূর্ববাংলার রাঁধনিরাও ঝাল দিতে ভুলে গেছে। পদ্মার ইলিশের চেয়ে এদিককার কোলাঘাটের গঙ্গার ইলিশের স্বাদ যে অনেক বেশি ভাল, তা শুনলে ওদিকে অনেকে চটে যান। পদ্মায় অনেক বেশি ইলিশ পাওয়া যায়, কিন্তু স্বাদে এদিককার গঙ্গার ইলিশ যে উন্নতমতর, তা অনেকে স্মীকার করেন না।

পদ্মা পার হবার একটু পরেই আবার একটি ঝোল পার হতে হল। আড়িয়াল খাঁ। আমার ছোটবেলার নদী। ‘সে কেন দেখা দিলেও, না দেখা ছিল যে ভাল !’ আমার চোখ জ্বলা করে উঠেছিল। নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কী এক দুর্দান্ত, গর্জমান, অনবরত পাড়-ভাঙ্গা নদীর ছবি আছে স্মৃতিতে, তার বদলে এখন চুপচাপ বয়ে চলেছে নিরীহ, সাধারণ এক নদী। হয়তো আগোও এরকমই ছিল, বাল্যকালে সব কিছুই বড় বড় লাগে। ইঙ্গুলের মাঠটাকে মনে হয় প্রকাণ, বাড়ির পাশের দিঘিটার ওপারও যেন ছিল রহস্যময় জঙ্গলে ঢাকা, এক একটা রাস্তাকে মনে হত অনন্তের পথ। তা ছাড়া আড়িয়াল খাঁ-কে আমি হয়তো স্মৃতিতে ধরে রেখেছি তরা বর্ষার সময়কার রূপে। এখন প্রবল গ্রীষ্ম, সব নদীই শীর্ণ। এবং আছে ফরাক্কা বাঁধের সমস্যা, যে জন্য বাংলাদেশের নদীগুলিতে জল কম আসে। বাঁধ বেঁধে বেঁধে পৃথিবীর সব দেশের নদীগুলিই ঘোবন হারিয়েছে। কলকাতার গঙ্গার মাঝখানে গ্রীষ্মকালে লোকে হেঁটে বেড়ায়, বেলুড়ের কাছে আমি নিজে দেখেছি।

রাস্তার ধারে ধারে গ্রাম ও শহরগুলির নাম লেখা। ফরিদপুর, মাদারিপুর পেরিয়ে গেলাম। একটা জায়গার নাম দেখে বুকটা ধক করে উঠেছিল একবার। ট্যাকের হাট ! এর খুব কাছেই আমার মামাবাড়ি আমগ্রাম। ওই মামাবাড়িতেই আমার প্রথম ঘোবন-উদ্ঘেষ হয়েছিল। ওইখানে সাঁতার শিথি। যখন তখন ইজের আর গেঞ্জি খুলে নিয়ে ল্যাংটো হয়ে এক হাত উঁচু করে ধরে, আর এক হাতে সাঁতার কেটে খাল পার হয়ে গেছি। ওইখানেই প্রথম সামনাসামনি দেখি মৃত্যু, আমার দাদামশাইয়ের। এখানেই প্রথম হাতেখড়ি। ওখানেই প্রথম দুর্গাপুজোর সময় পাঁঠাবলি দেখে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে আমি ছাদের এক কোণে বসে লুকিয়ে কেঁদেছিলাম।

গাড়িটা একটু ঘোরালেই আমার সেই মামার বাড়ি—আমবাগান-আটচালা-পুকুর
এখন কী অবস্থায় আছে দেখে আসতে পারি। না, যাব না, কিছুতেই যাব না।

বিকেলের মধ্যে পৌছে গেলাম বরিশাল।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বরিশাল শহরে আমাদের আগমনবার্তা রটে গেল, যদিও
কারুকেই আগে থেকে খবর দেওয়া হয়নি। আস্থাগোপন করে থাকা মুশকিল। মিলন
অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক, তা ছাড়া বাংলাদেশ টেলিভিশনে তার ধারাবাহিক অনুষ্ঠান
হয়, সে নিজেও অনেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয় সশরীরে। সুতরাং পাঠকদের কাছে
তার মৃৎ বিশেষ পরিচিত। এবং আশ্চর্য ব্যাপার, আমাকেও কেউ কেউ দেখেই
চিনতে পেরে যায়।

পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে এসেছি। নিয়মমাফিক আমরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট,
পুলিশের এস.পি., পোলিং অফিসার কয়েকজনের কাছে খোঁজখবর নিতে গেছি।
এইসব আমলারাও বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে একেবারে অস্ত নন। কেউ কেউ অবশ্য
বলেন, আমি নিজে অবশ্য আপনার সেখা কিছু পড়িনি। কিন্তু আমার বউ আপনার
ভক্ত, বাড়িতে আপনার বই আছে। আবার কেউ কেউ আমাদের অবাক করে দিয়ে
আমার কবিতার দু'চার লাইন মুখ্য বলে দেয়, কিংবা মিলনের কোনও উপন্যাসের
কাহিনী।

সাংবাদিকদের কাছে ধরা পড়ে গিয়ে পরদিন যেতে হল স্থানীয় প্রেস ক্লাবে।
অনেকেই বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতে চান। তাতে কিছুতেই রাজি হই না। পূর্ব
অভিজ্ঞতা থেকে জানি, এক বাড়িতে অমন্ত্রণ গ্রহণ করলে আরও অনেক বাড়িতে
যেতে হবে, তারপর বত্রিশ ব্যঙ্গন থেক্টে থেতে প্রাণান্তকর অবস্থা হবে। বাংলাদেশের
মানুষদের মতন এত অতিথি পরামর্শণ মানুষ আর কোথাও দেখিনি।

বরিশাল শহরে হিন্দুদের সংখ্যা এখনও নগণ্য নয়। অস্থিলী দস্ত এককালে ছিলেন
বরিশালের মুকুটহীন রাজা। এখানকার টাউন হলটি এখনও তাঁর নামে। বরিশালের
আর একজন স্বনামধন্য পুরুষ ফজলুল হক। ভারতীয় কংগ্রেস যদি এক সময় তাঁর
সঙ্গে অসহযোগিতা না করত, তা হলে বোধহয় এ উপমহাদেশের ইতিহাস অন্যরকম
হত।

এককালের সুখ্যাত ব্রজমোহন কলেজ বা বি এম কলেজ এখনও সঁজোরবে
চলছে। সম্প্রতি এই কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার প্রস্তাব উঠেছে।

সঙ্কেবেলা হোটেলের ঘরে বসে আড়ডা দিতে দিতে মিলন বলল, সুনীলদা, এই
শহরে জীবনানন্দ দাশ কোন বাড়িতে থাকতেন, তা খুঁজে বার করলে হয় না?

মিলন কবিতা লেখে না, শুধুই গদ্যকার, কিন্তু অ্যান্য অনেক গদ্যকারের সঙ্গে
তার তফাত এই যে, সে খুব কবিতা ভালবাসে। অনেক সময় তার সঙ্গে আমার
গল্প-উপন্যাসের বদলে কবিতা নিয়েই কথা হয়।

বরিশালে এলে জীবনানন্দ দাশের কথা মনে পড়বেই, তাঁর বাড়িটি দেখার ইচ্ছে
আমারও মনে উঠি দিয়েছিল।

আমি এ ঘাসের বুকে শুয়ে থাকি—শালিখ নিয়েছে নিঙ্গরায়ে

নৰম হলুদ পায়ে এই ঘাস; এ সবুজ ঘাসের ভিতরে
সৌন্দা ধূলো শুয়ে আছে—কাচের মতন পাখা এ ঘাসের গায়ে
ভেরেগুফুলের নীল ভোমরারা বুলাতেছে—শাদা স্তন ধরে
করবীর: কোন্ এক কিশোরী এসে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে ফুল,
তাই দুধ ঝরিতেছে করবীর ঘাসে ঘাসে: নৰম ব্যাকুল।

জিঞ্জেস করলাম, সে বাড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে কি এতদিন পর? ওঁদের কেউ তো
এখানে নেই শুনেছি।

মিলন বলল, লোকাল কারুর সাহায্য নিতে হবে। শহরটা আমিও ভাল চিনি না।

পরদিন একজন সাংবাদিককে পাকড়াও করা হল। সুবিধের মধ্যে এই যে,
আমাদের সঙ্গে একটি গাড়ি আছে। পেট্রোলের চিপ্তা নেই, এবং ড্রাইভার ভদ্রলোকটি
গোমড়ামুখো নন। বরিশাল শহরের মধ্য দিয়ে একটি রাস্তা চলে গেছে, তার নাম
বগুড়া রোড। সেই রাস্তার এক বাঁকের মুখে খুঁজে পাওয়া গেল সেই বাড়ি।
আশেপাশে বড় বড় হর্ম্য উঠে গেছে, কিন্তু এ বাড়িটি ছিমছাম একতলা। গেট পেরিয়ে
ছেট্ট একটি উঠোন, অনেকটা বাগানের মতন, এদিক ওদিকে কয়েকটি ঘর, পাকা
দেওয়াল, ওপরে টালির ছাউনি। বাড়িটিতে এখনও বেশ একটা শাস্ত্রী আছে।
বর্তমানে এক মুসলমান পরিবার এখানে থাকেন, তাঁরা যত্ন করে আমাদের দেখালেন।

প্রায় পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে, এ বাড়ি একেই রকম থেকে যাওয়া সম্ভব নয়।
কিছুটা অদলবদল ও সংস্কার হয়েছে নিশ্চিন্ত, কিন্তু একেবারে খোল নলচে বদলে
যায়নি। একদিকের একটি ঘর দেখিয়ে একজন জানালেন যে, সেটি প্রায় আগের
মতনই আছে। কল্পনা করা যায়, জীবনানন্দ দাশ ওই ঘরে বসে লিখতেন।

কতদিন তুমি আর আমি এমন স্থানে বসিয়াছি ঘরের ভিতর
খড়ের চালের নিচে, অঙ্ককারে; সন্ধ্যার ধূসর সজল
মন্দু হাত খেলিতেছে হিজল জামের ডালে...

সে বাড়িতে আমরা বেশিক্ষণ থাকিনি। একটা বাড়ি অত দেখবার কী আছে? এক
বলক দেখলে বেশি মনে থাকে।

গেটের পাশে সে বাড়ির নাম লেখা আছে ‘ধানসিডি’। জীবনানন্দের আমলের নয়,
বর্তমান মালিকেরা এই নাম দিয়েছেন। তাঁরা ওই কবির অনুরাগী।

তখন মনে হল, তা হল ধানসিডি নদীটাও খুঁজে দেখলে হয়। ওই নামে সত্যি
কোনও নদী আছে?

বরিশালের বেশ কয়েকজন চরুণ লেখক ও সাংবাদিক জানাল যে, ওই নামে নদী
একটি নদী অবশ্যই আছে, তারা সবাই শুনেছে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, তারা কেউ জানে না নদীটা ঠিক কোথায়, কেউ দেখেনি।
দেখার আগ্রহও হয়নি?

ধানসিরি নামে একটি নদী আছে আসামে। ওখানে সুবনসিরি, ধানসিরি এই রকম
নদীর নাম হয়, কিন্তু বানান আলাদা। জীবনানন্দ লিখেছেন ধানসিডি, চন্দ্রবিন্দু দেননি।

পৃথিবীর পথে ঘুরে বছ দিন অনেক বেদনা প্রাণে স'য়ে

ধানসিড়িটির সাথে বাংলার শুশানের দিকে যাবো ব'য়ে

যেইখানে এলোচুলো রামপ্রসাদের সেই শ্যামা আজো আসে...

জীবনানন্দ নিশ্চিত আসামের নদীটির কথা লেখেননি, তাঁর নদীটি একান্তই বাংলার গ্রাম্য নদী। এক নামে একাধিক নদী থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ইছামতী ও যমুনা নামে বহু জায়গায় আলাদা আলাদা নদী আছে। বৈতরণী নামে নদীও একাধিক।

বরিশাল শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ‘কীর্তনখোলা’ নদী। বেশ নামটি।। কিন্তু জীবনানন্দ তাঁর কোনও কবিতায় ‘কীর্তনখোলা’ নামটি ব্যবহার করেননি, অথচ দূরবর্তী ধলেশ্বরীর কথা এসেছে বারবার।

‘কীর্তনখোলা’ নদীটির রূপ উপভোগ করা যায় না। এককালে বরিশাল শহরটি নাকি সুন্দর ছিল, নদীর ধার দিয়ে বেড়াবার রাস্তা ছিল, এখন তা বোঝার উপায় নেই। নদীর ধারে কলকারখানা ও বড় বড় গুদামঘর নদীকে একেবারে ঢেকে দিয়েছে, নদী দেখাই যায় না প্রায়। জনসংখ্যার চাপে শহরটি শ্রীহীন।

নির্বিচনের দিনটিতে আমাদের কাজ বিভিন্ন পোলিং বুথ ঘুরে ঘুরে দেখা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা। কোথাও কোনও কারচুপি বা জোর জবরদস্তি চললে, বা সেরকম কোনও অভিযোগ শুনলে লিখে নিতে হবে। মোটামুটি নির্বিশেই ভোট চলছে, অনেক পোলিং ঘুরের সামনে লম্বা লাইন, সুতৰাং আমাদের করণীয় তেমন কিছু নেই। আমি ও মিলন ঘোরাঘুরির ফাঁকে ফাঁকে খুঁজতে লাগলাম ধানসিড়ি নদীটি।

আগেকার বরিশাল এখন অনেক ভাল হয়ে গেছে। মহকুমাশুলি এখন ছেট ছেট জেলা। যেমন ঝালকাঠি (উচ্চারণঃ ঝালোকাঠি), পটুয়াখালি এগুলোও এখন জেলা, সব মিলিয়ে এখনও বলা হয় বৃহস্তর বরিশাল। এই বৃহস্তর বরিশালই আমাদের পরিদর্শন এলাকা। আমরা গাড়ি নিয়ে ঘুরছি অনবরত। শহরের ছেলেরা কেউ ধানসিড়ি নদীর সন্ধান দিতে পারেনি, আমরা যে-কোনও নদীতে খেয়া পার হবার সময় স্থানীয় লোকদের কাছে ধানসিড়ির খোঁজখবর নিই। কেউই সঠিক কিছু বলতে পারে না। একটা নদীর অস্তিত্ব আছে, অথচ দেখা যায় না, এ কী মায়া-নদী নাকি?

ঝালকাঠির দিকে যাবার জন্য প্রায়ই আমাদের একটি নদী পার হতে হয়। এদিকের অনেক নদীর নামই বেশ সুন্দর। যেমন, একটি নদীর নাম সন্ধ্যা! কিন্তু এই নদীটির নাম মোটেই সুন্দর নয়, বরং অস্তুত, মানে বোঝা যায় না। ডাবখান। কেউ কেউ বলল, এটা নদী নয়, কাটা খাল, যদি তাও হয়, তা হলেই বা একটা খালের নাম ডাবখান হবে বেন? সমুদ্রের কাছাকাছি এই নদী-মাতৃক দেশে ডাব পাওয়া যায় সর্বত্র। এখানকার ডাবের আলাদা কোনও বৈশিষ্ট্য নেই, বরং এখানকার সোনালি মর্তমান কলার স্বাদ অপূর্ব! কলা নয়, যেন ক্ষীর।

যাই হোক, এই ডাবখান পারাপারের সময় একজন মাঝি জোর দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, ধানসিড়ি নদী আছে ওই তো ওদিকে। ওদিকপানে অনেকগুলো নদী মিলেছে।

ডাবখান নদীর ধার দিয়ে বাঁধানো সড়ক নেই, মাঝিটি যেদিকটায় হাত তুলে

দেখাল, সেদিকে গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে না। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে নৌকো ভাড়া নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু খেয়ার লঞ্চ ছাড়া শুধু যাত্রী পারাপারের জন্য খেয়ার নৌকোও আছে, সে নৌকো ভাড়া নেওয়া যাবে না। অন্য কোনও নৌকো নেই, বলুন নৌকোই নির্বাচনের ডিউটি দিচ্ছে। কোনওক্রমেই কি ওই অনেক নদীর সঙ্গমস্থানটিতে যাওয়া যাবে না? খেয়ার ঘাটে অন্যান্য লোকদের জিঞ্জেস করলে সকলেই মাথা নেড়ে বলে, মুশকিল, এখান থেকে যাওয়া খুব মুশকিল। কেউ কেউ বিস্ময়ে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটা অকিঞ্চিত্কর নদী দেখার জন্য আমাদের এই ঝাকুলতার কারণ বুঝতে পারে না। কী আছে সেখানে?

তা হলে, ধানসিডি নদীটি জীবনানন্দের স্বকপোল কঞ্চিত নয়, একটা ওই নামের বাস্তব নদী কাছেপিঠে আছে ঠিকই। সচরাচর যাতায়াতের পথে পড়ে না। ডাবখানের তীরে আমরা বেশি সময় কাটালে আমাদের সঙ্গী আনোয়ার বিনীতভাবে আমাদের কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। এখনও অনেক পোলিং বুথ দেখা বাকি রয়ে গেছে। আমরা ফিরে যাই। কিন্তু যদি মারামারি না হয়, বুথ দখল বা বোমা ছোঁড়ার ঘটনা না ঘটে, তা হলে আর দেখার কী আছে? ঘোরাঘুরির ফাঁকে ফাঁকে আমরা অন্য দ্রষ্টব্য স্থান দেখে নিই। যেমন ফজলুল হকের বসতবাড়িটি দেখা হয়ে গেল। বেশ বড়, অনেকখানি ছড়ানো বাড়ি, এখনও বেশ সমৃদ্ধ অবস্থা বোঝা যায়। সে বাড়ির একটি অংশে ফজলুল হকের ব্যবহৃত জিনিসপত্র লিপ্ত একটি সংগ্রহশালা করে রাখা হয়েছে। আমি ফজলুল হককে স্বচক্ষে দেখিনি। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের মতন চেহারাটিও যে বিশাল ছিল, তা তাঁর ব্যবহৃত চিটিজুতো ও জল খাবার গেলাসের আকৃতি দেখলেই বোঝা যায়।

ফজলুল হকের এক ছেলেও রাজনৈতিক নেতা, এবারের নির্বাচনে প্রার্থী। জীবনানন্দ দাশের ছেলে ও মেয়ে দু'জনেই মৃত্যু হয়েছে, তাঁর বৎসে আর কেউ নেই। ট্রামের ধাক্কায় জীবনানন্দ যখন নিহত হন, তখন কবি হিসেবে ক'জনই বা চিনত তাঁকে। তাঁর বাড়িটি সংরক্ষণের কথা কেউ চিন্তা করেনি, এমনকী কলকাতাতেও কত হেঁজিপেঁজি লোকের নামে রাস্তা আছে, জীবনানন্দ দাশের নামে কোনও রাস্তার নাম রাখা হয়নি। অস্তত ট্রাম কোম্পানি তো তাঁর স্মৃতিরক্ষার কোনও ব্যবস্থা করলে পারত।

যেন চুম্বকের টানে আমরা ডাবখানের তীরে ফিরে যাই বারবার। ঝালকাঠির দিকে কী যেন গওগোল হচ্ছে, এই উড়ো কথা শুনে আমরা নদী পেরিয়ে সেদিকে গেলাম তৃতীয় বার।

ধানসিডি নামে নদী আছে, এটা জেনেই আমি সন্তুষ্ট, কিন্তু মিলন নিরুদ্যম হতে রাজি নয়। তাঁর বয়েস কম, জেদী স্বভাব, আঘাবিশ্বাসে ভরপুর, সে ধানসিডি আবিষ্কার করবেই। এক জায়গায় একটা ছোট দোকানে সিগারেট কেনার জন্য থেমেছি, মিলন সেখানেও জিঞ্জেসাবাদ শুরু করেছে। হঠাৎ একজন লোক বলল ধানসিডি যাবেন? এই পাশের সরু রাস্তাটা দিয়ে চলে যান না। মাইল দেড়েক যেতে হবে।

সে রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাবে? হ্যাঁ, যাওয়া যাবে অনেকখানি। এরকম একটা রাস্তা রয়েছে, তা আগে কেউ আমাদের বলেনি কেন? এ লোকটি কি সত্যি কথা বলছে? বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচল নিয়ে এগোলাম সেই গ্রাম্য কাঁচা রাস্তা ধরে। শেষ পর্যন্ত রাস্তাটা এসে নামল এক নদীর কিনারে। একটা খাটিয়ার ওপর কয়েকজন লোক বসে ছিল, তাদের জিজ্ঞেস করা হল, এটা কী নদী? তারা বলল, ধানসিড়ি!

এমন কিছু আহামরি রূপ নয় সে নদীর, তবু কেন নাম শোনামাত্র রোমাঞ্চ হল? আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায় হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শৰ্ষেচিল শালিখের বেশে; হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কঠাল-ছায়ায়; হয়তো বা হাঁস হব—কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায় সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গঞ্জে ভরা জলে ভেসে...

এককালে এই ধানসিড়ি তীরেও খেয়াঘাট ছিল, এখন ডাবখানের বুকে ফেরি লঞ্চ চলে, ওদিকে পাকা রাস্তা হয়ে গেছে, তাই এখানে বিশেষ কেউ আসে না। এক সময় এ নদীও বেশ চওড়া ছিল, এখন মজে গেছে, একদিকে চরা পড়ে যাওয়ায় সেদিকে উচু বাঁধ দেওয়া। তবু এখনও এই নদী নাব্য, কিছু নৌকো চলাচল করে।

নদীর ঘাটে দাঁড়ালেই কি নদীকে চেনা যায়? নদীর সঙ্গে একটা শারীরিক সম্পর্ক হওয়া দরকার। সাহেবরা সেইরকমই মনে করেন। একবার জামশেদপুরের দিক থেকে সুবর্ণরেখা দেখতে গিয়েছিলাম। তখন সঙ্ক্ষে ঝুঁকে এসেছে নদীর ওপর, পশ্চিম আকাশের সূর্য থেকে সত্যিই অনেকশুলি সূবর্ণরেখা নেমে এসেছে জলে, আমরা প্রথাগত ভাবে মুক্ত চোখে তাকিয়েছি, আমাদের সঙ্গী ছিলেন কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ, তিনি প্যান্ট-শার্ট খুলে ফেলে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় নেমে গেলেন জলে। আর একবার একজন বেলজিয়াম কবি ভ্যারনার ল্যামবারসিকে নিয়ে কাকদ্বীপের দিকে বেড়াতে গিয়ে হারউড পয়েন্ট থেকে নৌকো ভাড়া করে গঙ্গায় ভ্রমণ করছিলাম, মাঝে গঙ্গায় ভ্যারনার হঠাৎ বাঁপিয়ে পড়লেন জলে। আমিও একবার, সেটা খুব সংগোপনে, মানসের জঙ্গলে মধ্যরাত্রিতে মানস নদী দেখে এমনই উত্তলা হয়েছিলাম, শরীর কাঁপছিল যৌন আবেগে, আর কেউ কোথাও নেই, কৃপোলি জ্যোৎস্নায় নদীটিকে মনে হয়েছিল নারী, সম্পূর্ণ পোশাক খুলে সাঁতার কাটার ছলে সঙ্গম করেছিলাম সেই নদীর সঙ্গে।

এখানে তা সম্ভব নয়। একটা নৌকো এসে থামতেই সেটি ভাড়া করা হল। মাঝির নাম ফারুক, তার খালি গা, লোহা-পেটা শরীর। সঙ্গে একটা দশ-বারো বছরের বাচ্চা ছেলে। ছেলেটিও ওর নিজের নয়, অনাথ। আমরা কোথায় যাব? কোথাও যাব না, শুধু এই নদীতে কিছুক্ষণ ঘূরব শুনে ফারুক চোখ ছেট করে তাকিয়ে রইল।

এ নদীর প্রস্তু, বড়জোর বাগবাজারের খালের দেড়গুণ, কোনওদিকেই ধানখেত নেই। একদিকে গ্রাম। কিছু কিছু বাড়ি ও গাছপালা। ‘কঠাল-ছায়া’ আছে কিনা বোঝা গেল না, অন্যদিকে বাঁধের ওপর বাবলা গাছের ঝাড় লাগানো হয়েছে। ওই বাবলা

গাছগুলি ফারুক মাঝির ঘোর অপছন্দ, তার ধারণা, ওর জন্য হাওয়া গরম হয়, বারবার বলতে লাগল, যা হাওয়া গরম, দেখেন না ঘাম হচ্ছে, এ বাতাস ভাল নয়। অনাথ ছেলেটির জন্য ফারুকের খুব মায়া, নিজের গামছাটা এগিয়ে দিয়ে তাকে ঘাম মুছে নিতে বলে।

আমরা নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের জন্য ফারুককে জিঞ্জেস করি, তুমি ভোট দিতে যাবে না ?

সে বলল, আলবাত যাব। ভোট নষ্ট করব কেন? ভিড় কমুক, বিকেলে যাব। সকালে গিয়ে লাইন দিলে রোজগার করব কখন?

আবার জিঞ্জেস করা হল, কাকে ভোট দেবে ফারুক মিএঁ ?

সে চোখ ঘুরিয়ে বলল, আপনাদের বলব কেন? আমার প্যাটের কথা কেউ জানতে পারবে না!

তার নৌকোর ছইতে এক নেতৃত্ব ছবি সাঁটা আছে। সেদিকে ইঙ্গিত করতে সে হি হি করে হেসে বলল, ছবি থাকলে চক্ষে ধূলো দেওয়া যায়। প্যাটের কথা তবু প্যাটেই থাকে। বলাই বাহ্য, ফারুকের মুখের ভাষা একেবারে অন্যরকম। সে ভাষা আমি বুঝলেও অবিকল লিপিবদ্ধ করা আমার সাধ্যাতীত। এই নিরক্ষর মাঝিটি তার গগতাত্ত্বিক অধিকার সম্পর্কে খুবই সচেতন।

কথা বক্ষ করে আমি সত্ত্ব নয়নে নদীর দুল্লিক চেয়ে থাকি। এককালে হয়তো এর ধারে ধারে ধানখেত ছিল। জীবনানন্দ কেনওদিন সত্যিই এই নদীর বুকে নৌকোয় ঘুরেছেন? কিংবা শহরের অন্তর্লাকদের মুখে শুধু নামটাই শুনেছেন!

নদীগুলো খুব বদলে যায়। ধানসিঙ্গি এখন একটি অতি অকিঞ্চিত্কর ছেট নদী। আমি কস্পোতাক্ষ নদীতেও নৌকো চেপেছি, তার জল এখন কোনও মৃত পাখির চোখের মতন বির্ণ।

ক্রমশ ধানসিঙ্গি চওড়া হয়। সামনের দিকে দেখা যায় বিস্তীর্ণ জলরাশি। ফারুক জানাল যে, ওইখানে সাতখানা নদী এসে মিশেছে, ওইখানে গেলে ঘূর্ণিতে পড়তে হবে। সুতরাং আমরা আবার নৌকো ঘোরাতে বললাম।

এই নদীর নামটি জীবনানন্দের এমনই ভাল লেগে গিয়েছিল যে, তিনি বেশ কয়েকটি কবিতায় এই ধানসিঙ্গির উল্লেখ করেছেন:

এ সব কবিতা আমি যখন লিখেছি বসে নিজ মনে একা,

চালতার পাতা থেকে টুপ্টুপ্ জ্যোৎস্নায় ঝরেছে শিশির,

কুয়াশায় স্থির হয়ে ছিল মান ধানসিঙ্গি নদীটির তীর...

ফারুক মাঝির কথাবার্তা এমনই চিন্তাকর্ষক যে, এর পর আমরা নদীটিকে ভুলে গিয়ে তার দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিই। সে কবিতা কাকে বলে জানেই না। তবু সে বলে যে, যখন বাতাস থাকে না, তখনই বাবলা গাছগুলোর ভেতর থেকে গরম হাওয়া বেরিয়ে আসে...এই নদীর জল বড় গন্তীর...ভোটের ঝগড়াবাঁটি শেষ না হলে বৃষ্টিধারা নামবে না...ভোটের রেজাল্ট দেখার জন্য মেঘ চুপ করে বসে আছে...

এই ফারুককে নিয়ে কবিতা লেখা কত শক্ত!

নতুন করে দেখা

পর পর দুটি কবিতার স্বক উদ্ভৃত করে ধাঁধার যতন প্রশংস করা যায়, কোনটি কার
লেখা।

১.

বনের চাতক বাঁধল বাসা মেঘের
কিলারায়
মনের চাতক হারিয়ে গেল দুরের
কুয়াশায়।
ফুঁপিয়ে ওঠে কাতর আকাশ সেই হতাশার
ক্ষেত্রে,—
সে কোন বৌঁটের ফুলের ঠাঁটের মিঠা
মদের লোভে
বনের চাতক-মনের চাতক কাঁদছে
অবেলায়!

২.

কে বাঁধে শিথিল বীণার তন্ত্র
কঠোর যতন ভরে
ঝংকারি উঠে অপরিচিতার
জয় সংগীত স্বরে।
নগ শিমুলে কার ভাণ্ডার
রক্ত দুকূল দিল উপহার
দ্বিধা না রহিল বকুলের আর
রিষ্ট হ্বার তরে।

এর মধ্যে প্রথমটি এক তরুণ কবির রচনা, দ্বিতীয়টি এক প্রবীণ কবির। বলাই
বাছল্য, প্রথম স্বকটি অতি দুর্বল, নিরেস। প্রায় অকবিতাই বলা যায়। বনের চাতক,
মনের চাতকের তুলনা নেহাতই অকিঞ্চিত্কর, ছদ্ম এবং মিলেও বেশ দোষ আছে।
যারা কবি, তারা জানে, ‘কুয়াশায়’-এর সঙ্গে ‘অবেলায়’ সঠিক মিল হয় না। অন্যমিল
মানে দুই পঞ্জিকের শুধু শেষ অক্ষরের মিল নয়, পূরো শব্দটির ধ্বনিগত মিল থাকা
আবশ্যিক তো বটেই, অন্য অক্ষরগুলির বর্ণ-গত মিল থাকলেও ভাল হয়। মাঝানে

একটি অকারণ মিলের লোভে ভুল শব্দও প্রয়োগ করা হয়েছে। ‘বৌঁটের’ মানে কী? ‘ঠৌঁটের’ সঙ্গে মেলাবার জন্য ‘বৌঁটা’ থেকে ‘বৌঁটের’ করা হয়েছে, এটা অসঙ্গত। যতি চিহ্ন ব্যবহারও ত্রুটিপূর্ণ, ষষ্ঠ লাইনে ‘ক্ষোভে’র পর কমা এবং ড্যাশ দুটোই দেবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। ‘ফুলের ঠৌঁটের মিঠা মদের লোভে’, এতে কোনও কবিতা নেই, অন্যায়সেই বলা যেতে পারে ক্লিশে। অন্য কবির দ্বিতীয় শ্লবকটি নিখুঁত। মাত্রা ও মিল সম্পর্কে কোনও প্রশ্নই নেই, অনুপ্রাস এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কারণ অনুপ্রাস উচ্চাসের কবিতার রস নষ্ট করে, কিন্তু অনেকগুলি ‘র’ ও ‘ল’-এর ব্যবহারে ধ্বনি-মাধুর্য পাওয়া যায়। সমস্ত শব্দই অতি সাবলীল, বোঝা যায় বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফসল, চেনা যায় রবীন্দ্রনাথকে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা দেওয়ার জন্য এক নবীন কবির অতি তরল ও দুর্বল একটি শ্লবক উদ্ভৃত করার কারণটি ব্যাখ্যা করা দরকার। এই কবির নাম জীবননন্দ দাশ, দুটি কবিতাই একই সময়ে লেখা, ১৩৩৪ সালে। রবীন্দ্রনাথের পঞ্জিক্তি ‘মহম্মার’ অন্তর্গত, ‘বোধন’ কবিতার অংশ, জীবননন্দের পঞ্জিক্তি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ঘরাপালক’-এর ‘বনের চাতক-মনের চাতক’-এর শুরু। এই কাব্যগ্রন্থটি পড়লে মনে হয়, রবীন্দ্র অনুসারী দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কবিবৃন্দের আর একটি সংখ্যাবৃদ্ধি হল মাত্র।

অন্য সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হল জীবননন্দের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘ধূসর পাতুলিপি’। নামের মিল থাকলেও এই দুটি কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা যে একই ব্যক্তি তা যেন বিশ্বাস হতে চায় না। প্রথমদিকের কবিতায় তিনি রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন দত্তের অনুকরণ করতে চেয়েছেন প্রাণপন্থে। হঠাৎ যেন কোনও মায়া সরোবরে ডুব দিয়ে তাঁর অশ্বান্তর ঘটে গেল। তাঁর হঠাতে সম্পূর্ণ নতুন কাব্যভাষা। শব্দ ব্যবহারে তিনি বেপরোয়া।

পাড়াগাঁর গায়ে আজ লেগে আছে
রূপশালি-খানভানা
রূপসীর শরীরের ঘাণ
আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে
আছে নদীর এপারে
বিয়োবার দেরি নাই,—রূপ ঝরে পড়ে
তার,—
শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে।
আজো তবু ফুরোয়নি বৎসরের নতুন
বয়স,
মাঠে মাঠে ঝরে পড়ে কাঁচা
রোদ,—ভাঁড়ারের রস।

একমাত্র কমা ও ড্যাশ একসঙ্গে ব্যবহারের দুর্বলতা ছাড়া এই কবির সঙ্গে পূর্বতন কাব্যগ্রন্থের কবির কোনও মিল নেই।

এখানে তিনি তোয়াক্তা করছেন না ছন্দ-মিলের, লাইনগুলি যেন স্বতোৎসারিত। 'বিয়োবার' কিংবা 'ভাঁড়ার'-এর মতন শব্দ ব্যবহার করছেন অক্লেশে, চাকুষ দৃশ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছেন রহস্য। পল্লী প্রকৃতিকে নারীর রূপ দেওয়া এমন কিছু নয়, সব কবিই প্রিয় এই উপমা, কিন্তু জীবনানন্দ লিখলেন, আসন্ন শীতে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আগে সে এক গভিনী, 'নুয়ে আছে নদীর এপারে'। এ যেন ইন্দ্রেশনিস্টদের আঁকা ছবির মতন, চোখের সামনে উজ্জাসিত অথচ পুরোপুরি বাস্তব নয়, তাতে চুইয়ে চুইয়ে পড়েছে 'ভাঁড়ারের রস'।

এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি
ফেলিয়াছি;
সারারাত দখিনা বাতাসে
আকাশের চাঁদের আলোয়
এক ঘাই হরিণীর ডাক শুনি,—
কাহারে সে ডাকে।

এই কবিতার যে প্রথম পঙ্ক্তি, 'এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি', আমার মতে রবীন্দ্র যুগোন্তর্ভী সবচেয়ে দৃঃসাহিসিক লাইন। তিরিশের দশকে বাংলা কবিতা যে জায়গায় এসে পৌছেছিল, সেখানে এরকম কাঁচা, নড়বড়ে একটি লাইন সদ্য হাত মকশো করা কোনও নবীন কবিও লিখতেন না!

বাংলা কবিতায় তখনও সাধু ক্রিয়াপদ ছালু রয়েছে বটে, কিন্তু গদ্যে চলতি ক্রিয়াপদ কারও কারও রচনায় ব্যবহার শুরু হয়েছে। চলতি ক্রিয়াপদ অর্থাৎ মুখের ভাষায় কবিতা হয় কিনা তা নিয়ে অনেকের মনে দ্বিধা ছিল। প্রমথ চৌধুরীর অনুপ্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ সাধু গদ্য ঘরকেবারে পরিত্যাগ করলেও কবিতায় এই দ্বিধা শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারেননি, একেবারে শেষ জীবনেও তিনি কবিতায় সাধু এবং চলতি দু'রকম ক্রিয়াপদ মিশিয়ে দিয়েছেন:

কঠোর বিরোধ রঞ্চি তুলে তত
অতলের মহালীলা,
ফেনিল ন্যো দামামা বাজায় শিলা।
হে শান্ত, তুমি অশাস্তিরেই
মহিমা করিছ দান
গর্জন এসে তোমার মাঝারে
হল বৈরব গান...

এখানে তিনি 'রঞ্চি তুলে', 'করিছ' এরকম সাধু ক্রিয়াপদের সঙ্গে মিশিয়েছেন 'এসে', 'হল'। কাছাকাছি সময়ে সুধীন্দ্রনাথ দস্ত লিখছেন:

একটি কথার দ্বিধা থরথর চুড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী
একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণী জুড়ে,
থামিল কালের চিরচঞ্চলা গতি...

এখানে সুধীল্লনাথের ঘোঁক ক্রমশ চলতি ক্রিয়াপদের দিকে হলেও মাত্রা ঠিক
রাখার জন্য সুবিধে মতন ‘করেছিল’ এবং ‘থামিল’ দু’ রকমই ব্যবহার করছেন।
বুদ্ধদেব বস্তুও সে রকম:

দিগন্ত থেকে দূর দিগন্তে ধূসর পৃথিবী
করিছে খাঁ খাঁ
(আমারি প্রেমের মতন গহন অঙ্কার,
প্রেমের অসীম বাসনার মতো অঙ্কার;
তবু চলে এসো, মোর হাতে হাত দাও
তোমার—
কক্ষা, শক্ষা কোরো না।)

এখানেও মাত্রা-সমতা রক্ষার কারণে ‘করিছে’ এবং ‘মোর’ ব্যবহার করা সম্ভেদেও কবিতার মূল ঘোঁক চলতি ভাষার দিকেই। আর এক দশক পরেই দেখা গেছে যে বাংলা ভাষায় যাঁদের বলা হয় আধুনিক কবি, তাঁরা সাধু ক্রিয়াপদ একেবারেই বর্জন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের থেকে পৃথক হওয়ার জন্য কেউ ব্যবহার করছেন বেশি পরিমাণে আভিধানিক শব্দ, যেমন সুধীল্লনাথ, আবার কেউ কেউ কামার-ছুতোর-মুটে-মজুরের মুখের ভাষা খুঁজছেন।

জীবননন্দের প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। তিনি এমন একটা কাব্যভাষা আনতে চাইলেন, যার মধ্যে বিন্দুমাত্র সচেতনা নেই। সঁওলায় ক্রিয়াপদের সংখ্যা বড়ই কম। বাক্যের শেষে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করলে এক্ষেত্রেমি এসে যায়, কবিতায় সেই জন্য শেষ শব্দে ক্রিয়াপদ এড়িয়ে যেতে হয়। কিন্তু জীবননন্দ যেন জোর করেই ‘ফেলিয়াছি’র মতন একটা এলানো ক্রিয়াপদ বসালেন। শুক্র পরে আবার লিখলেন, ‘বনের ভিতরে আজ শিকারীরা আসিয়াছে’, এখানে ক্রিয়াপদটি অন্যায়ে ভেতর দিকে চালান করা যেত, কিন্তু তিনি যেন কিছুই বেয়াল করছেন না, স্বগতোক্তির মতন পঙ্কজিশুলি বলে যাচ্ছেন। (বলাই বাহ্ল্য, স্বগতোক্তি কথনও কবিতা হয় না। কবিতা অত্যন্ত সচেতন শিল্প, বিশেষ ধরনের নির্মাণ। প্রতিটি শব্দ ওজন করে ব্যবহার করা কাব্য রচনার প্রাথমিক শর্ত। জীবননন্দের পাণ্ডুলিপি দেখলেই বোঝা যায়, তিনি পূর্ণ মাত্রায় সচেতন থেকে, অনেক কাটাকুটি করে পঙ্কজি নির্মাণ করেছেন। অর্থাৎ অনেক ভেবেচিষ্টে তৈরি করা এটাই তাঁর নিজস্ব শৈলী।) ছন্দ-মিলের রীতি মানা কোনও আটসাঁট বাঁধুনি তাঁর নেই। (সেরকমও যে তিনি পারেন, আগের বইতে কিছু কবিতায় তা দেখিয়ে দিয়েছেন) সেই জন্যই যেন হঠাৎ এসে পড়া কোনও শব্দ বা উৎপ্রেক্ষা ব্যাখ্যা করার দায়ও তাঁর নেই।

চারিপাশে বনের বিস্ময়
চেত্রের বাতাস
জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন।
ঘাই মৃগী সারারাত ডাকে;
কোথাও অনেক বনে—সেইখানে
জ্যোৎস্না আর নাই

‘জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ’, ঠিক এমনভাবে কেউ আগে লেখেননি বটে, কিন্তু ব্যাপারটা দুর্বোধ্য নয়। সেই সময়কার পাঠক ও সমালোচকরা মনে করেছিলেন ধোঁয়াটে, অশরীরীর শরীর তখনও অনেকের ধাতস্থ হয়নি। কিন্তু এখানে আসল বিস্ময়কর শব্দ হচ্ছে ‘অনেক’। ‘গভীর’ কিংবা ‘নিবিড়’ লেখার কোনও অসুবিধে ছিল না, মাত্রা ঠিক থাকত, তার বদলে ‘অনেক’-এর ঘনত্ব একটা সরল শব্দ তাঁর মাথায় কী করে এল? এ একেবারে নতুন বাংলা ভাষা। ‘গভীর’ কিংবা ‘নিবিড়’ শব্দের ব্যঙ্গনা কিছুটা ক্ষয়ে গেছে, তার বদলে ‘কোথাও অনেক বনে’। ক্রমশই তিনি শব্দের এই বিপর্যয় ঘটাতে লাগলেন। ‘মানুষ যেমন করে দ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে।’ ‘নোনা মেয়েমানুষ’?

কিংবা আরও পরে, ‘বিপন্ন বিস্ময়’, ‘এক মাইল শাস্তিকল্যাণ’, ‘প্রগাঢ় পিতামহী’, ‘ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয়ে শুয়োরের মাংস হয়ে যায়’, ‘সুপক রাত্রির গন্ধ’, ‘সোনার পিতল মূর্তি’, ‘মেধাবী নীলিমা’...এই ধরনের শব্দ প্রয়োগ বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ অভিনব।

‘ঝরা পালক’ থেকে ‘ধূসর পাণুলিপি’-তে এমন চমকপ্রদ উন্নতরণ বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা তো বটেই, আজও রহস্যময় মনে হয়।

প্রত্যেক বড় মাপের কবিই ভাষাকে কিছু না কিছু সমৃদ্ধ করে যান। জীবনানন্দকে শুধু সে কৃতিত্ব দিয়ে থেমে থাকা যায় না, তিনিশব্দে কবিতার আকৃতিটাই বদলে দিলেন। এমন শব্দের পাশে শব্দ বসাতে লাগলেন, যা উপমা বা রূপক নয়, অবচেতনের বহিঃপ্রকাশ। অনেক পঙ্কজি পারম্পর্যহীন, যেন কোনও অর্থের সংযুক্তি নেই, অথচ বিনি সুতোর মালাও মনে হয় না, সুতোটি অদৃশ্য কিন্তু অনুভব করা যায়। এই সব কবিতা নিছক উপভোগের জন্য নয়, উপলক্ষ্য, বারবার পড়লেও পুরনো হয় না। অনেক প্রতিকূলতা, অনেক নিন্দামন্দ, অনেক সমালোচনার বড় সামলে জীবনানন্দের কবিতা যখন প্রতিষ্ঠা পেল, তার পর থেকে বাংলা কবিতার একটি বড় অংশ জীবনানন্দীয় ধারায় প্রবাহিত হতে লাগল।

গদ্য সাহিত্যে, পৃথিবীর গদ্য সাহিত্যে তখন ন্যারেটিভ স্টাইলকে বিদ্যায় দেওয়ার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ফ্রানৎস কাফকার স্বীকৃতির পর উপন্যাসে নিছক কাহিনী বর্ণনা অনেকটা অবাস্তর হয়ে যায়। চিত্রশিল্পেও অবয়ব ও বাস্তবতা বিদ্যায় নিতে নিতে বিমৃত্ততাই প্রধান হয়ে ওঠে। এরই প্রভাবে আর কিছুদিন পর এমনকী চলচ্চিত্রেও কোনও কোনও পরিচালক সাহিত্য-নির্ভরতা বা কাহিনীকেও বাদ দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগে যান। শিল্পের সব শাখার মধ্যেই কিছু না কিছু যোগসূত্র থাকে। এক একটা যুগের বিশেষ প্রবণতা সামগ্রিকভাবেই শিল্পের শুপর পড়ে। সচেতনভাবেই হোক, অথবা বিশ্ব-আবহাওয়ার প্রভাবে, জীবনানন্দ দাশই প্রথম বাংলায় এই বিমৃত্ত কাব্যরীতির প্রবর্তন করেন। পুরোপুরি নয়, অর্থেক মতন।

পরবর্তী বাংলা কবিতায় জীবনানন্দের প্রভাব পড়তে বেশ কিছুটা সময় লেগেছে। তাঁর সমসাময়িকরা তো বটেই, অব্যবহিত পরবর্তী কালেও সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায়-বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী-অরুণকুমার সরকার

প্রমুখ জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে নিজস্ব রীতি খুঁজেছেন, তাঁদের মাথায় ছিল রবীন্দ্র প্রভাব থেকে দূরে সরে যাওয়ার চিন্তা।

বামপন্থীরা বিমূর্ত ধারাকে অপছন্দ করতেন একসময়ে। বিমূর্ত শিল্পে পরিষ্কার কোনও বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ নেই। যে জন্য ফ্রান্সে কাফ্কার জন্মস্থান চেকোশোভাকিয়াতেই তাঁর রচনা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, রাশিয়াতে উস্টফেডক্সিকে অনেকদিন সুনজরে দেখা হয়নি। চিত্রশিল্পে ফটোগ্রাফিক বাস্তবতাকে প্রশংস্য দেওয়া হয়, জ্যাজ সংগীতকে বলা হত ডিকাডেট। অর্থাৎ বিমূর্ততাকে প্রতিরোধ করারও একটা শক্তিশালী ধারা ছিল পাশাপাশি।

কিন্তু বিমূর্ততার একটা মোহ আছে। হয়তো যুদ্ধকালীন নারকীয় বাস্তবতার পর, সবরকম বাস্তবতার প্রতিই বীতশুন্দ হয়ে যুদ্ধ-পরবর্তী কালে লেখক-শিল্পীরা অনেকেই বিমূর্ততার দিকে ঝুঁকে পড়ে। পঞ্চাশের দশকে বাংলা কবিতাতেও পড়ে এর প্রভাব, জীবনানন্দ দাশের মাধ্যমে। জীবিতকালে জীবনানন্দ দাশ প্রধান কবি ছিলেন না, কয়েক দশক পরে দেখা গেল যে, একমাত্র তিনিই তরঙ্গ কবিকুলের আরাধ্য। এই প্রভাব অবশ্য পুরোপুরি সুখকর হয়নি।

জীবনানন্দের কবিতার প্রতি মুক্তার ফলে তাঁর অনুসারীরা ধরে নিলেন যে, ইচ্ছেমতন যে-কোনও শব্দ ব্যবহারে আর কোনও বাধা নেই, কাব্যশরীরের নিখুঁত বাঁধুনি রাখার প্রয়োজনীয়তা নেই, বিশেষ-বিশেষস্থিতির অর্থ পরিস্ফুট করারও কোনও দায় নেই। এটা যেমন একদিকে সত্যি, আরো অন্যদিকে বিপজ্জনকও বটে। যিনি সত্যিকারের কবি, তিনি এই পথে সার্থক কবিতা রচনা করতে পারেন, আবার বহু অকবিও কাব্য-রচনা ব্যাপারটা খুব সেৱোজা ভেবে ছাপার অক্ষরের জঙ্গল বাঢ়িয়ে যায়। জীবনানন্দীয় ধারায় সবচেয়ে সার্থক কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়; অসার্থক কবির সংখ্যাও অনেক। বিমূর্ত শিল্পে কোনও বক্তব্য থাকে না, এ কথাটাও ঠিক নয়। চড়া বস্তব্য কিংবা প্রচারমূলক কিছুর স্থান নেই। কিন্তু একথাও ঠিক, কবি বা শিল্পীর যে-কোনও চিন্তাই তাঁর বস্তব্য। বিশেষ কোনও চিন্তা ছাড়া শিল্প সৃষ্টি হতে পারে না। এবং শিল্পীর সেই চিন্তা যদি পাঠক বা দর্শককে একেবারেই স্পর্শ না করে তবে সে শিল্পসৃষ্টি ব্যর্থ। পঞ্চাশের দশকে ছবির জগতে সমস্তরকম অবয়ব এবং আয়তনকে বর্জন করে যখন শুধু রঞ্জের কারিকুরিই একমাত্র ব্যাপার হয়ে উঠল, তখনই বিমূর্ত শিল্পের পতন সূচিত হল। কবিতাতেও এমনকী মনস্ত পাঠকও যদি পরপর পঙ্ক্তিশুলির যোগসূত্র খুঁজে না পায়, তা হলে সে ক্রমশ কবিতার দিকে পিঠ ফেরাতে শুরু করে।

বাংলায় বিমূর্ত কবিতার বদলে বিশুদ্ধ কবিতা নামে একটি আখ্যা চালু হয়েছিল। বিশুদ্ধতা অর্থে কবিতায় কোনও বক্তব্য বা চিন্তার প্রকাশ পাবে না, কোনও কাহিনীর আভাস থাকবে না, কোনও নারী-পুরুষের জীবন্ত চরিত্র রাখা চলবে না। এটা আবার বিশুদ্ধতার বাড়াবাড়ি। জীবনানন্দের অনেক কবিতায় কাহিনীর আভাস আছে তো বটেই, জীবন্ত চরিত্রেরও ছড়াছড়ি। তা ছাড়া সন্তরের দশকের পর পৃথিবীর কাব্য ও চিত্রশিল্পে যে আবার একটি পালাবদল ঘটে গেছে, তা অনেকে লক্ষ করেননি। ছবিতে

এখন আর শুধু রং নয়, ফিরে এসেছে রেখা ও অবয়ব, গল্প-উপন্যাসে ফিরে এসেছে কাহিনী, কবিতাতেও নিছক শব্দের খেলার বদলে তার আড়ালে ঝিলিক দিচ্ছে কবির জীবনযাপন, এই পৃথিবী সম্পর্কে তাঁর নিভৃত চিন্তা। সাহিত্য-শিল্পে ঢেউয়ের মতন মাঝেমধ্যেই এইরকম আকৃতি, প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং বিশুদ্ধ কবিতার ধারণা যারা এখনও আঁকড়ে ধরে আছেন, তাঁরা এখন প্রাচীনপন্থী।

পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশে একই ভাষায় কবিতা রচিত হলেও দুটি পৃথক ধারা বেশ স্পষ্ট। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বারবার বড় ধরনের আলোড়ন আসার ফলে তার প্রতিফলন দেখা গেছে সেখানকার কবিতায়। এরকম অবস্থায় কবিদের পক্ষে ঘরের দরজা-জানলা বঙ্গ করে কাব্যরচনা সম্ভব নয়, কবিরা গলা মিলিয়েছেন জনসাধারণের সঙ্গে। তাঁদের কবিতা সেইজন্যই কিছুটা উচ্চকণ্ঠ এবং সোজাসুজি। পশ্চিমবাংলায় শব্দের খেলার দিকে ঝোঁক বেশি, বারবার বাজিয়ে বাজিয়ে শব্দের নিখুঁত ধ্বনিটা খোঁজা হয়েছে। অর্থের দিকে জ্ঞান না দিয়ে। এই খেলার একটা মাদকতা আছে, তবু কোথাও একটা সীমারেখা টানতে হয়।

কবিকে কখনও কখনও সোজাসুজি কথাও বলতে হয়, দেশে যদি একটি দাঙা বাঁধে, তখনও যদি কোনও কবি শব্দের ধ্বনিমাধুর্য খোঁজেন, তখন সেই প্রক্রিয়াটাকেই অশ্লীল মনে হবে। তবে, যিনি শব্দচর্চা করেছেন, একটি শব্দের পাশে আর একটি ঠিক কোন শব্দ বসালে ব্যঙ্গনা ফুটে উঠবে যিনি জানেন, তিনি সোজাসুজি কথা বললেও তা গদ্য হবে না। কোনও বড় শিল্পী যখন প্রোটোট আঁকেন, তখনও তিনি শিল্পীই থাকেন, ফটোগ্রাফির অনুকারক হন না ক্ষেমন।

একমাত্র সংগীত, বিশেষত যন্ত্র-নিভৃত সংগীত ছাড়া আর কোনও শিল্প সম্পূর্ণ বিমূর্ত অবস্থায় বেশি দিন টিকে আকতে পারে না। ভোরের কুমাশায় পৃথিবী ছেয়ে যায়, সব কিছুই মনে হয় অস্পষ্ট, রহস্যময়; আবার কিছুক্ষণ পরেই ঝকঝকে রোদ ওঠে। কখনও জমজমাট কপিশ মেঘে দিনের আলোয় নেমে আসে অঙ্ককার; বড়বৃষ্টির পর ঝকঝকে তারাভরা আকাশ, এক একদিন এমন ঝকঝকে জ্যোৎস্না, যাতে অন্যায়াসে চিঠি লেখা যায়। প্রকৃতির এই যে লীলা বৈচিত্র্য, তার ছাপ যেমন পড়ে পৃথিবীর মানুষের জীবনে, তেমনি বিভিন্ন শিল্প-আঙিকে।

বাংলা কবিতায় বিমূর্তধারা বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল, আরও প্রয়োজনীয় ছিল তাকে অতিক্রম করার। রবীন্দ্রনাথ যেমন শেষ কথা নন, তেমনই জীবনানন্দও শেষ কথা হতে পারেন না। একবার ছন্দ ভাঙার স্বাধীনতা পাবার পর যেমন অন্যায়াসেই আবার ছন্দে ফেরা যায়, সেইরকমই মানুষের কথা, জীবনের কথা, সমাজের কথা বর্ণনার মাঝে মাঝেও আনা যায় বিমূর্ততার ছেঁয়া। কবিকে সত্যদ্রষ্টা বলাটা হয়তো বাড়াবাড়ি, কবিতা লিখে সমাজ পরিবর্তনের চিন্তাও অবাস্তব, তবু, কেউ মানুক বা না মানুক, কবিকে এই পৃথিবীর বিশুদ্ধকরণের কথা বলে যেতেই হয়। সেই জন্যই কবিরা, শুধু শব্দ ঝংকার বা সংগীত-প্রভাবের মোহ কাটিয়ে বারবার ফিরে আসেন সোজাসুজি কথা বলার দিকে। বিভিন্ন যুগে সেটাই আধুনিকতা। বাংলা কবিতার এখনকার ঝোঁকও সেইদিকে। বর্তমান দশকের তরুণ-তরুণীদের কবিতা পড়লে

বোৰা যায়, পৃথিবীৰ প্ৰধান প্ৰধান ভাষায় যেৱকম কবিতা রচিত হচ্ছে, তাৰ চেয়ে
বাংলা কবিতাৰ মান কোনও অৱশ্যে কম নয়। পূৰ্ববৰ্তী কবিৱা শব্দচৰ্চাৰ যে উন্নত শুণ
তৈরি কৰে গোছেল, তাৰ নীচে লেখে আৱ সন্তুষ্ট নয় কবিতা রচনা কৰা। শব্দেৱ সেই
বিশুদ্ধতাৰ মধ্যেও ফুটে ওঠে তাদেৱ জীৱন-ছবি, চিৰকালীনেৱ পটভূমিকায়
সমসাময়িকেৱ এক একটি বিন্দু, রাত্ৰি এবং দিন, স্বপ্ন ও জেগে থাকা দিনেৱ রাঢ়তা।
বাস্তবেৱ পাশাপাশি বিমুক্ত, অতি সৱলও নয়, নিছক দুৰ্বোধ্যও নয়।

কাব্যসংগ্রহের ভূমিকা*

কিছুদিন আগে পর্যন্ত জীবনানন্দ দাশ ছিলেন শুধু কবিদের কবি। এখন তিনি সমস্ত মানুষের। সমস্ত মানুষের কথাটা হয়তো একটু বাড়িয়ে বলা হল। কোনও দেশেই কোনও কবি আক্ষরিক অর্থে সমস্ত মানুষের কাছে পৌছতে পারেন না। কিংবা, যিনি পারেন, তিনি বিশুদ্ধ কিনা এ সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। কবির সমাদর শুধু হৃদয়সংবাদীর কাছে।

কিন্তু বাংলা ভাষায় পঠন-পাঠনে যাঁরা অভ্যন্তর, তাঁদের কাছে জীবনানন্দের নাম পৌছে গেছে। কবিতা পাঠে যাঁদের আগ্রহ নেই, তাঁরাও এখন জানেন জীবনানন্দ দাশ বাংলা ভাষায় একজন প্রধান কবি। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের পর তাঁর নাম স্বাভাবিকভাবে এসে যায়। কিছুকাল আগেও আধুনিক কবিতাকে নিন্দা করার জন্য জীবনানন্দ দাশের লাইন উদ্ভৃত করা ছিল প্রচলিত প্রথা, এখন আস্তে আস্তে তিনি পেয়েছেন শ্রদ্ধার আসন।

যদিও পশ্চিমবাংলার জীবনে বা সাহিত্যে জীবনানন্দের কবিতার প্রভাব এখনও তেমন দেখা যায় না। উনিশ শো পঞ্চাশ সালের শের থেকেই জীবনানন্দ খাঁটি অর্থে আবিস্কৃত হয়েছেন, তৎকালীন ও পরবর্তী কবিয়া রবীন্দ্রনাথের বদলে জীবনানন্দেরই অধিমর্ণ। গদ্য লেখকদের কাছে জীবনানন্দ এখনও প্রায় অনুপস্থিত, আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এখনও তাঁর বিশেষ স্থান হয়নি। তাঁর জন্ম তারিখে উৎসব করার রীতি নেই, পৌরসভা রাস্তার নাম বদলাবার সময় তাঁর নাম মনে করতে পারেন না। এসব অবশ্য আফশোস করার বিষয় নয়, কারণ কবির প্রকৃত সম্মান কবিতা পাঠকদের কাছে জীবনানন্দ তা পেয়েছেন—বাদ বাকি সবই অবাস্তর।

অথচ, পাশের বাংলাদেশের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও মুক্তির লড়াইয়ের সঙ্গে জীবনানন্দ দাশ জড়িয়ে গেছেন। সেখানকার মুক্তিকামী মানুষ প্রেরণা পেয়েছেন এই কবির কাছ থেকে—জননেতারা প্রকাশ্য সভায় উদ্ভৃতি দিয়েছেন তাঁর কবিতার। বাংলা ভাষার ব্যবহার ও বাংলার রূপ বর্ণনা তিনি যেভাবে করেছেন, তা সাহিত্যের নানা ব্যাখ্যার মতো, কে কোন রচনা থেকে কীরকম ভাবে প্রেরণা পায় তার কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম থাকে না। এডগার অ্যালান পো আমেরিকাতে তেমন মূল্য পাননি, কিন্তু তাঁর রচনার সূত্র ধরেই ফরাসি দেশে শুরু হয়েছিল নতুন সাহিত্যধারা।

আমার কাছে জীবনানন্দ দাশের এখনও সবচেয়ে বড় পরিচয়, তিনি কবিদের কবি। তাঁর কবিতায় সুর সংযোজন করে গান করা হবে, কিংবা নৃত্যনাট্য বা গীতিনাট্য রচিত হবে তাঁর কবিতা অবলম্বনে—এমন আশঙ্কা করি না। সে রকম দুর্দেব ঘটার দরকার নেই। বিশুদ্ধ কবিতার রস আস্থাদন করার জন্য যাঁদের আগ্রহ, জীবনানন্দ

দাশের রচনা সংগ্রহ তাঁদের শিয়রের কাছে রেখে দেবার মতন।

এ রকম কবি যে কোনও দেশেই বিরল, যিনি প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের রীতি ভেঙেচুরে লঙ্ঘণ করে সম্পূর্ণ নিজস্ব ধরন প্রবর্তন করে যেতে পারেন। এবং যাঁর কবিতা বারবার পড়লেও পুরনো হয় না।

এই বারবার পড়ার বিষয়টি অনুধাবনযোগ্য। কবিতায় প্রতিফলিত হবে সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, সর্বসাধারণের সুবোধ্য হয়ে তা জীবনাশ্রয়ী বক্তব্যের বাহন হবে—এরকম একটা মত প্রচলিত আছে। এই মত মেনে নিতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু পাঠক হিসেবে নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারি, বক্তব্যাভারাক্রান্ত কবিতার দুর্বলতা এই, তা বারবার পড়তে ইচ্ছে করে না। অলংকরণেই তার আকর্ষণ চলে যায়। বক্তৃতায় বা ইন্দ্রাহারে যে বক্তব্য আমাদের উপর করে, কবিতার মধ্যে অটোই তা আমাদের ক্লান্ত করে দেয়। কোনও একটি রচনা শিল্প হিসেবে তখনই সার্থক হয়ে উঠে, যখন তার মধ্যে বারবার আকর্ষণ করার মতন কোনও সাবলীল রহস্য জন্মায়। আমাদের সাধারণ মুখের কথায় নির্বাচন ও যোজনার কৃতিত্বে কবিরা রহস্যধ্বনি করে তোলেন ‘মায়াবীর মতো জাদুবলে’। এবং জীবনানন্দ দাশ একজন অতুলনীয় মায়াবী।

এই সংগ্রহে আছে জীবনানন্দের জীবনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ঝরা পালক’ এবং শেষ কাব্যগ্রন্থ ‘বেলা অবেলা কালবেলা’। এবং তাঁর মধ্যজীবনের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ‘সাতটি তারার তিমির’। একসঙ্গে পাওয়ার ফলে, দেখার সুবিধে হবে এই কবির ক্রমিক পরিণতির ইতিহাস। ‘ঝরা পালক’-এর কবিতাগুলি পড়লে বিশ্বাসই হতে চায় না, এই কবি কোনও একদিন ‘বেলা অবেলা কালবেলা’র ভাষ্যকার হবেন। ‘ঝরা পালকে’ আবেগময় কিশোর কবিজীকুম ও পৃথিবী সম্পর্কে অনেক ভাবগর্ভ কথা উচ্চারণ করেছেন—যা আসলে চিরাচরিতের পুনরাবৃত্তি মাত্র। কবির নিজস্বতা নেই, শব্দের মায়া নেই, ভাবালুতায় দৃষ্টি আচ্ছম। জীবনানন্দের তুলনায় অনেক অপ্রাপ্য কবিরও প্রথম কবিতার বই এত কাঁচা নয়। তবু ‘ঝরা পালকে’র একটা বিশেষ মূল্য আছে। এই কবিতাবলী দেখে বোঝা যায়, উক্তাপাতের মতন এই কবি বাংলা কবিতার জগতে আবির্ভূত হননি। তিনি ট্রাডিশনের অন্তর্গত, এক সময় প্রথাসিদ্ধ কবিতার কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। শব্দ নির্বাচনে, নজরগুলের এবং ছন্দে সত্যেচ্ছনাথ দণ্ডের প্রভাব এখানে স্পষ্ট। এই প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠে নিজস্ব ধারার প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব আরও বিস্ময়কর। নজরগুল বা সত্যেচ্ছনাথ শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রভাব পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু জীবনানন্দ এই তিনজনের থেকে অনেক আলাদা হয়ে সরে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। সেইজন্যই জীবনানন্দের কবিতা এখনও নবীন কবিদের রচনার আকর।

‘সাতটি তারার তিমিরে’ তিনি সেই পরিপূর্ণ নতুন কবি। ‘ঝরা পালকে’ তার একটি ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল, দুর্বল পঙ্ক্তি সঙ্গেও সংস্কৃতঘৰ্য্যে গঞ্জীর শব্দের পাশে চলিত শব্দ ব্যবহারের ঝোঁক। পরবর্তী কালের কবিতায় সেই সব শব্দ অনিবার্যভাবে এসেছে। বাংলা কবিতার পাঠক প্রথম দেখল এই ধরনের লাইন, ‘হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে’ কিংবা ‘জীবনকে আরো স্থির, সাধুভাবে তারা ব্যবহার করে

নিতে গেল সৌন্দা ফুটপাথে বসে' কিংবা 'শ্বেতাঙ্গ দম্পতি সব সেইখানে সামুদ্রিক
কঁকড়ার মতো সময় পোহায়ে যায়।'

'বেলা অবেলা কালবেলা'র শেষ কবিতার কয়েকটি লাইন এই রকম:

দেখা যাক পৃথিবীর ঘাস

সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর

নিষ্পেষিত মনুষ্যতার

আঁধারের থেকে আনে কী করে যে মহা নীলাকাশ... .

এই লাইনগুলির মধ্যে যে একটা অপার বিস্ময়বোধ আছে, আমার মনে হয় সেটাই
জীবনানন্দের কবিতার শেষ কথা।

*এই রচনাটি শ্রাবণ ১৩৭৮-এ, বেঙ্গল পায়গিশার্স প্রকাশিত জীবনানন্দ দাশের
কাব্যসংগ্রহ (২য় খণ্ড)-এর ভূমিকা হিসেবে লেখা হয়েছিল। কেন আমার মতন একজন
তৎকালীন তরুণ কবিকে এই ভূমিকা লিখতে বলা হয়েছিল, এবং কেনই বা আমি লিখতে
রাজি হয়েছিলাম, তা আজ আর মনে নেই।

আমাদের ঝণ

‘তাঁর অন্তিবর্ধ শরীরে বঙ্গকঠিন দার্জ লেখা আছে’—অনেকটা এইরকম ভাষায় বর্ণনা পড়েছিলাম কল্লোল যুগ গ্রন্থে। একটু শক্ত কথা, চট করে মানেটা বোঝা যায় না, তা ছাড়া তখনও বুদ্ধিদেব বসুকে চোখে দেখিনি। চোখে দেখার পর বুকতে পেরেছিলাম, তিনি একজন ছোটখাটো চেহারার মানুষ। লাজুক এবং সাহসী। কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে গিয়ে একদম্পত্তি তাকিয়ে থাকেন। যে-কোনও সময়ে গলার আওয়াজ উচুতে উঠে যায়। এবং মাঝে মাঝেই, কিংবা প্রায়ই তিনি অসম্ভব জোরে হেসে ওঠেন। তিনি সেই হাসি সঞ্চারিত করে দেন অন্যদের মধ্যে।

না, আমার ভুল হচ্ছে। ওর সম্পর্কে আমি বর্তমান ক্রিয়াপদ ব্যবহার করছি। কিন্তু বুদ্ধিদেব বসু আর বেঁচে নেই। মৃত্যু এই পথিবীর একটি সরল সত্য ঘটনা, তবু বিশ্বাস হয় না।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘কল্লোল যুগ’ যখন প্রকাশিত হচ্ছিল ‘পূর্বাশা’ পত্রিকায়, আমরা দুর্দান্ত আগ্রহ নিয়ে পড়তাম। যে-সমস্ত লেখকরা তখন আমাদের দেবতা, যাঁদের তখনও চোখে না দেখেও পথিকৃতে সবচেয়ে আপন মনে হয়, তাঁদের জলজ্যাঞ্জ জীবনের কথা কী আশ্চর্য সৃষ্টিরভাবে বর্ণিত হয়েছে ওই গ্রন্থে। আমরা তখন সদ্য কলেজীয় যুবক, একটু জ্ঞানালোচি শুরু করেছি, চায়ের দোকানে বসে বন্ধুবান্ধবদের কবিতা শোনাই। কিন্তু কোনও চিত্রতারকা বা রাজনৈতিক নেতা কিংবা ফুটবল বা ক্রিকেট খেলোয়াড়ের জীবন সম্পর্কে তেমন আগ্রহ বোধ করিনি, বরং অদ্য কৌতুহল ছিল সেইসব লেখকদের সম্পর্কে, যাঁরা আমাদের মন্ত্রমুক্তবৎ করে রেখেছিলেন।

বুদ্ধিদেব বসুকে চাকুৰ দেখার আগেও তাঁর সম্পর্কে অনেক খুঁটিলাটি আমাদের সংগ্রহে এসে যায়। এর মধ্যে সবকিছুই যে গৌরবজনক, তা নয়। একটা বয়েস থাকে যখন সম্মানিত ব্যক্তিদেরও খানিকটা হেয় করে একধরনের আনন্দ পাওয়া যায়। যাঁরাই প্রতিষ্ঠিত এবং বিখ্যাত—তাঁদের নামে নানারকম সভিয়মিথ্যে গল্প জুড়ে একটু ছোট করতে পারলে অহংকারে বাতাস লাগে। তাছাড়া, বিখ্যাত ব্যক্তিদের সম্পর্কে অনেক রকম গুজব প্রচলিত থাকেই। আমরা শুনেছিলাম, বুদ্ধিদেব বসুর মতন অহংকারী মানুষ নাকি আর দুনিয়ায় দুটি নেই, বাড়িতে কেউ গেলেই উনি বিলিতি কুকুর লেলিয়ে দেন। পরে দেখেছি, ওর মতন খাটি অর্থে ভদ্রলোক খুব কমই আছে এবং ওর বাড়িতে কেউ গেলে সচরাচর উনি নিজেই দরজা খুলতেন। বিলিতি কুকুর কখনও দেখিনি। তবে একটা শাস্তি ও কবি-কবি মুখের দেশি কুকুর আছে, প্রতিভা বসুর পোষ্য। এই কুকুর প্রসঙ্গে একটি লম্বা গল্প আছে, যার শেষ দিকটা মর্মাণ্ডিক

রকমের।

বুদ্ধদেব বসু সারাজীবন বহু নিদেমন্দ সহ্য করেছেন। প্রায় বালক বয়েসেই বিখ্যাত হয়েছেন এই কারণে—এবং শেষ জীবন পর্যন্ত বহু কটুভি বর্ষিত হয়েছে তাঁর দিকে। এই নিন্দুকদের মধ্যে একদল বলাই বাছল্য, ঈর্ষাপরায়ণ অক্ষম, আর এক দল রাজনৈতিক ভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং আর একটি দল, আমার দৃঢ় ধারণা, যাঁরা বুদ্ধদেব বসুকে ঠিকমতন চিনতে পারেননি এবং নানারকম গুজবে বিশ্বাসী হয়েছেন।

যখন বুদ্ধদেব বসুকে চিনতাম না, তখন থেকেই অন্যদের সঙ্গে প্রায়ই দারুণ তর্ক করতাম বুদ্ধদেব বসু বিষয়ে। আমাদের মনোভাব অনেকটা এরকম ছিল, আমরা নব্য লেখক, আমরা পূর্ববর্তী লেখকদের সম্পর্কে যা-খুশি বলতে পারি, কিন্তু অন্যরা কেন বলবে? সেই সময়ে ছাত্র মহলে সাম্যবাদের দিকে দারুণ ঝৌঁক, আমরাও ছিলাম—কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্কটা কেউই স্পষ্ট ভাবে বোঝাতে পারেননি। এক একজন এক-এক রকম কথা বলতেন, অতি উগ্ররা রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া, তারাশক্তরকে প্রতিক্রিয়াশীল এবং বুদ্ধদেব বসুকে উশ্চার্গামী কিংবা দুর্নীতিগ্রস্ত আখ্যা দিয়েছেন। একজন লেখক নিজেদের দলে নয় বলেই তাঁর সাহিত্যমূল্য খর্ব করার চেষ্টা আমার কাছে বরাবরই ন্যোরাজনক মনে হয়েছে। আমরা লক্ষ করেছি, বুদ্ধদেব বসু একজন প্রকৃত সাহসী লেখক—কোনও হীনতার কাছে মাথা নিচু করেননি কখনও। একবার মাত্র তিনি ফ্যাসি লিঙ্গোধী লেখক সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তারপর আর জীবনে কখনও কেমনও রাজনৈতিক দল বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজের নাম জড়াননি। তিনি সাম্যবাদী দলে বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু তাই বলে কখনও ক্ষমতাসীন শাসক দলের ছেতাহাতেও গিয়ে দাঁড়াননি। সুবিধে ভোগের চেষ্টা করেননি কোনওদিন, হাওয়া বুরোভূত বদলাননি। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায়, একজন লেখকের পক্ষে রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকাই যে সম্মানজনক, তিনি তা দেখিয়েছেন।

তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের আগেই তাঁর বিষয়ে তর্ক করতাম কেন বিরোধীদের সঙ্গে? তার কারণ, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে তিনিই একমাত্র লেখক, যিনি সব সময়ে আমাদের ব্যাপ্ত রেখেছিলেন। উপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার বেশি প্রিয়, কবি হিসেবে জীবনানন্দ দাশকে অনেক বেশি ভালবেসেছি হয়তো—কিন্তু সব মিলিয়ে, সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে বুদ্ধদেব বসু আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয়। তিনি সব সময়েই কিছু না কিছু একটা কাণ করেছেন। এবং তিনি কখন কী লিখছেন—তার দিকে লক্ষ না রেখে উপায় নেই। তাঁর যে-কোনও নতুন লেখাতেই তিনি প্রকৃতপক্ষে কোনও না কোনও উপায়ে নতুন। তারাশক্তর তাঁর শেষের দিকের উপন্যাসগুলিতে আমাদের অনাগ্রহী করে তুলেছিলেন—ভাল বা খারাপের প্রশংসন নয়, নতুনত্ব ছিল না। বুদ্ধদেব বসুর কল্পালের বন্ধুরা প্রায় তো লেখা থামিয়েই দিয়েছেন, কিন্তু বুদ্ধদেব বসু শেষ পর্যন্ত সজীব থাকতে পেরেছিলেন বলেই স্থবির হননি। অকস্মাত এক সময় তিনি কবিতা উপন্যাস ছেড়ে মন দিলেন অনুবাদে, বোদলেয়ার, রিলকে, হেন্ডার্লিন, এদিকে কালিদাস—অনুবাদের জন্য যে কতখানি

নিষ্ঠা লাগে, স্থাপন করলেন তার দৃষ্টান্ত। অনুবাদ ছেড়ে আবার উপন্যাসে, বাধালেন একটা হইহই কাণ্ড। ফের শুরু করলেন নাটক ও কাব্যনাটক। সেই নিয়ে কিছুদিন কাটল। কাব্যনাটকগুলি সবেমাত্র একথেয়ে হতে শুরু করেছে, আমরা বুদ্ধিদেব বসুকে খরচের খাতায় লিখবো লিখবো করছি, এমন সময় দুম করে আরম্ভ করলেন মহাভারতের কথা—ওই দুর্ধৰ্ষ বাংলা গদ্যের দিকে মনোযোগ না দিয়ে উপায় আছে! এবং প্রায়ই এক সঙ্গে লিখতে লাগলেন পর্বে পর্বে তাঁর আত্মজীবনী, রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা ও জীবনশৃঙ্খলির পর—এই ধরনের এমন মধুর রচনা আমি আর পড়িনি।

বুদ্ধিদেব বসু ছিলেন পুরোপুরি সাহিত্যিক। তিনি আমাদের দেখিয়ে গেলেন যে অন্যান্য পেশার মতনই সাহিত্যও একটি অতি পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার এবং একজন লেখককে পাঠক হিসেবেও কত খাঁটি হতে হবে।

দিনের মধ্যে ঘোলো থেকে আঠারো ঘণ্টা পর্যন্ত তিনি পড়াশুনো ও লেখালিখির মধ্যে ঢুবে থাকতেন, বিদেশি সাহিত্যের প্রচণ্ড অনুরাগী হওয়া সঙ্গেও খবর রাখতেন সাম্প্রতিকতম বাংলা রচনার। আমাদের মতন ক্ষুদ্র লেখকদেরও তিনি ডেকে ধরক দিতেন, লেখার ত্রুটি নির্দেশ করতেন, তাতে আমাদের ঝাঁঘার বিষয় এই ছিল যে, আমরা একেবারে মনোযোগের অযোগ্য হইনি।

বুদ্ধিদেব বসুর সঙ্গে অনেক বিষয়েই আমার মতের মিল না হওয়ার কথা। সাহিত্য কিংবা জীবন বিষয়ে আমরা ভিন্ন ধারণা পোষণ করেছি, ওর নির্দেশ অধিকাংশ সময়েই মানিনি। তবু, কখনও মুখে মুখে তর্ক করতে পারিনি—কারণ, আমার দুর্বলতা এই, যে লেখকের রচনা পড়ে আমি মুক্ষ হয়েছি, অভিভূত হয়ে থেকেছি, তাঁর মুখোমুখি এসে কখনও স্বাভাবিক হৃতে পারিনি, আড়ষ্টতা থেকেই যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বা জ্ঞানশঙ্করের সঙ্গে আমার তেমন সাক্ষাৎ-পরিচয়ই হয়নি, প্রেমেন্দ্র মিত্র বা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে কখনও জানাবার সুযোগ পাইনি যে, একসময় ওঁদের রচনা আমাকে কত পাগল করেছে। বুদ্ধিদেব বসুও শেষ পর্যন্ত আমাকে একটি অবাধ্য যুবক হিসেবেই জেনে গেলেন।

অর্থচ, ‘অন্য কোনোখানে’ কিংবা ‘মৌলিনাথ’ প্রভৃতি উপন্যাস যখন প্রথম পড়েছি, কয়েকটা দিন বিহুল হয়ে থাকতাম—হাতখরচের সামান্য পয়সা বাঁচিয়ে সেইসব বই কিনে বঙ্গুবাঙ্গবদের পড়াতাম—যে-কোনও সুন্দর জিনিস যেমন সবাই মিলে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে হয়, আমি যা পেয়েছি, আমার প্রিয় কেউও যদি সেটা না পান, তা হলে যেমন আশ মেটে না। ‘মৌলিনাথ’ বইখানি আমি তিন কপি কিনেছিলাম। পরবর্তীকালে কারুর কারুর মুখে শুনেছি, ওটা উপন্যাসই নয়। বুদ্ধিদেব বসুর প্রায় সমস্ত উপন্যাস সম্পর্কেই এরকম মন্তব্য করেছেন কোনও-কোনও সমালোচক। সমালোচকরা এসব ব্যাপার নিশ্চয়ই ভাল জানেন, কিন্তু আমি কী করে অঙ্গীকার করব, বুদ্ধিদেব বসু যে জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, তা আমাদের বুদ্ধিনির্ভর এক স্বপ্নের জগৎ, যেখানে উত্সাসিত হয় সুন্দরের এক-একটি অংশ—হয়তো খুবই রোমাণ্টিক, কিন্তু ভাষাশিল্পের যে এক-একটি সুন্দর প্রতিমা, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আজকাল দাবি উঠেছে, উপন্যাসকে সমাজসচেতন হতে হবে, তার মধ্যে মানুষের

মঙ্গল কিংবা শ্রেণী বৈশম্য দূর করার কথা থাকা উচিত—এ সবই ঠিক কথা। কিন্তু বিশ্বসাহিত্য এখনও দাঁড়িয়ে আছে লেখক শিল্পীদের রোমান্টিকতার ওপরে এবং এতেই যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। জানি, বুদ্ধদেব বসু তাঁর মধ্যবয়েস পর্যন্ত যেসব উপন্যাস ও গল্প রচনা করে গেছেন, সেই ধারায় এখন আর কেউ লিখবে না—তিথিডের বা নির্জন স্বাক্ষরের সেই চৃপচাপ, মষ্টর গতি, সেইসব স্পর্শকাতর ভাবুক মানুষরা হারিয়ে যাবেন, তবু সেজন্য আমার অন্তত দুঃখবোধ থাকবেই। অনেক সার্থক উপন্যাস পড়ব ভবিষ্যতে, বাহবাও দেব, কিন্তু ওই সৌন্দর্যের স্বাদ আর পাব কি?

বুদ্ধদেব বসুর কাছে আমাদের সবচেয়ে বেশি ঝণ কবিতার জন্য। যাকে আমরা এখনও আধুনিক কবিতা বলি, সেই আধুনিক কবিতাকে তিনি একাই জিতিয়ে দিয়ে গেছেন। আরও অনেক বড় বড় কবি এসেছেন রবীন্ননাথের পরে, কিন্তু সকলের হয়ে লড়াই করেছেন বুদ্ধদেব বসু। ‘আধুনিক কবিতা’ ছাড়া অন্য যে কবিতার ধারা, সাধু ক্রিয়াপদ ইত্যাদি—সেটি এখন হেরে গেছে নিশ্চিত ভাবে। এটা বুদ্ধদেব বসুর একক কৃতিত্ব যে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

জীবনানন্দ দাশ যখন প্রায় অপরিচিত, তখন বুদ্ধদেব বসু অবিরাম প্রবন্ধ ও আলোচনায় লোকসমক্ষে এনেছেন তাঁকে। একজন কবি আর-একজন জীবিত কবি সম্পর্কে এরকম উৎসাহ নিয়ে লিখেছেন, এ দৃষ্টান্ত বিরলের চেয়েও বিরল। শুধু জীবনানন্দ নয়, তিনি ওইরকমই লিখেছেন সমৈক্যনাথ দন্ত, বিশু দে, অমিয় চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পর্কে। অন্যরা অবশ্য বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে প্রায় কিছুই লেখেননি, অথবা যৎসামান্য, কিন্তু তিনি তো সে বিষয়ে চিন্তা করেননি কখনও।

তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন নবীন কবিরা। কবিতা পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরবর্তীদের যে কত ক্ষতি হয়েছে, তার পরিমাণ নির্ণয় করা শক্ত। একজন নবীন কবি কী করে জানবেন যে তার কবিতা সক্ষমতার সীমারেখাটা স্পর্শ করেছে কিনা? কবিতা পত্রিকা ছিল সেই মানদণ্ড। বুদ্ধদেব বসুর মতন একজন কবির কাছ থেকে স্বীকৃতি পাবার পর আঘাতিক্ষম অনেক দৃঢ় হয়।

কবিতা পত্রিকা সম্পাদনার সময় তাঁর নিষ্ঠা ছিল তুলনাহীন। প্রত্যেকটি চিঠি তিনি নিজের হাতে উত্তর দিতেন। এবং অবিশ্বাস্য ক্রতৃভাবে। আমরা একটা কবিতা তাঁর ঠিকানায় ডাকবাঞ্জে ফেলে পরের দিনই উত্তর পেয়ে যেতাম। কবিতা ভবনের ছাপ আঁকা থামে তাঁর খয়েরি কালিতে লেখা হাতের লেখা দেখলেই আমাদের বুকের মধ্যে ধূক করে উঠত।

এই প্রসঙ্গে একটু ব্যক্তিগত কথা বলি। ‘কবিতা’ পত্রিকায় পাঠানো আমার প্রথম কবিতাটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন একটুখানি বদলে। সেই বদলটুকু আমার পছন্দ হয়নি। পরে আর একটি সংকলনে সেটি অস্তর্ভুক্ত হলো আমি আবার সেটি নিজের মতন করে দিই। এর দু'তিন বছর বাদে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় এক সভায়—সেখানে তিনি আমার পরিচয় পেয়েছিলেন অন্যভাবে, আমি ওঁর এক দূর সম্পর্কের আঞ্চলীয়ের

মেয়ের প্রাইভেট টিউটোর ছিলাম। পরে জিঞ্জেস করলেন, ও, তুমিই কবিতা লেখো? তোমার চেহারা দেখলে তো তা বোঝা যায় না। এই বলে তিনি এত জোরে হাসলেন, যে-রকম আমরাও সহজে হাসতে পারি না। তারপর, আমার সেই কবিতাটিতে ওর সংশোধন আমি মানিনি কেন সে কথা জিঞ্জেস করলেন। আমি সঠিক উত্তর দিতে পারিনি। আসলে সেটা আমার গোঁয়ার্ডুমি ছাড়া আর কিছু না। এর পরে আমি আর একটা কবিতা পাঠাবার পরেই তিনি সেটা ফেরত দিয়ে জানালেন, এই কবিতাটিতে কিছু কিছু বদল দরকার।

আমি চুপচাপ চেপে গেলাম। এর বছরখানেক পরে আবার এক জায়গায় দেখা, উনি কথা প্রসঙ্গে বললেন, তুমি আর লেখা পাঠাও না কেন? আমি ব্যগ্র হয়ে বললাম, পাঠাব? আপনি অনুমতি দিলেই পাঠাতে পারি। উনি আবার সেইরকমভাবে হাসলেন। বাড়ি ফিরেই আমি আবার সেই পূরনো কবিতাটাই একটুও না বদল করে পাঠালাম। এই রকম ভাবে সেই একই কবিতা আমি ‘কবিতা’ পত্রিকায় পাঠিয়েছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল। এটা আমার একটা নিতান্ত ছেলেমানুষ জেদ। এই ঘটনাটার উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, কতখানি উদারতা থাকলে এই ধরনের উন্নত্য এবং মূর্খামি সহ্য করা যায় তা বোঝা যাবে। উনি তো আমার কবিতাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার লেখা ছাপা বন্ধ করে দিলেই পারতেন। উনি আমাদের প্রতি মনোযোগ দিতেন বলেই আমরা মনোযোগ দিয়ে ওর কথা শুনতাম। এ রকম ব্যবহার তো আর কানুন কাছে পাইনি। পরবর্তীকালে ওর কথা শুনে আমি অনেক কবিতা সংশোধন করেছি। একই ক্রিয়াপদ দিয়ে যে পর পর দুটি বাক্য শেষ করা উচিত নয়, এটা ওর কাছ থেকেই প্রথমে শিখি। খুবই সামান্য ব্যাপার—কিন্তু নবীন লেখককে তো কানুন এটা বলে দেওয়া দরকার।

বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর স্থান নেবার মতন কেউই রইলেন না। পরবর্তীকালের লেখকদের পক্ষে এটা এক বিরাট শক্তি। বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যাদর্শে কানুন বিশ্বাস থাক বা না থাক, যে বুদ্ধদেব বসুর সব রচনা পড়বে না, সে বাংলা ভাষার অনেক কিছুই শিখবে না। সে দরিদ্র থেকে যাবে।

বুদ্ধদেব বসু

হাওয়াই থেকে একটি চিঠিতে বুদ্ধদেব বসু আমাকে লিখেছিলেন যে সেখানকার প্রকৃতি তাঁকে দারুণভাবে মুক্ষ করেছে, অতিশয় গাঢ় রঙের আকাশ এবং সুসজ্জিত বৃক্ষরাজি থেকে চোখ ফেরানো যায় না। কিন্তু তিনি লিখেছিলেন, আমার মুশকিল হচ্ছে এই যে, এইসব সুন্দর দৃশ্য দেখলেও আমার কোনও না কোনও বিদ্যুত কবিতার লাইন মনে পড়ে, আমি ভুলতে পারি না, বিশ্ব সাহিত্যের রঞ্জরাজি আমার মধ্যে ভিড় করে আসে। আমি শুধু সাহিত্যের মধ্য দিয়েই সবকিছু উপভোগ করি, এ ছাড়া নিছক সাদা চোখে কিছু দেখার ক্ষমতা আমার চলে গেছে। (এটা তাঁর চিঠির অবিকল ভাষা নয়।)

আমার মনে হয়, এটাই বুদ্ধদেব বসুর সঠিক পরিচয়। তিনি চবিশ ঘটা সাহিত্যের মধ্যেই বেঁচে থাকতেন, কখনও লেখায়, কখনও অন্যদের রচনায়। তিনি ব্যক্তি-জীবনে মোটেই নীরস মানুষ ছিলেন না। বরং সদা ছটফটে এবং হাস্যময়, কিন্তু তাঁর রসিকতা এবং উপভোগের ব্যাপারগুলিও ছিল সাহিত্যসংক্রান্ত, অন্য কোনওরকম অসমীচীন কথাবার্তা তাঁর পছন্দ ছিল না। কখনও উৎসাহ দেখাতেন বটে মাছ বিষয়ে, বাঙালি রঞ্জন প্রণালী সম্পর্কেও তিনি উৎসুক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, কিন্তু এই সব কিছুই সাহিত্যমনস্ক আগ্রহ। তিনিই একমাত্র বলেছিলেন, মৌরলা মাছ কখনও শিশু, তরণী বা বৃদ্ধা হয় না—সব মৌরলা মাছই কিশোরী।

বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আমাদের অনেকেরই মতের মিল ছিল খুব কম। প্রায়ই বেশ ঝগড়াঝাঁটি হত। যখন তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না, তাকে কবিতা পাঠাতাম ‘কবিতা’ পত্রিকায়, তিনি প্রতিবার সবস্তে উত্তর দিতেন, কিছু কিছু পরিবর্তনের পরামর্শ দিতেন—এতে মুক্ষ হয়ে যেতাম।

এরপর যখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়, তাঁর বাড়িতে যাবার একটা অধিকার জন্মায়, আমরা যে-কোনও সময় হঠাত হঠাত গিয়ে হাজির হতাম। একবার আমরা কয়েকজন মিলে শিয়েছিলাম রাত সাড়ে এগারোটার বা তারও একটু পরে।

একবার রাত দুটোর সময় শরৎ ওঁকে টেলিফোন করেছিল, ঘোঁকের মাথায়।

কেন এরকম যেতাম? গেলেই তো ঝগড়া। উনি বরাবর অভিযোগ করতেন, আমরা ছন্দ জানি না। তখন ওর ‘শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর’ বেরিয়েছে—সেখানে তিনি ছন্দকে একটু আলগা করে দিয়েছেন, পয়ারের কোনও কোনও পর্ব সাত মাত্রায় ছেড়ে দিচ্ছেন, অর্থাৎ তাঁর ঘোঁক সুরেলা করার দিকে। আর আমরা চাইছি কবিতাকে আরও আঁট করতে, কথ্যভাষায় ধৰনি সরাসরি চুকিয়ে দিতে, হস্তগুলি অগ্রাহ্য করে প্রথম পর্বে ন’ মাত্রাতেও নিয়ে যেতে। আমরা বলতাম,

আমরাও আপনার এই নতুন ছন্দ মানি না। তারপরেই বেঁধে যেত তুমুল তর্ক।

তবু কেন যেতাম? তার কারণ, এখন বুঝতে পারি, বর্ষীয়ান কবিদের মধ্যে আর এমন কেউ ছিলেন না তখন, যাঁর সঙ্গে ঝগড়া করার ব্যাপারেও আমাদের আগ্রহ থাকতে পারে। যাঁর কাছে আমরা নিজেদের কথাগুলি খোলাখুলি বলতে পারি। যিনি আমাদের যুক্তি না মানলেও আমাদের অস্তিত্ব অগ্রহ্য করবেন না। আর সবাই ছিলেন বড় দূরে, দেখা হলে বড়জোর একটু ভদ্রতার হাসি, কিংবা প্রচন্ড ভৃৎসনা। বুদ্ধদেব বসু ছিলেন আমাদের মধ্যে সব সময় জীবন্ত।

শেষ জীবনে, সুধীন্দ্রনাথ দন্তেরই শেষ জীবনে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে বেশ একটা হৃদ্যতা হয়েছিল। স্বভাব-কুঠে বুদ্ধদেবকে প্রায়ই দেখা যেত সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে আজডায়। যেহেতু সংযোগকারী হিসেবে অনেক সময়েই থাকত আমাদের বশু জ্যোতির্ময় দন্ত, তাই কয়েক বার সেই আজডায় যোগদান করার সুযোগ পেয়েছি। এই দুই কবির আলাপচারি, একই সঙ্গে পরিহাস ও রঙরসের সমন্বয়, আমাদের বহু সন্ধ্যাকে স্মরণীয় করেছে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে সুধীন্দ্রনাথ দন্তের কবিতার অনুরাগী নই, বুদ্ধদেব বসুরও কবিতার চেয়ে গদ্য রচনাই আমার বেশি পছন্দের—তবু, এইদের কাছে গিয়ে মনে হত খুবই ঘনিষ্ঠ আঘাতের কাছে এসেছি। সামান্য লেখালেখি শুরু করার পর, নিজের বাবা-কাকা-মামা-জ্যোঠাদের সঙ্গে সম্পর্ক আলগা হয়ে গেছে, দেখাসাক্ষাৎ অনেক কমে গেছে, কিন্তু আস্তে আস্তে অনুভব করেছি, অদৃশ্যভাবে রয়েছে একটি বিশাল পরিবার, সেই পরিবারে আমরা কেউ খুব ছোট, অনেকে বড়, কিন্তু রক্তের সম্পর্ক অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই।

দুশো দুইয়ের বাড়ি থেকে একদিন বেশ রাত্রে ফিরছি, উনি সিডির দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, যে-কোনও কারণেই হোক সিডিতে আলো ছিল না। উনি বললেন, অঙ্ককারে—

কথাটা মনে আছে, কারণ উনি ‘অঙ্ককারে’ এই পর্যন্ত বলে একটু থেমেছিলেন, আমি সচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম—উনি তখনও থেমে আছেন দেখে আমি বলেছিলাম, আচ্ছা যাই! উনি আবার বলেছিলেন, অঙ্ককারে দেখে দেখে যেও!

অতি সাধারণ সামান্যই কথা, তবু মনে আছে এইজন্য যে উনি ‘অঙ্ককারে—’ বলে থেমেছিলেন।

টুকরো টুকরো স্মৃতি

কবিতা পত্রিকায় আমরা রচনা পাঠাতুম ডাকযোগে, তারপর দুর্মদুর বক্ষে অপেক্ষা। অতি তরুণ কবিদের অধীরতার কথা সম্পাদকমশাই বুঝতেন, তাই তাঁর স্বহস্তে লেখা চিঠি আসতে মোটেই বিলম্ব হত না। এখন অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হবে যে, ব্রিটিশ আমলে তো বটেই, এমনকী পঞ্জাশের দশকেও কলকাতায় সকালবেলা কোনও ডাকবাজ্জে চিঠি ফেললে সে চিঠি প্রাপকের কাছে পৌঁছে যেত সম্ভ্যাবেলা। দিনে তিনবার ডাক বিলি হত, এমনকী রবিবারেও শোনা যেত পোস্টম্যানের পদধ্বনি। এমনও অনেকবারই হয়েছে, কবিতা পত্রিকায় কবিতা পাঠিয়ে সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর কাছ থেকে উত্তর পেয়ে গেছি পরের দিনই। সেই স্বীকৃতজ্ঞ আনন্দের অভিজ্ঞতার কথা কোনওদিনই ভুলবার নয়!

কোনও পত্রিকা অফিসে নিজে গিয়ে কবিতা পৌঁছে দেবার কথা আমি চিন্তাই করতে পারতুম না। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর মুশ্শা দুই নম্বর বাড়িটির সামনে দিয়ে গেছি অনেকবার, এমনকী উলটোদিকের ঝুঁটপাথ দিয়ে হেঁটেছি অকারণে, তবু ভেতরে প্রবেশ করার সাহস হয়নি। বুদ্ধদেব বসুর মতো একজন অতি বিখ্যাত ও ব্যস্ত মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে আন্মার মতন একটি অকিঞ্চিকির লোক কী কথা বলবে, কেনই বা অকারণে তাঁর সময় নষ্ট করা হবে? কবিতা পত্রিকায় আমার তিন চারটি কবিতা ছাপা হয়ে যাবার পরেও সেই পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। আমার পাঠানো প্রথম কবিতাটিই তিনি মনোনীত করেছিলেন। সেই কবিতার নাম ‘তুমি’, কিছুদিন পর আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর সম্পাদিত ‘পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা’ নামের বিখ্যাত সংকলনের একেবারে শেষতম কবিতা হিসেব ওই কবিতাটি গ্রহণ করে আমাকে খুবই লজ্জায় ফেলে দিয়েছিলেন। যে কোনও কবিতাই ছাপা হয়ে যাবার পর তার দুর্বলতাগুলি আমার কাছে প্রকট হয়ে উঠত, আমার মনে হয়েছিল বুদ্ধদেব বসু ও আবু সয়ীদ আইয়ুব এই দু'জনেরই নির্বাচন ভুল হয়েছে। আমার পাঠানো তৃতীয় কবিতাটি বুদ্ধদেব বসু ফেরত পাঠিয়ে কিছু সংশোধনের উপদেশ দিয়েছিলেন। কতটা কী সংশোধন করেছিলুম মনে নেই। তবে পুনঃপ্রেরিত হবার পর ‘বিবৃতি’ নামের সেই কবিতাটি (যার প্রথম দেড় লাইন, ‘উনিশে বিধবা মেয়ে কায়ক্রেশে উন্তিরিশে এসে। গর্ভবতী হলো...’) কবিতা পত্রিকায় মুদ্রিত হবার পর আমার খানিকটা বদনাম হয়েছিল এবং পরিচিত মহলে কিছুটা নিন্দামন্দ শুনতে হয়েছিল বলে আমি বেশ উৎফুল্ল বোধ করেছিলুম।

সেই সময় প্রাইভেট টিউশনিই ছিল আমার একমাত্র জীবিকা। ঢাকার গুহঠাকুরতা পরিবারের একটি মেয়েকে আমি পড়াতুম। এই পরিবারটির সঙ্গে দুশো দুই

ରାସବିହାରୀ ଅୟାଭିନିଉ'ର ବସୁ ପରିବାରେର କିଛୁଟା ଯୋଗାଯୋଗ ଛିଲ । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ଆମି ବୁଦ୍ଧଦେବ ବସୁର ଆତ୍ମଜୀବନୀତେ ଏବଂ ଅଚିନ୍ତ୍ୟକୁମାର ସେନଗୁପ୍ତର 'କଲ୍ଲୋଲ୍ୟୁଗ' ପରେ ବୁଦ୍ଧଜୀବୀ ଓ ଗବେଷକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁପୁରୁଷ ଓ ଉଡ଼ାରହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ଶୁହଠାକୁରତାର ସଞ୍ଚାନ୍ଦ ଉପ୍ରେସ୍ ଦେଖେଛି । ଏହି ପ୍ରଭୁ ଶୁହଠାକୁରତାର ଏକ ଭାଇୟେର ମେଯେ ଅନୁରାଧା ଆମାର ଛାତ୍ରୀ । ଆମାର ଛାତ୍ରୀର ପିତା କଥାପ୍ରସଙ୍ଗେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ବସୁକେ 'ବୁଦ୍ଧା' ବଲେ ଉପ୍ରେସ୍ କରାନ୍ତେ । ଯତବାର ଆମି ଏହି ସମ୍ବୋଧନ ଶୁନ୍ତୁମ, ତତବାରଇ ଯେନ ଆମାର ବୁକେ ତଣ୍ଡ ଲୌହଶଳାକାର ଖୋଚା ଲାଗତ । ଆମାଦେର କାହେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ବସୁ ନାମଟିଇ ଏକଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ, ତିନି ଯେନ କାରା ବୁଦ୍ଧକାକା, ବୁଦ୍ଧମାମା ହତେ ପାରେନ ନା, 'ବୁଦ୍ଧା' ହବାର ତୋ ପ୍ରଶ୍ନାଇ ଓଠେ ନା । ଯାଇ ହୋକ, ଆମାର ଛାତ୍ରୀଟି ଏକଦିନ ଦୁଶୋ ଦୁଇତେ ବେଡ଼ାତେ ଗିଯେ ଅତି ଉଂସାହେର ସଙ୍ଗେ ଜାନିଯେଛିଲ ଯେ ତାର ମାସ୍ଟାରମଶାଇଓ କବିତା ଲେଖେ ! ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ବସୁ ପାତ୍ରା ଦେନନି, ତିନି ହାସତେ ହାସତେ ନାକି ବଲେଛିଲେନ, ଏମନ କୋନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଟିଉଟର ଆହେ ଯେ ଦୁଇଚାର ଲାଇନ ପଦ୍ୟ ଲେଖେ ନା ! ଆମାର ଛାତ୍ରୀ ଛାଡ଼ବାର ପାତ୍ରୀ ନୟ, ସେ ବଲେଛିଲ ଯେ ତାର ମାସ୍ଟାରମଶାଇଯେର ଦୁଇନଟି କବିତା କବିତା-ପତ୍ରିକାତେ ଛାପାଇ ହେଯେଛେ । ତଥନ ବୁଦ୍ଧଦେବ ବସୁ ସାମାନ୍ୟ କୌତୁଳ୍ୟ ଦେଖିଯେ ବଲେଛିଲେନ, ଓ, ତାଇ ନାକି ? କୀ ନାମ ବଲ ତୋ !

ବୁଦ୍ଧଦେବ ବସୁ ଆମାର ନାମ ଶୁନେ ଚିନିତେ ପେରେଛେନ, ଏଜନ୍ୟ ଛାତ୍ରୀର ବାଡ଼ିତେ ଗରିବ ମାସ୍ଟାରଟିର ସାମାନ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ହେଯେଛିଲ ବୋଧହୟ । ବୁଦ୍ଧଦେବ ବସୁ ସତ୍ୟଇ ଆମାର ନାମ ଶୁନେ ଚିନେଛେନ, ଛାତ୍ରୀର ମୁଖେ ଏ କଥାଟା ଶୁନେ ଯେ ଶିଖିରନ ଓ ପୁଲକ ବୋଧ କରେଛିଲୁମ, ତା ଆଜିଓ ମନେ ପଡ଼େ ।

ପରିଚୟ ନା ହଲେଓ ବୁଦ୍ଧଦେବ ବସୁକେ ଦୁଇଥେକେ ଦେଖେଛି ବେଶ କରେକବାର । କଥନ ଓ କଲେଜ ସ୍ଟ୍ରିଟ ଦିଯେ ହେଟେ ଯେତେ, କିନ୍ତୁ କୋନ୍ ଓ ସଭାଯା । ମନେ ଆହେ ଏକବାର, ମହାଜାତି ସମ୍ମେଲନେର ମଧ୍ୟେ ନିର୍ମିଳା ବନ୍ଦ ରବିନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମେଲନେ ତିନି ଏକଟି ଲିଖିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ କରିଛିଲେନ, ଖୁବଇ ଘନ ହେଁ, ଏମନ ସମୟ ଏକଜନ ଅତ୍ୟୁଃସାହୀ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ତାଁର ଖୁବ କାହେ ଗିଯେ ଛବି ତୁଳିଲ, ହଠାଂ ଫ୍ଲ୍ୟାଶ ଜ୍ଵଳେ ଓଠାୟ ବୁଦ୍ଧଦେବ ବସୁ ଏମନଇ ଚମକେ ଉଠିଲେନ ଯେ, ଠିକ ଯେନ ମନେ ହଲ କେଉ ତାଁକେ ଶୁଣି କରତେ ଏସେହେ ଏଇରକମ ଭେବେ ତିନି ଲାଫିଯେ ସରେ ଯାବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଲେନ ଏକପାଶେ । ତାରପର ଘୋର କେଟେ ଗେଲ, ପାଠ ଆର ଜମଳ ନା । ଆମାର ଇଛେ ହେଯେଛିଲ, ଏକଟା ଘୁସି ମେରେ ସେଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନେର ନାକ ଫାଟିଯେ ଦିଇ ।

ତାଁର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମୁଖୀ ସାକ୍ଷାଂକାରେର ଦିନଟିର କଥା ଆମାର ପରିଷକାର ମନେ ଆହେ । ସେଦିନ ଜୋଡ଼ାସାଂକୋତେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିକେର ହଲଘରେ କୋନ୍ ଓ ଏକଟି ସଭାତେ ଏସେହିଲେନ ବୁଦ୍ଧଦେବ ବସୁ । ଏକ ସମୟ ତିନି ବାରାନ୍ଦାତେ ସିଗାରେଟେ ଖେତେ ଏଲେନ, ହାତେ ମେପୋଲ ମାଇନର ସିଗାରେଟେର ପ୍ଯାକେଟ । ତାଁକେ ଘିରେ ଧରିଲ ଅନେକେ, ଆମି ଦାଁଡିଯେ ଛିଲୁମ ଏକଟୁ ଦୂରେ, ତାଁର କାହେ ଗିଯେ କଥା ବଲାର ସାହସ ହୟନି । ହଠାଂ ଅଜ୍ଞ ଚେନା କେଉ ଏକଜନ ଜିଜ୍ଞେସ କରିଲ, ଏହି ତୁମି ବୁଦ୍ଧଦେବ ବସୁର ସଙ୍ଗେ ଆଲାପ କରିବେ ନା ? ଆମାର ଉତ୍ସର ଶୋନାର ଅପେକ୍ଷା ନା କରେଇ ମେ ପ୍ରାୟ ଜୋର କରେ ଆମାକେ ଟେନେ ନିଯେ ଗେଲ ତାଁର ସାମନେ । ଆମାର ନାମ ଶୁନେ ସାମାନ୍ୟ କୌତୁଳ୍ୟ ଦେଖିଯେ ତିନି ବଲିଲେନ, ଓ, ତୁମିଇ ସୁନୀଲ ? ତୁମି ଅନେକଦିନ କବିତାଯ କବିତା ଦାଓନି । ପାଠିଓ ।

ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସାମନେ ଚଲେ ଏଳ, ଆମି ଦାଁଡ଼ିଯେ ରହିଲୁମ ଏକପାଶେ ଆରା କିଛୁକ୍ଷଣ। ଅନେକେଇ ଅବଲୀଲାକ୍ରମେ ନାନାରକମ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଯାଛେ ତାଁକେ। ଆମାର ମୁଖ ଦିଯେ ଏକଟା କଥାଓ ବେବୁଲୋ ନା। ଅଥଚ ବୁଦ୍ଧଦେବେର ସମସ୍ତ ବହିଇ ଆମାର ପଡ଼ା, କବିତାର ବହିଗୁଲି ତୋ ବଟେଇ, ଗଲ୍ଲ-ଉପନ୍ୟାସ-ଛୋଟଗଲ୍ଲ-ପ୍ରବନ୍ଧ ସବହି, ତାଁର ଗଦ୍ୟ ଲେଖାର ମଧ୍ୟେ ସେଇ ସମୟ ଆମାର ସବଚେଯେ ପ୍ରିୟ ଛିଲ ଦୁଟି ବହି। ‘ଅନ୍ୟ କୋନ୍‌ଖାନେ’ ଏବଂ ‘ମୌଲିନାଥ’, ଏହି ଦୁଟି ବହିଇ ଆମି ଟିଉଶନିର ଟାକା ଖରଚ କରେ ବଙ୍ଗୁଦେର କିନେ କିନେ ଉପହାର ଦିଯେଛି। ‘ତିଥିଭୋର’ ଉପନ୍ୟାସଟି ଆମି ପଡ଼େଛି ଚାର-ପାଂଚବାର, ଅନେକ କବିତାର ଲାଇନ ମୁଖସ୍ଥ। ଓଁକେ କତ କୀ-ଇ ବଲାର ଛିଲ, ଅଥଚ ଅଞ୍ଜୁତ ଏକ ଲାଜୁକତାଯ ଆମାର ମୁଖେ ଏକଟାଓ କଥା ଫୋଟେନି।

ସିଗନେଟ୍ ପ୍ରେସେର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଦିଲୀପକୁମାର ଗୁପ୍ତେର ଉଂସାହେ ଆମରା ସେଇ ସମୟ ଏକଟା ଥିଯେଟାର-ଗାନ ବାଜନାର ଝାବ ଖୋଲାର ଉଦ୍ୟୋଗ ନିଯେଛିଲୁମ। ଝାବଟିର ନାମ କୀ ହେଯା ଉଚିତ ମେ ବିଷୟେ ପରାମର୍ଶ ବା ଉପଦେଶ ଚାଇବାର ଜନ୍ୟ ଆମାଦେର ପାଠାନୋ ହେଯେଛିଲ ଚାରଜନ ବିଶେଷଜ୍ଞେର କାହେ, ଆବୁ ସମ୍ମାନ ଆଇୟୁବ, ନୀହାରରଙ୍ଗନ ରାୟ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ବସୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର। ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମି ପ୍ରଥମ ଦୁଃଖୋ ଦୁଇତେ ଯାଇ। ଦରଜା ଖୁଲେ ଦିଯେଛିଲ ମିମି, ଅର୍ଥାଏ ଏଥନକାର ମୀନାଙ୍କୀ ଦସ୍ତ, ଆମାର ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ଆହେ। ଆଲୁଥାଲୁଭାବେ ଶାଢ଼ି ଜଡ଼ାନୋ ଏକ ଚଞ୍ଚଳା ତରଙ୍ଗୀ ଆଚାର ଥେତେ ଥେତେ ଏବଂ ଜିଭେ ଚକାସ ଚକାସ ଶବ୍ଦ କରତେ କରତେ ଏସେ ଆମାକେ ଦେଖେ ଅତି ଅବହେଲାର ସଙ୍ଗେ ଜିଜ୍ଞେସ କରେଛିଲ, କୀ ଚାଇ? (ପରେ ଅବଶ୍ୟ ମିମି ଅନେକବାର ବଲେଛେ ଯେ, ମେ ଓଭାବେ କର୍ମକଳା ଆଚାର ଥେତ ନା, ବା ଆଚାର ଥେତେ ଥେତେ ଏସେ ଦରଜା ଖୁଲତ ନା)। ଯାଇ ହୋକ ମେବାର ଓ ବାଡ଼ିତେ ଆମି ମୋଟେଇ ପାଞ୍ଚା ପାଇନି, ବୁଦ୍ଧଦେବ ବ୍ୟନ୍ତ ଛିଲେନ, ଆମାର ବନ୍ଦନ୍ତ ଶୁଣେ ତିନି ଅଞ୍ଜୁତ ବିଶ୍ୱାସେର ସଙ୍ଗେ ତାକିଯେ ବଲେଛିଲେନ, ତୋମରା ଝାବ ଖୁଲବେ, ତୋମରାର ନାମ ଆମି ଠିକ କରେ ଦିତେ ଯାବ କେନ୍? ଆମି ଲଞ୍ଜିତ ଭାବେ ଫିରେ ଆସି। ମଞ୍ଜୁତ, ଚାରଜନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରାୟ ଏକଇ ରକମ କଥା ବଲେଛିଲେନ, ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ବେଶ ଖାଲିକଟା ବକେ ଦିଯେଛିଲେନ ତାଁର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରାର ଜନ୍ୟ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମାଦେର ଓଇ ଝାବଟିର ନାମ ହେଯେଛି ‘ହରବୋଲା’, ଖୁବ ଚମ୍ବକାର ନାମ ନା?

ଆମି ଥାକୁତୁମ ଘୋର ଉତ୍ତର କଲକାତାଯ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦସ୍ତ-ଓ ସେଇ ସମୟ ଥାକତ ପ୍ରେସ୍ଟିଟେର ମୋଡେ ସୋନାଗାଛିର କାହାକାଛି। ଜ୍ୟୋତିର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମେଧା, ଅଗାଧ ପଡ଼ାଶୁନେ ଓ କବିତାର ଜଗତେ ଏକଟା ଝାଡ଼ ତୁଲେ ଦେବାର ଆକାଙ୍କ୍ଷା, ସବ ମିଲିଯେ ତାର ପ୍ରତି ଆମାର ଆକର୍ଷଣ ଛିଲ ଦୁର୍ମନୀୟ। ଜ୍ୟୋତିର ସଙ୍ଗେ ବଙ୍ଗୁତ୍ତ ହ୍ୟାର ପରଇ ସଙ୍କେବେଳା ଆମି ସଠିକଭାବେ ଏବଂ ସ୍ଵପରିଚୟେ ଦୁଃଖୋ ଦୁଇତେ ଯାଇ। ତତଦିନେ ‘କୃତ୍ତିବାସ’ ବେବୁତେ ଶୁରୁ କରେଛେ, ଆମି ନିଜେଓ ଏକଥାନା ସମ୍ପଦକ। ଖାଲାସିଟୋଲା ଓ ମଦନ ଶା-ତେ ଯାତାଯାତ ଶୁରୁ କରେଛି। ରୀତିମତନ ପାଖା ଗଜିଯେଛେ, ଲାଜୁକତା କାଟାବାର ଜନ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତାଯ ଏସେହେ ଉଗ୍ରତା ଓ ନକଳ ଅହଙ୍କାରେର ଭାବ। ଜ୍ୟୋତି ମଦନ ଶା-ତେ ଯେତ କଦାଚିତ୍, କିନ୍ତୁ ଏକଦିନ ଓଥାନ ଥେବେଇ ବେରିଯେ ଆମରା ଚଲେ ଏଲୁମ ଦକ୍ଷିଣେ, ତଥନ ରାତ ପ୍ରାୟ ଗାଢ଼, ଆମରା କମ୍ବେକଜନ ମିଲେ ଦୁଃଖୋ ଦୁଇତେ ଏସେ ଶୁରୁ କରେ ଦିଲୁମ ହିଟ୍ଚି, କୋନାଓ ଅକିଞ୍ଚିତକର ବିଷୟ ନିଯେ ବୁଦ୍ଧଦେବେର ସଙ୍ଗେ ଜୁଡ଼େ ଦିଲୁମ ତର୍କ, ଜ୍ୟୋତିଇ ପ୍ରଧାନ ତାର୍କିକ, ଆମରା ଦୁ’ଏକଜନ ତାର ବାୟା-ତବଳା। ବୁଦ୍ଧଦେବ ହଠାଏ ରେଗେ ଉଠିଲେନ, ଏକଟା ଜଟିଲ ଇଂରିଜି ବାକ୍ୟ ଦିଯେ ତିନି ବୋବାତେ ଚାଇଲେନ ଯେ ଆମାଦେର ଓଇ ଝାବଟିର ନାମ ହେଯେ ତାଁର ବାଡ଼ିତେ ଉପଦ୍ରବ କରା ତିନି

একেবারেই পছন্দ করেননি। ঈষৎ রঙিন অবস্থায় আমরা বোধহয় বেশ বাড়াবাড়ি রকমের ডেঁপোমিই করে ফেলেছিলুম। সেদিন প্রতিভা বসুও আমাদের কিছু সন্মেহ ভর্তসনা করেছিলেন, কিন্তু তারই মধ্যে হঠাতে দুটি করে অতি সুস্থাদু কাবাব খেতে দিয়েছিলেন।

পরদিন সকালেই আমি ঠিক করেছিলুম যে, বুদ্ধদেব বসু আমার অত্যন্ত প্রিয় লেখক, তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বও আমার কাছে দারুণ শ্রদ্ধেয়, সেইজন্যই তাঁর কাছাকাছি যাওয়া আমার উচিত নয়। প্রিয় লেখক ও প্রিয় মানুষের কাছ থেকে যদি কোনও খারাপ ব্যবহার পাই, তা সহ্য করব কী করে? বিখ্যাত ব্যক্তিদের খুব কাছে যাওয়া ঠিকও না। তাঁর ব্যক্তিত্বে আমি অভিভূত হতেও চাই না, আবার তাঁর কোনও দুর্বলতা আমার চোখে প্রকট হয়ে উঠুক, সেটাও কাম্য নয়।

জীবনানন্দ দাশ তখন নেই। অন্যান্য প্রধান কবিদের সঙ্গে আমাদের কোনও মানসিক যোগাযোগ ছিল না। কবিতা পত্রিকায় সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুই ছিলেন সমকালীন কবিতা সম্পর্কে সবচেয়ে সজাগ। তিনি চিঠিতে আমাদের কবিতা সম্পর্কে নানারকম মন্তব্য করতেন, তার সবগুলির সঙ্গে একমত না হলেও এই ভেবেই শিহরন হত যে, একমাত্র তিনিই তরুণতম কবিদের সম্পর্কেও অবহিত।

জ্যোতির সূত্র ধরেই মিমি, ঝুমি ও পাপ্পাৰ সঙ্গে পরিচয় হল ক্রমে। জ্যোতি প্রথম থেকেই আমাকে এমন মুক্ষ করেছিল যে, কোনভাবে তার কোনও কথার ওপর না বলতে পারিনি। জ্যোতি আরও কয়েকবার জোর করে টেনে নিয়ে গেছে দুশো দুই-তে, যেখানে বুদ্ধদেব বসুর চেয়েও প্রতিভা বসুর সঙ্গে ভাব হয়ে গেল অনেক তাড়াতাড়ি, আমি বুদ্ধদেবের চেয়েও আড়ালে থাকারই চেষ্টা করতুম। আমরা পারিবারিক আজডাই দিতুম বেলি উত্তদিনে রাসবিহারী ছেড়ে নাকতলার বাড়িতে, বসবার ঘরে হঠাতে বুদ্ধদেব এসে পড়লে কিছু না কিছু নিয়ে তর্ক বেধে যেতই। তর্ক করতে করতে তিনি উন্নেজিত হয়ে উঠতেন, কষ্টস্বর উঠত উচ্ছগামে, এক সময় তার চেয়েও উচু গলায় অট্টহাস্য করতেন। আর কোনও প্রবীণ লেখকের ব্যবহারে এমন যৌবন চাঞ্চল্য আমরা দেখিনি। তর্ক হত ছন্দ ব্যবহার নিয়ে, তরুণ কবিদের ছন্দের মাত্রা তাঁর কাছে মনে হত অতিমাত্রিক। কিন্তু কখনও, কোনওদিন তার মুখে অনুপস্থিত কোনও লেখকের নামে নিলে শুনিনি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর একদা বন্ধুস্থানীয়, তখন তেমন বন্ধুত্বের সম্পর্ক নেই এমন কোনও সাহিত্যিককে হেয় করার চেষ্টা করলে তিনি তীব্রভাবে প্রতিবাদ করতেন, সেই লেখকের উৎকৃষ্ট রচনার নির্দর্শন তুলে ধরতেন। তাঁর চরিত্রের এই দিকটি আমার মনে দাগ কেটে যায়।

বুদ্ধদেব বসুর পরিবারের সঙ্গে আমার প্রকৃত ঘনিষ্ঠতা হয় বিদেশে। তখন বুদ্ধদেব ও প্রতিভা বসু, ঝুমি এবং পাপ্পা সবাই ইন্ডিয়ানার ব্লুমিংটনে, আমি সেখান থেকে চার-পাঁচশো মাইল দূরে আয়ওয়া সিটিতে। সেই সময় নিদারুণ নিঃসঙ্গতা আমায় পেয়ে বসেছিল। এক এক সময় প্রাণটা এমনই ছটফট করত যে, ইচ্ছে হত ছুটে নিয়ে কোনও বিমানে উঠে আটলান্টিক পেরিয়ে যাই। প্রায়ই টেলিফোনে বুদ্ধদেব, প্রতিভা বসু, পাপ্পাৰ সঙ্গে কথা বলে প্রাণটা কিছুটা সুস্থির হত।

বুদ্ধদেব শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিলেন একবার, আমাকেও আসতে বললেন শিকাগোতে, সেখানেই আমাকে প্রচণ্ড অপমানের মধ্যে পড়তে হল পাকেচকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার পর বুদ্ধদেবের সদলবলে নেমস্টন স্টিফেন হে নামে এক কলকাতা-ফেরত গবেষকের বাড়িতে। বুদ্ধদেব আমাকেও দেখা করতে বললেন সেখানে। স্টিফেন হে-র সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, কলকাতাতেও দেখা হয়নি, তবু মার্কিন দেশের পার্টিগুলি অনেক ইনফর্মাল হয়, সঙ্গে দু'একজন বন্ধুকে নিয়ে চলে আসা অতি স্বাভাবিক ঘ্যাপার। আমি যখন সে-বাড়িতে পৌছলুম, তখন অন্য অতিথিরা ভেতরের ঘরে পানাহার শুরু করেছেন। দীর্ঘকায়, অতিশয় সপ্রতিভ স্টিফেন হে আমার নাম ও আগমনের উদ্দেশ্য শুনে চোখমুখ কঠিন করে ফেললেন, আমাকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করে দিলেন না বটে কিন্তু ভেতরের ঘরে নিয়ে যাবার আহ্বানও জানালেন না, বুদ্ধদেবের সঙ্গে দেখা করার সুযোগও দিলেন না। সিড়ির পাশে একটা চেয়ারে অপেক্ষা করার ইঙ্গিত করলেন শুধু। সেখানে বসে বসে অভুক্ত ও তৎক্ষণাত্ম অবস্থায় সিগারেট টানতে টানতে আমি শুনতে লাগলুম ভোজকক্ষের কলকল ধ্বনি। অসহ্য বোধ হওয়ায় একবার উঠে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়ালুম, ঠাণ্ডা ক্লিকনে বাতাসের জন্য সেখানে বেশিক্ষণ টেকা যায় না, আবার বুদ্ধদেব বসুদের সঙ্গে দেখা না করে আমি চলেও যেতে পারছি না। রাগের চোটে সেদিন বোধহয় আমার সমস্ত শরীরে রঁয়ো ফুলে উঠেছিল।

পার্টি শেষ হবার পর বাইরে এসে বুদ্ধদেবের আমাকে এ অবস্থায় দেখে সাংঘাতিক অবাক ! বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, তুমি ভেতরে এলে না কেন ? আমাদের সঙ্গে খাবার টেবিলে জয়েন করলে নাচুকেন ? তোমার কথা আমি বলে রেখেছিলুম ! আমাকে যে ভেতরে আহ্বান করাই হয়নি, সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারলুম না আমি, শুধু বললুম, আমি খেয়ে এসেছি, বাইরের হাওয়াটা ভাল লাগছিল...।

সেখান থেকে সদলবলে যাওয়া হল শহরের অন্য প্রান্তে রাজেশ্বরী দণ্ডের আপার্টমেন্টে। সুধীপ্রনাথ দত্ত অল্প কিছুদিন পূর্বেই ইহজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন। গবেষণার সূত্রে রাজেশ্বরী শিকাগোতে একা থাকেন। সেখানে খানিকক্ষণ আজ্ঞার পর প্রতিভা বসু হঠাৎ বললেন, সুনীল, আমার সন্দেহ হচ্ছে তুমি কিছু খাওনি, মুখখানা শুকনো ! মাত্সমা রঘুনারা এসব ঠিক বুঝে যান কেমন করে যেন ! ততক্ষণে দু' পাত্র পেটে পড়ায় আমিও গড়গড় করে বলে দিলুম স্টিফেন হে-র অভদ্রতার কথা। বুদ্ধদেব রীতিমতন আহত বোধ করলেন। তারপর রাজেশ্বরীকে অনুরোধ করলেন আমার জন্য ভাত চাপিয়ে দিতে। যতক্ষণ ভাত রাখা হতে লাগল, ততক্ষণে নানা গবেষণা করে জানা গেল যে, কলকাতায় একদিন স্টিফেন হে-র বাড়িতে কতিপয় বাঙালি তরশু কবি খানিকটা পানোশ্বস্ত অবস্থায় নাচানাচি করে দু'একটা জিনিসপত্র ভেঙেছিল। সেই দলে আমি ছিলুম না, তবু শুধুমাত্র বাংলা কবিতা লেখা ও বয়েসের দোষে আমি তাঁর উশ্চার কারণ ঘটিয়েছি।

ধপধপে সাদা গরম ভাত, মাখন দিয়ে মাখা আলু সেদ্ধ ও গ্রাউণ্ড বিফের তরকারি, পরিবেশন করলেন অতিশয় সুন্দরী ও আমার প্রিয় গায়িকা রাজেশ্বরী, মনে হল এমন

অমৃতের মতন আহার আমার ভাগ্যে আগে কখনও জোটেনি। স্টিফেন হে-র ওপরে আমার আর কোনও রাগ নেই, ভাগ্যিস তিনি ওইরকম অসভ্যতা করেছিলেন, তাই তো রাজেশ্বরী দম্পত্তির নিজের হাতে রামা খাবার সুযোগ জুটে গেল আমার।

খুব সম্ভবত সেবারই আমি ওই দলের সঙ্গে ব্লুমিংটন চলে যাই, একেবারে বুদ্ধদেব-প্রতিভা বসুর সংসারেই অভিষ্ঠি হই। সেখানে সকাল-দুপুরে-সন্ধ্যায় খুব কাছ থেকে অতবড় একজন লেখককে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখন বুঝেছিলুম, বুদ্ধদেব একজন আপাদমস্তক সাহিত্যিক, সাহিত্যের পরিমণ্ডলের বাইরে তিনি স্বত্ত্ব পান না।

ব্লুমিংটনের একটা মজার ঘটনা মনে আছে। ওখানে থাকতে থাকতেই ভাইফোটার দিন পড়ল। রুমি তার ভাই পাপাকে ফোটা দেবে, সেই উপলক্ষে খাওয়া-দাওয়া, আমরা সবাই উপস্থিত। পাপার ফোটা হয়ে যাবার পর, খুব সম্ভবত প্রতিভা বসুই প্রস্তাব করলেন, আহা, সুনীলের তো বোন এখানে নেই, রুমি ওকেও ফোটা দিক না। রুমি ও অমনি আঙুলের ডগায় দই লাগিয়ে উদ্যত হল আমার কপালের দিকে।

আমি মহা আপত্তি জানিয়ে পিছিয়ে যেতে যেতে বললুম, না, না, না, আমি ফোটা নেব না, নিজের বোন ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও মেয়েকে আমি বোন বা দিদি মনে করি না।

সেই কাণ দেখে বুদ্ধদেব অট্টহাস্য করে উঠলেন, তাঁর হাসি থামতেই চায় না। এখনও যেন তাঁর সেই হাসির শব্দ শুনতে পাওচ্ছি।

বুদ্ধদেব বসুর জীবনাবসান

লিখতে একটুও ইচ্ছে করে না। কলম ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে হয়। এই সব সময় মনে হয়, মানুষের ভাষা এখনও কত দীন। বুদ্ধদেব বসু আর নেই, এ কথা কোন ভাষায় বোঝাবো।

খুব সকালবেলা রেডিয়ো শোনার অভ্যেস নেই, কারণ তখনও ঘূম ভাঙ্গে না। বিজের পাশে বাড়ি। বিজের ওপর থেকে কেউ একজন ডাকছে তাই ঘূম ভাঙ্গল। বারান্দায় এসে দেখি একজন বঙ্গ ও সহকর্মী, জঙ্গুটি করার আগেই তিনি বললেন, রেডিয়োতে জানিয়েছে, বুদ্ধদেব বসু মারা গেছেন। আপনি যাবেন? তৎক্ষণাতে উত্তর দিই, ও তাই নাকি? আচ্ছা, একটু পরে যাচ্ছি। ঘরের মধ্যে ফিরেই মনে হল, কী শুনলাম? কী উত্তর দিলাম—ঘূম জড়িত মস্তিষ্কের জড়তা কাটতে দেরি হয়। আবার বারান্দায় ফিরে গিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করতে চাই, কে মারা গেছেন? বুদ্ধদেব বসু? কীসব আজে-বাজে কথা বলছ? ততক্ষণে বস্তু ট্যাঙ্গি দূরে চলে গেছে। দৌড়ে আবার ঘরে ফিরে রেডিয়োর দিকে। দিলি থেকে বাংলা খবরে সত্যিই ওই অবিশ্বাস্য সংবাদ জানায়।

রবিবার শেষ রাত্রে বাংলা সাহিত্যের বিরাট পুরুষ, সব্যসাচী বুদ্ধদেব বসুর জীবনাবসান হয়েছে। মৃত্যুর কারণ সেরিব্রেল থ্রমবোসিস। তাঁর বয়েস হয়েছিল ৬৬।

বুদ্ধদেব বসু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন রবিবার সন্ধিয়া, চা খাবার সময়। তার খানিক পরেই ট্রেক। সংজ্ঞালুপ্তি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। ডায়মন্ডহারবার রোডের ক্যালকাটা হসপিটালে। সেইখানে রাত পৌনে তিনটা নাগাদ তিনি শেষ নিষ্ঠাস ত্যাগ করেন।

পরে জেনেছি, আকাশবাণী সোমবারের প্রভাতী সংবাদ শুরু করে এই আকশ্মিক ও মর্মাণ্ডিক দুঃসংবাদ দিয়ে। খবর পেয়েই বুদ্ধদেববাবুর অসংখ্য গুণগ্রাহী, বঙ্গবাঙ্কব, শিষ্য, আজ্ঞায়স্বজন ছুটে আসেন তাঁর নাকতলার বাড়িতে। ততক্ষণে তাঁকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসা হয়েছে স্বগৃহে, শুইয়ে রাখা হয়েছে চারদিকে বই আর লেখার প্রুফ ছড়ানো নিজের ঘরে। প্রশান্ত মুখচ্ছবি—যেন একটু পরেই ঘূম থেকে উঠবেন।

লোকের পর লোক, ফুলের পর ফুল। তারই মাঝখানে সহযর্মিণী প্রতিভা বসুর গুমরে গুমরে কান্না, তিনি নিজেই অনেকদিন অসুস্থ। বড় মেয়ে মীনাক্ষী (মিমি) ও একমাত্র ছেলে শুন্দীলীর (পাপ্পা) চোখ কান্নায় কান্নায় লাল। ছোট মেয়ে দময়ষ্টী (রুমি) কানপুরে। খবর পেয়ে ছুটে আসেন প্রেনে, সোমবার সন্ধিয়া। সোজা চলে যান শুশানে।

লোকেরা আসছেন, চলে যাচ্ছেন, আরও আসছেন। রাত থেকেই ছোটাছুটি করেছেন সন্তোষকুমার ঘোষ, সোমবারের ভোরে নাকতলার বাড়িতে দেখলাম রংঝন্ট সৈনিকের মতো সোফায় গা এলিয়ে বসে আছেন। আর উদ্ব্রাষ্টের মতো ছোটাছুটি করছেন জ্যোতির্ময় দস্ত ও ইন্দুভূষণ রায়। খানিক বাদেই এলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তারপর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রেমেন্দ্র মিত্র বললেন, আমার বিয়েতে মাত্র দু'জন বরযাত্রী গিয়েছিল, বুদ্ধদেব আর অচিন্ত্য।

শোককাতরদের ভিড়ে অসংখ্য পরিচিত মুখ। মনোজ বসু, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ডঃ অমলেন্দু বসু, ফাদার আঁতোয়ান, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গৌরকিশোর ঘোষ, আশাপূর্ণ দেবী, সুশোভন সরকার, অশোক মিত্র, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার সরকার, সুমথনাথ ঘোষ, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, নরেশ গুহ, শংকর চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, অরবিন্দ গুহ, অম্বান দস্ত, প্রবীরচন্দ্র বসুমল্লিক, গৌরী আইয়ুব দস্ত, মানসী দাশগুপ্ত, বিমল রায়চৌধুরী, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, তপতী মুখার্জি, অরুণ দাশগুপ্ত, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, কবিতা সিংহ, শাস্তি লাহিড়ী, রমাপদ চৌধুরী, দিব্যেন্দু পালিত, সুবীর রায়চৌধুরী, অমিয় দেব, অসিত গুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সুবীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, আরও অনেক নাম। দুপুর বারোটায় আমি চলে এসেছি। তারপর এসেছেন আরও অনেকে। তা ছাড়া এসেছেন তাঁর ভাইয়েরা, অন্যান্য স্বজনেরা। কেওড়াতলা শুশানে এসেছেন আরও অনেক গুণীজ্ঞানী। সাগরময় ঘোষ, কমলকুমার মজুমদার, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক প্রমুখ।

মৃতদেহ বাড়ি থেকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর প্রিয় ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের কাছে, যেখানে বুদ্ধদেববাবু আগে থাকতেন, যেখানে বসত সাহিত্যের মজলিস, বেরোত ‘কবিতা’ পত্রিকা। সেখানে কৈশোরের সঙ্গী, যৌবনের সুহৃদ, সাহিত্যচর্চার দোসর অঙ্গিত দস্ত অসুস্থ দেহ নিয়ে নেমে আসেন প্রিয় বাস্তবকে শেষ দেখা দেখতে। সেখান থেকে কনিষ্ঠ কবিয়া অগ্রজকে কাঁধে করে নিয়ে আসেন কেওড়াতলায়—যেখানে তাঁর আগে শেষ বিদায় নিয়েছেন জীবনানন্দ দাশ, সুধীল্লম্বনাথ দস্ত।

বুদ্ধদেববাবু তাঁর ছেলেমেয়েদের আগে অনেকবার বলেছিলেন, তাঁকে যেন গাড়িতে করে শুশানে না নিয়ে যাওয়া হয়। মানুষ মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে আকাশের তলা দিয়ে—এর চেয়ে মহৎ মহাযাত্রা আর কী হতে পারে।

তা ছাড়া বুদ্ধদেববাবু আরও বলতেন, “আমাকে আরও অন্তত দশটি বছর বাঁচতে হবে। তার কারণ মহাভারত নিয়ে লেখা শেষ করতে হবে এবং অসুস্থ রাণুকে দেখতে হবে।” রাণু প্রতিভা বসুর ডাকনাম।

তাঁর দশ বছর আর বাঁচা হল না, “অসুস্থ রাণুকে” ফেলে রেখেই তিনি চলে গেলেন।

সকালবেলা তাঁর ঘরে যখন ঢুকি, সর্বাগ্রে দেখতে পাই চারদিকে প্রুফ ছড়ানো। মৃত্যুর দিনও অনবরত দেখে গিয়েছেন। রচনাবলী বেরোচ্ছে, তারই প্রুফ। ‘দেশ’

পত্রিকার আগামী সাহিত্য সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ বের হচ্ছে। তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির প্রুফও দেখলাম ছড়ানো। তাঁর লেখা ‘মহাভারতের কথা’র প্রথম পর্ব বেরিয়েছে দেশ-এ। দ্বিতীয় পর্বও লেখা চলছে, অন্ন কিছু বাকি। তাছাড়া শেষদিকে লিখেছিলেন আত্মকথা ‘আমার জীবন’-এর দ্বিতীয়ঠার্ড। তারও শেষাংশ অসমাপ্ত থেকে গেল। এক একটা লেখার প্রুফ দেখতেন অন্তত পাঁচ ছ’ বার করে। এমন খুঁতখুঁতে ও পরিশ্রমী লেখক, বোদলেয়ারের পর, বিশ্বসাহিত্যে আর কেউ ছিলেন কিনা আমি অন্তত জানি না।

অনেকেই এসেছেন, তার জন্য বিশেষ দুঁজনকে দেখে অন্যরকম অনুভূতি হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। কঁজোল যুগের ভ্রান্তি বলতে আমরা এঁদেরই জেনেছি। এক সময় এই তিনজন বাংলা সাহিত্য কাণ্ডিয়েছেন, এঁদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে কনিষ্ঠ, তিনিই আগে চলে গেলেন।

শেষদিন পর্যন্ত যিনি লিখে গিয়েছেন, লোডশেডিংয়ের যন্ত্রণায় বিব্রত হয়ে হাতপাখা ও মোমবাতি ভরসা করেও লিখে গিয়েছেন, সেই বৃক্ষদেব বসুর জীবনের শুরু ১৯০৮ সালে। আদি বাড়ি ঢাকা জেলার মালখানগর। পিতা ভূদেবচন্দ্র বসু। জন্ম কুমিঙ্গায়। শৈশবে মাতৃবিয়োগের পর চলে আসেন মাতুলালয়ে। মাতামহ ও মাতামহীর স্নেহে মানুষ। মাতামহীকেই তিনি ‘মা’ জ্ঞাকরেন।

তাঁর পড়াশোনা ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি উচ্চল রঞ্জ। ইংরেজি এম এ-তে ফার্স্ট ফ্লাস ফার্স্ট। সেখানে থাকতেই অভিত দস্ত ও পরিমল রায়ের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব মিলে বার করেন ‘প্রগতি’ পত্রিকা। সে সময়ের আর একজন সঙ্গী ডঃ অমলেন্দু বসু। আর সাহিত্য শিল্পের প্রেরণাদাতা প্রভু শুহঠাকুরতা। তারপর কলকাতায় এসে যুক্ত হন ‘কঁজোল’ পত্রিকার সঙ্গে। পরে নিজেই বার করেন কবিতা আন্দোলনের প্রথম মুখ্যপত্র ‘কবিতা’ পত্রিকা। কিছুদিন অধ্যাপনা করেন রিপোর্ট কলেজে। তার অনেক পরে তুলনামূলক সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্টেটসম্যানে সাংবাদিকতা করেছেন কিছুকাল। অতিথি অধ্যাপক হয়ে বার দুই মার্কিন দেশেও পাড়ি দিয়েছেন।

বৃক্ষদেব বসু ছিলেন খাঁটি অর্থে সাহিত্যিক। সাহিত্যের জন্য তিনি সমস্ত মন্ত্রালয় সমর্পণ করেছিলেন। একবার, প্রবাসে থাকার সময়, তিনি একটা চিঠিতে জানিয়েছিলেন, যেখানেই যাই, যত সুন্দরই কোনও দৃশ্য দেখি না কেন, সেই প্রসঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের কোনও না কোনও মহারথীর রচনা আমার মনে পড়ে যাবেই। কখনও কখনও এজন্য বিরক্ত হই। আবার বুঝতে পারি, সাহিত্যের ভাগুরেই আমার সব আনন্দ জমা আছে।

হয়তো, সেই জন্যই তিনি নিজেও সাহিত্যের কোনও শাখাতেই হাত ছেঁয়াতে দ্বিধা করেননি। প্রধানত যিনি কবি, তিনি ছোটগাল্প রচনার জন্যও এককালে সমালোচক ও আদালতের রোষে পড়েছিলেন, উপন্যাসে এনেছেন নতুন স্বাদ, এককালে রবীন্দ্র-বিরোধী থেকেও রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে সবচেয়ে পাঠমোগ্য মৌলিক প্রবন্ধ লিখেছেন, অনুবাদের জন্য কতটা নিষ্ঠার প্রয়োজন হয় তার দৃষ্টান্ত

স্থাপন করেছেন, নাটক, কাব্যনাটক, এমনকী শিশুসাহিত্যেও দিয়ে গেছেন অমূল্য সম্পদ।

সেই মানুষ এখন শুয়ে আছেন কেওড়াতলা শাশানের চতুরে। এক এক সময় বিভ্রম হয়। মনে হয়, বুদ্ধদেব বসুর এত শুণগ্রাহী ও বক্তু পরিজন এখানে। অথচ তিনি নিজে উপস্থিত নেই কেন? কোথায় সেই শিশুর মতন সরল হাস্যময় মুখ, সেই উঁচু গলার হাসি। আমরা অনেকবার তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, ঘুগড়া করেছি, সাহিত্য বা সামাজিক অবস্থা বা রাজনীতি বিষয়ে ঘোরতর মতের অধিল হয়েছে— কিন্তু কখনও তো দূরে সরিয়ে দেননি। আজ তিনি নিজেই এত দূরে চলে গেলেন কী করে?

কানপুর থেকে তাঁর ছোট মেয়ে দময়স্তী (রুমি) এবং তাঁর স্বামী প্রদীপ সোজা এসে পৌছলেন শশানে। সে বিমানে এসেছে বাবাকে শেষ দেখতে। তবু একেবারে কাছে এসে রুমি কানায় ভেঙে পড়ে, না, দেখব না, দেখব না। আমি রুমিকে সাস্ফনা দেবার জন্য কয়েক পা এগিয়েও আবার দূরে সরে যাই, এখানে সাস্ফনার ভাষা কে জানে?

ফাদার আঁতোয়ান পাঠ করলেন উপনিষদের শ্লোক। তারপর তিনি নিজেই গান ধরলেন, ‘আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে’। সমবেত অনেক কঢ়েই গুঞ্জরিত হয় সেই গান। তখন বোঝা যায়, আমাদের চেনা জগতের সবচেয়ে বেশি দুঃখজয়ী মানুষ রবীন্নাথ, তিনি শোককে স্তুত উপলক্ষিতে রূপান্তরিত করতে জানতেন। জ্যোতির্ময় দন্ত এবং অন্য সকলের মুখে চোখে সেই উপজাকি।

এবার বৈদ্যুতিক চুল্লিতে নিয়ে যাবার পালা। শেষ মুহূর্তে একটু অনুষ্ঠান আছে, মুখাপ্তি। তাঁর একমাত্র পুত্র শুঙ্খশীল (পোকা) শোকে ভেঙে পড়েছে, গতকাল রাত্রে ঠিক এই সময়ে যে তার বাবার সঙ্গে গল্প করেছে, আজ এই সময় সে কী করে সেই মুখে আশুন ছোঁয়াবে? কিন্তু এটা একটা নিয়মরক্ষা মাত্র। আমরা কয়েকজন তাকে ধরে ধরে নিয়ে যাই। পাটকাঠি জলে ওঠে, সেই পাটকাঠি ধরা পাপ্তার হাত দারণভাবে কাঁপতে থাকে—আমরা কয়েকজন তার সঙ্গে হাত মেলাই। যতই দোষ করি, যতই অক্ষম হই, তবু বাংলা সাহিত্যজগতে আমরা সকলেই বুদ্ধদেব বসুর পুত্রবৎ। বাংলা ভাষা নিয়ে যাঁরা চর্চা করছেন, তাঁদের মধ্যে ক'জন একথা অস্বীকার করতে পারবেন?

একশ পঁচিশ বছরের রবীন্দ্রনাথ

১৮৭৩ সালের ভাদ্র মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ‘আয়-ব্যয়’-এর একটি হিসেব দেওয়া হয়েছিল। তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ওই পত্রিকার শুভার্থী দাতাদের ছাপা নামের তালিকায় জনৈক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। ইনি দান করেছেন দু’ টাকা বারো আনা তিনি পয়সা। এই বিশাল দাতাটি কোনও পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি নন, সাড়ে বারো বছর বয়েসের একটি বালক মাত্র। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে নিয়ে ডালহাউসি পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন, কিছুদিন পর তিনি ছেলেকে ফেরত পাঠিয়ে নিজে রয়ে গেলেন সেখানে। রাহা খরচ বাবদ ছেলের হাতে কিছু টাকা দিয়েছিলেন, তার থেকে যা বেঁচেছিল তা লক্ষ্মীছেলের মতন সেই ছেলে জমা দিয়ে দেয় কলকাতার বাড়ির খাজাপ্পিখানায়। কিছুদিন পরে কর্তব্যবুর নির্দেশে সেই টাকা থেকে ছ’ টাকা ফেরত দেওয়া হয় বালক রবীন্দ্রকে, বাকি টাকা তার নামে দান হিসেবে জমা পড়ে তত্ত্ববোধিনী ফাঙ্কে।

ঘটনাটি স্মরণযোগ্য এই কারণে যে, সেই প্রথম ছাপার অক্ষরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম দেখা যায়। রবি নামের ওই বালকটির নিজের নাম ছাপার অক্ষরে দেখার বোঁক ছিল আরও আগে থেকেই। ব্রাক্ষসমাজের ছাপাখানায় টাইপ খুঁজে খুঁজে নিজের নাম সাজিয়ে তাতে কালি মাখিয়ে কাশ্মীরের ওপর ছাপ দিয়ে দেখতে তার ভাল লাগত, এই ঘটনার উল্লেখ আছে জীবনস্মৃতিতে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা যখন ছাপা হয় তখন তার নীচে অবশ্য কবির নাম ছিল না। সে সময়ে নামহীন রচনা প্রকাশের রীতি ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত রচনা ঠিক কোনটি তা নিয়ে পশ্চিতে পশ্চিতে আজও কিঞ্চিৎ বিবাদ থাকলেও মোটামুটি এখন নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, বঙ্গদর্শন পত্রিকায় দ্বিতীয় বর্ষের দশম সংখ্যায় প্রকাশিত ‘ভারত-বিলাপ’ নামে অনামা কবির রচনাটিই ভবিষ্যতের এক মহাকবির সৃষ্টি। কবিতাটির তলায় সম্পাদক বক্ষিমচন্দ্র নেট দিয়েছেন, “এই কবিতাটি এক চতুর্দশ বর্ষীয় বালকের রচিত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি। কোন কোন স্থানে অল্পমাত্র সংশোধন করিয়াছি। এবং কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি।”

এই কিশোর কবির বয়েস অবশ্য তখনও চোদ্দ হয়নি, বারো-সাড়ে বারোর বেশি না, বয়েসের তুলনায় তাঁকে বড় দেখাত। বক্ষিম সন্তুষ্ট এই কিশোর কবিকে চোখেও দেখেছিলেন, কেননা এঁর বড় দাদা ছিলেন বক্ষিমের বন্ধু এবং সেই সূত্রে ঠাকুরবাড়িতে বক্ষিমের যাতায়াত ছিল। এমন কল্পনা করা যেতে পারে যে, ঠাকুরবাড়িতেই দ্বিজেন্দ্রনাথ কোনও একদিন বক্ষিমচন্দ্রকে বলেছিলেন, দেখুন দেখুন বক্ষিমবাবু, আমার কনিষ্ঠ ভাই রবি কেমন মনোমুগ্ধকর কবিতা রচেছে।

বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পাদক কিছু সংশোধন করে ছাপলেন এক বালকের কবিতা, যে একদিন জগৎ-বিখ্যাত হবে। কিন্তু সেই প্রথম কবিতাটিই যে আলোড়ন তুলেছিল, তার তুলনা পৃথিবীর আর কোনও সাহিত্যে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। সেই বালকের কবিতা নিয়ে তৎকালীন দুটি বিখ্যাত পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখা হয়েছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষ কবিতাটির সুনীর্ধ উদ্ভৃতি দিয়ে উচ্চাস প্রকাশ করেছিলেন। সোমপ্রকাশ পত্রিকায় শিবনাথ শাস্ত্রী আবার আকারে ইঙ্গিতে ওই কবিকে ঐচোড়ে পাকা বলে ছেড়েছেন। দুর্বকম প্রতিক্রিয়া হলেও এক বালকের প্রতি দুর্জন বাধা সম্পাদকের এতখানি মনোযোগ। নাম না ছাপা হলেও ওই কবিতার কবিকে যে দুর্জনেই চিনতে পেরেছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রায় বালক বয়েস থেকেই রবীন্দ্রনাথ এসে পড়েছিলেন যাকে বলে পাদপ্রদীপের আলোয়। পারিবারিক পটভূমিকাই তার প্রধান কারণ বটে, কিন্তু সে অতিরিক্ত সুযোগ তো তাঁর অন্য ভাতাদেরও ছিল। যদিও কিশোর রবির রচনাগুলি সাংঘাতিক চমকপ্রদ কিছু নয়, কিন্তু থানিকটা নতুন প্রতিভার ছাপ তাতে রয়েছে। যে-বছর রবীন্দ্রনাথের ওই কবিতাটি ছাপা হয়, সেই বছরই এক দাতব্য চিকিৎসালয়ে নিঃস্ব, রিস্ক অবস্থায় মৃত্যু হয় মাইকেল মধুসূদনের। বাংলার সবচেয়ে সাড়া জাগানো কবি শোচনীয় ভাবে ঝরে গেলেন অকালে, সেই বছরই যে নবীন রবির উদয় হল তিনি যে শুধু সমগ্র সাহিত্যকাশ দখল করবেন তাই-ই নয়, মাইকেলের প্রভাবও যে একেবারে মুছে দেবেন, তা কি বোঝা গিয়েছিল?

মাইকেল চলে গেলেও তখন হেম-বৰীনের খুব রবরবা। নবীনচন্দ্র সেন তাঁর আজ্ঞাজীবনীতে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম স্নেহীর বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে কলকাতার উপকঠে 'ন্যাশন্সল মেলা' দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে মেলার এক কোণে একটি প্রকাণ গাছের নীচে 'সাদা তিলা ইজার-চাপকান পরা' এক সুন্দর নব যুবককে দেখতে পেলেন, বয়েস আঠারো-উনিশ। প্রথম দর্শনেই নবীনচন্দ্রের মনে হল “বৃক্ষতলায় যেন এক স্বর্ণ-মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে।” পরে সে নব যুবকের কবিতা পাঠ ও গান শুনে তিনি একেবারে মোহিত। দু' একদিন পরে চুঁচড়োয় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বাড়িতে নেমস্তন্ত্র খেতে গিয়ে নবীনচন্দ্র সেই প্রসঙ্গ তুলতেই অক্ষয়বাবু বললেন, “কে? রবি ঠাকুর বুঝি? ও ঠাকুরবাড়ির কাঁচা মিঠা আঁব” নবীনচন্দ্র যদিও রবীন্দ্রনাথের বয়েস আঠারো-উনিশ ভেবেছিলেন, কিন্তু হিসেব অনুযায়ী তখন তাঁর বয়েস পনেরোর বেশি না। নবীনচন্দ্র চাকরির কারণে বাইরে বাইরে ঘূরতেন, তাই রবীন্দ্রনাথকে চাকুৰ চিনতেন না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই পনেরো বছর বয়েসেই রবীন্দ্রনাথ রীতিমত্ন বিখ্যাত।

পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবার পর নবীনচন্দ্র আফশোস করেছিলেন এই ভেবে যে, রবীন্দ্রবাবু শুধু লিখিক লিখে প্রতিভার অপচয় করছেন, তিনি মহাকাব্য লেখেন না। তাতে বাংলা ভাষার ক্ষতি হচ্ছে। নবীনচন্দ্র কিছুই বুঝতে পারেননি যে শুই লিখিক লেখকটিই একদিন তাঁর মতন সবক'টি মহাকাব্য রচয়িতাকে স্নান করে দেবেন।

শুধু কবিতার জন্যই অঞ্চল বয়েস থেকে এতটা খ্যাতি নয় নিশ্চিত, ঠাকুরবাড়ির এই রূপবান সন্তানটির আচরণ অতি বিনীত, সুমিষ্ট কষ্টস্বর, তদুপরি তিনি নিজে গান রচনা করেন। তাঁর 'মধুর কামিনীলাঙ্গন কঢ়ে' গান শুনে সকলেই মুঝ্ব। তৎকালীন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগৎটি বেশ ছোট, মুখে মুখে এই নবযুবকটির গুণপনা সম্পর্কে বার্তা রটে যায়।

কবিতা ও গানের পরেই আসে নাটক। সদ্য যৌবন থেকেই তিনি শুধু নাটক রচনায় মন দেননি, নিজে অভিনয়ও করেছেন, বিভিন্ন ভূমিকায় দক্ষ অভিনেতা। প্রথম যৌবনে তিনি গায়ক ও নট-নাট্যকার হিসেবেই বেশি প্রতিষ্ঠা পান। এই সময়কার কবিতাগুলি অতি রোমাণ্টিক, যেন মনে হয় এই কবিতাগুলি শুধুই নিভৃতে পড়ার মতন নয়। যিনি লিখেছেন তিনিও নিভৃতচারী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তখন আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছেন বাইরে, পারিবারিক গশি ছাড়িয়ে, ব্রাহ্ম সমাজ ছাড়িয়ে চলে আসছেন বৃহত্তর সমাজে। ঠাকুরবাড়ির অন্য ছেলেরাও সুযোগ-সুবিধে পেয়েছেন অনেক, টাকা পয়সা বোধহয় রবীন্দ্রনাথের থেকে বেশিই পেয়েছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নানা ছজুগে অপব্যয় দেখে তাই-ই মনে হয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতন অন্য আর কারুরই দেশ সম্পর্কে সামগ্রিক চিন্তা ছিল না। শুধু কবি বা সাহিত্যশ্রষ্টাই নয়, চিঞ্চানায়ক হিসেবেও তাঁর আঙ্গুপ্রকাশ ঘটতে লাগল ধীরে ধীরে।

যেন তিনি জানতেন যে তিনি বছদিন বাঁচ্চেন, তাই রবীন্দ্রনাথের কোনও তাড়াহড়ো ছিল না। ঠাকুরবাড়ির ছেলে হিমেরে যতটা খ্যাতি পাবার কথা, তা তিনি পেয়ে গেছেন প্রথম দিকেই, তারপর তাঁকে সব কিছুই অর্জন করতে হয়েছে। প্রথমে তিনি বাংলার মন জয় করেছেন, তাঁরপর তাঁকে সব কীর্তি ও ব্যক্তিত্বের পরিধি পরিব্যাপ্ত হয়েছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, তাঁরপর তিনি পা বাড়িয়েছেন বিশ্বের দিকে। গ্রীষ্মের দুপুরে খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে তিনি যখন নিজের কবিতার ইংরিজি তর্জমা করছিলেন, সেই সময় তাঁর বড়দাদা তাছিল্যের সঙ্গে বলেছিলেন, তুই নিজে থেকে এসব করতে যাচ্ছিস কেন, সাহেবদের যদি প্রয়োজন হবে, ওরা নিজেরা অনুবাদ করে নেবে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠিক বুঝতে পারেননি, সাহেবদের কোনও প্রয়োজন ছিল না, তারা নিজেরা তাদের পদানত দেশে কোনও কবিকে সম্মান জানাবার জন্য ব্যগ্র ছিল না। একটি পরাধীন দেশের নাগরিককে বিশ্ববাসীর কাছে প্রতিষ্ঠা পেতে গেলে শুধু প্রতিভা নয়, অসীম ধৈর্য ও পরিশ্রমেরও প্রয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথ যে বইয়ের জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন, আমরা বাঙালিরা জানি, সেটি তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রস্তু নয়। গোটা বাংলা সাহিত্যে গীতাঞ্জলির স্থান নগণ্য। বাংলা গীতাঞ্জলি ও ইংরিজি গীতাঞ্জলি অবশ্য এক নয়, নামটি অপরিবর্তিত রেখে রবীন্দ্রনাথ ইংরিজি গীতাঞ্জলিতে তাঁর অন্য কিছু কবিতাও জুড়ে দিয়েছেন। তা সঙ্গেও ইংরিজি গীতাঞ্জলিকে খুব একটা উচ্চ মূল্য দেওয়া যায় না। সাহেবরা কীজন্য ওই বই পড়ে মুঝ্ব হয়েছিলেন তা বলা শক্ত। কেউ কেউ বলেন, যুদ্ধের আগেকার ইউরোপের অশাস্ত্র পরিবেশে ওই সব অধ্যাত্মরসের কবিতাগুলি পড়ে ওরা শাস্তি পেয়েছিল। হতেও পারে। তবে, ইয়েটস-এজেরা পাউন্ডের যে অধ্যাত্মরসের দিকে তখন খুব ঝোঁক ছিল এমন বিশ্বাস করা

শক্ত। আঁদ্রে জিদ রবীন্দ্রনাথের নাটক পড়ে মুক্ত হয়ে নিজে অনুবাদ করেছিলেন 'ডাকঘর'।

যে বইয়ের জন্যই নোবেল পুরস্কার দেওয়া হোক, এতে কোনওই সন্দেহ নেই সারা পৃথিবীতে তখন রবীন্দ্রনাথের মতন এত বিশাল মাপের লেখক আর একজনও ছিলেন না। সে বছর তাঁর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী টমাস হার্ডির চেয়ে রবীন্দ্রনাথ অস্তত দশ গুণ বড়। সেই বাহাম বছর বয়েসেই রবীন্দ্রনাথ প্রায় একক প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের মান এনেছেন প্রথম সারিতে। তিনি কবিতা ভাল লিখেছেন না ছেটগল্প ভাল লিখেছেন, এ রকম প্রশংসন অবাস্তর, কারণ কবিতায়-গল্পে-উপন্যাসে-প্রবক্ষে-নাটকে-গানে-লঘু রচনায় বাংলার সংস্কৃতিকে মাতিয়ে রেখেছেন। প্রচুর লিখেছেন তিনি, তার কোনওটাই একেবারে অপাঞ্জল্য তো নয়ই, এমনকী দ্বিতীয় শ্রেণীরও বলা যাবে না, ভাষা ব্যবহার ও সুরচিতে সবই প্রায় প্রথম শ্রেণীর। একজন লেখক সাহিত্যের কোনও একাটি শাখাও বাদ দেননি এবং কোনওটিতেই বিফল হননি, এইরকম দ্বিতীয় লেখক আর পৃথিবীতে পাওয়া যাবে কি?

নোবেল প্রাইজের প্রসঙ্গে একটি কথাই বিশেষভাবে বলা যায়। বাংলা ভাষার পাঠক তথা ভারতীয় পাঠকরা রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে জানে, তাঁর বিশালত্ব যেভাবে অনুধাবন করতে পারে, বিদেশিরা সে তুলনায় রবীন্দ্রনাথকে কতটুকু জেনেছে? যদি পুরোপুরি রবীন্দ্রনাথকে তারা জানতে পারত, তাহলে তো তারা রবীন্দ্রনাথকে মাথায় নিয়ে নাচত। রবীন্দ্রসংগীতের মর্মই তো ওরা সুবিল না। ইস, ওদের কী দুর্ভাগ্য!

দেশের লোকও অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে মাথায় নিয়ে নাচেনি। নোবেল পুরস্কারের প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কেটে গেলে বেরিস্টে-প্রডল অনেক হিংস্র দাঁত ও ধারাল নথ। নির্লজ্জ পরত্রীকাতরতায় এদেশের মানুষ ফাস্ট ফ্লাস ফাস্ট। মানসিক ভাবে যারা বামন তারা লম্বা লোকদের সহ্য করতে পারে না। নিজেরা বড় হওয়ার চেষ্টা না করে তারা চায় বড় মানুষের মাথা কেটে ছেট করতে। এরণ্ড বনে এক মহাকুম, সমস্ত বড়-ঝাপটা তিনি মাথা পেতে নিয়েছেন, কিন্তু নত হননি।

রবীন্দ্রনাথের কিছু ভক্ত ও চাটুকার তাঁকে সব সময়েই ঘিরে থাকত, তারা তাদের শুরুদেবের দৃষ্টিকে কিছুটা আড়াল করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু উপকার করেনি। যখন তাদের সাহায্যের যথার্থ প্রয়োজন ছিল তখন তারা পিছু-পা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ পক্ষে কিন্তু পাওয়া যাবে অনেক উজ্জ্বল জ্যোতিষ। এই শতাব্দীর বিখ্যাত বাঙালিদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ও সুভাষচন্দ্র বসু ছাড়া রবীন্দ্রনাথের শক্রতা বা নিন্দা করতে বাকি রেখেছেন কে? যাঁদের রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ মনে করতেন, যাঁদের তিনি কাছে টেনেছিলেন, তাঁরাও বিরুপ হয়েছেন এক সময়। যেমন জগদীশ বসু, যেমন দেশবঙ্গ চিন্তুরঞ্জন। তিনি শরৎচন্দ্র ও নজরন্দুকে সন্মেহে নিজের বই উপহার দিয়েছেন, নজরন্দু যখন জেলখানায় গিয়ে অনশন করেছিলেন তখন উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ তার পাঠিয়েছিলেন তাঁকে, এরাও রবীন্দ্রনাথের সামনে এসে যথেষ্ট ভক্তি প্রদর্শন করলেও রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কলম ধরতে দ্বিধা করেননি, ব্যঙ্গ-বিন্দুপ করেছেন অবলীলায়। সুরেশ সমাজপতি, সঙ্গনীকান্ত দাসদের কথা ধর্তব্যের মধ্যে

নয়, পরনিন্দাই এদের পেশা, কিন্তু বিপিনচন্দ্র পাল, যদুনাথ সরকারের মতন মানুষও কটুভূক্তি করেছেন নানাভাবে। অনেকেই শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গেছেন, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনে মিথ্যে কালিমা লাগাতেও দ্বিধা করেননি। যেমন ডি এল রায়। এ ছাড়া কত পত্র-পত্রিকা যে কাদা ছিটিয়েছে তার ঠিক নেই। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দশ বছরের মধ্যেই দেখা গেল, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রপ্রভাব মুছে ফেলার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। শুধু তাঁর মতন বনস্পতিই আড়ালে পড়ে গেলেন না, শরৎচন্দ্র-সজুরুলের ধারাও রুদ্ধ, ওই জীবনানন্দ-মানিক-প্রেমেন্দ্রের দল যে আধুনিক সাহিত্যের প্রস্তুন করেছেন তাই-ই দিনে দিনে কালকেতুর মতন বাড়ছে। রবীন্দ্রমানস ও আধুনিক সাহিত্যের সংঘর্ষ বেশ কিছুদিন চলেছিল। সমালোচকরা এই আধুনিক সাহিত্যকে আঁতুড়ে নুন খাইয়ে মারতেও উদ্যত হয়েছিল। পাঠকরা কিন্তু আধুনিক সাহিত্যকে বর্জন করেনি, বিতর্ক চলতে থাকলেও পাঠকশ্রেণী সমসাময়িক কালের প্রতিচ্ছবি ও চিন্তার প্রতিফলনকে অগ্রহ্য করতে পারে না। পণ্ডিতেরা এবং উচ্চমধ্যবিত্ত বাঙালি বাবু সমাজ আরও অনেকদিন অবশ্য রবীন্দ্র-সর্বস্বত্ত্বা আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন, তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ আর শুধু লেখক নন, পূজনীয় গুরুদেব। কোনও কোনও অতি পণ্ডিত এমন কথাও বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যে আর কিছুই পড়ার নেই, রবীন্দ্রনাথের পর আর বাংলা কবিতা লেখাই হয়নি। কোনও জীবিত চলমান ভাষা সম্পর্কে ভূলা কোনও দেশে কোনও যথার্থ পণ্ডিত এমন কথা বলতে পারেন, বিশ্বাসই করা যায় না। কিন্তু এদেশে সুকুমার সেন, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ এরকম বলেছেন।

বিদেশে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা পার্ছ যেতে থাকে হ হ করে। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে যে সব রচনা নিয়ে ইইচই হয়েছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেগুলি নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে চায় না। ইংরেজিতে অনুদিত হলেও রবীন্দ্র রচনাবলী মূল ইংরিজি সাহিত্যের অন্তর্গত হয়নি, ক্লাসিকস হিসেবে গণ্য হওয়া তো দূরের কথা। মার্কিন দেশের পাঠকরা রবীন্দ্রনাথকে ভাল করে ছুঁয়েও দেখেনি। শাটের দশকে লন্ডনে ফেবার অ্যান্ড ফেবার কোম্পানির অফিসে টি এস এলিয়টের সঙ্গে আমার স্বল্পকালীন সাক্ষাতের সময় রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ওঠায় তিনি স্থিত হেসে বলেছিলেন, নট মাই কাপ অফ টি। এলিয়টের মতো প্রবীণ কবিই যদি এমন রবীন্দ্র অনাসক্তি দেখান, তা হলে তৎকালীন তরুণ কবিদের মনোভাব সহজেই অনুমেয়। আমরা মোবেল পুরস্কারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম জড়িয়ে বিদেশে গর্ব করতে যাই। কিন্তু পশ্চিমে ওই পুরস্কারের সম্মান অনেক কমে গেছে। বছরে একবার দিন কয়েকের জন্য ওই পুরস্কার নিয়ে আলোচনা শোনা যায়, তারপর কোন লেখক কবে ওই পুরস্কার পেয়েছে তা অনেকেই ভুলে যায়।

একমাত্র সোভিয়েত দেশেই রবীন্দ্রচর্চা এখনও অব্যাহত আছে কোনও অজ্ঞাত কারণে। সেখানকার পাঠকরা রবীন্দ্রনাথকে পছন্দ করে। রবীন্দ্র রচনাবলীর একটি পাঁচ লক্ষ কপির সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, সেদেশে কোনও দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তির কাছ থেকে একথা আমার নিজের কানে শোনা।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর বছরে খুব ঢাক-চোল বাজিয়ে উৎসব করা হল, তারপর পাকাপাকিভাবে তাঁকে ছবি করে ঝুলিয়ে দেওয়া হল দেওয়ালে, তাঁর গ্রন্থাবলী চাবিবন্ধ করে রাখা হল আলমারিতে। যে কোনও বাড়ির আলমারিতে রবীন্দ্র রচনাবলী না থাকলে খুবই বেমানান লাগে। সেইজন্য সরকার থেকে সুলভ মূল্যে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের কথা ঘোষণা করা হলেই বিরাট লাইনে ছড়োছড়ি পড়ে যায়। জীবৎকালে সব কঠি খণ্ড পাওয়া যাবে না জেনেও উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যেতে চেয়ে লোকে এই রচনাবলীর গ্রাহক হয়। এই সময়কার সাহিত্য থেকে রবীন্দ্রনাথের ছাপ মুছে গেলেও বাংলার সংস্কৃতি জগতে তিনি একচেত্র অধিপতি। যে কোনও সাংস্কৃতিক উৎসবে, এমনকী বিবাহ বা আনন্দবাসরেও রবীন্দ্রসংগীতের স্থান অবধারিত। তাঁর নাটক কোথাও না কোথাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে সারা বছর। তাঁর কাহিনী-ঘৰ্য্যা কবিতাগুলি আবৃত্তিকারদের কঠে জনপ্রিয়। একমাত্র রবীন্দ্র-ন্যূট্যাই তেমন অসুবিধের নয়। স্কুল-কলেজের বাইরে তেমন জমে না। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি আধুনিক রূচিতে অনেকটাই ভাবালূতাপূর্ণ মনে হলেও তাঁর পরে আর কেউ উল্লেখযোগ্য নাটক লেখেননি। রবীন্দ্রনাথ তবু নাটক নিয়ে নানান পরীক্ষা করেছেন, একালের পরীক্ষামূলক সব নাটকই আমদানি করতে হয় বিদেশ থেকে। আধুনিক কবিরা বাংলা গান রচনার দিকে গেলেনই না একেবারে। গীতিকার ও সুরকার আলাদা হয়ে যাওয়াই এর একমাত্র কারণ হয়তো নয়। আধুনিক গানে শচীন দেববর্মণ এবং সলিল চৌধুরী বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দি সিনেমার জগৎ তাঁদের টেনে নিয়ে গেল এবং চুষে ছিবড়ে করেছাড়ল। তাঁদের কোনও উত্তরসূরি পাওয়া গেল না।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি বাঞ্ছার অন্য খণ্ডে, পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মহা শোরগোল পড়ে যায়। সেখানকার হঠকারী সরকার জোর করে রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ ও রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার বন্ধ করে দিতে গেল। বাধা দিলেই প্রতিবাদ প্রবল হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করে দেবার প্রয়াসের ফলেই সেখানকার সংস্কৃতিপ্রেমীরা নবোদ্যমে রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধরলেন। রবীন্দ্রচৰ্চার জোয়ার এসে গেল সেখানে। অনেকের গদ্য ভাষায় দেখা গেল রবীন্দ্র গদ্যরীতির প্রভাব, রবীন্দ্রসংগীতে এল নতুন উদ্ধীপনা। সেখানকার বিরোধীপক্ষই যখন জয়ী হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ল, তখন তার জাতীয় সংগীত হল “আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।”

এদিকে ভারতের জাতীয় সংগীতও রবীন্দ্রনাথেরই রচনা, তা হলেও এদেশের মানুষ যাতে সে গান ভুলে না যায়, তাই ভারত সরকার প্রতিটি সিনেমা হলে জাতীয় সংগীত বাজাবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু স্থান্দভাবে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীত শোনার বদলে দর্শকরা শো শেষ হতে না হতেই পড়ি কি মরি বলে দৌড়তো। শেষ পর্যন্ত কিছুদিন পর সেই প্রহসন বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখনকার বেতারে টিভিতে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার অবাধ, প্রতিদিন রাখাটাই যেন বাধ্যতামূলক। তাই দলে দলে গায়ক-গায়িকা নিছক যান্ত্রিক সুরে গান গেয়ে যায়। নতুন ভাবে পরিবেশনে কোনও চিন্তাই নেই। তরুণ সাহিত্যিক মহলে রবীন্দ্রনাথের নাম কদাচিং উচ্চারিত হয়।

রবীন্দ্র-বিরোধিতার কোনও প্রশ্নই নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন সমগ্র পটভূমিকা জুড়ে। বাংলা ভাষা নিয়ে যিনি লেখালেখি করবেন, তিনি সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্য মাথায় না রাখলে নতুন কিছু লিখবেন কী করে? সারা জীবনে গান লিখেছেন প্রায় আড়াই হাজার, কবিতা দেড় হাজার, ছোটগল্প একশর কিছু কম, উপন্যাস তেরোটি, নাটক-গীতিনাট্য-ন্যূননাট্য মিলিয়ে প্রায় ছত্রিশটি। এছাড়া প্রবক্ষের পাহাড়, অঘণকাহিনীর নদী ও চিঠিপত্রের পত্ররাঙ্গি সংখ্যাতীত। ছোটগল্প অঞ্চল বয়েসেই লিখেছেন বেশি। যেমন ছবি আঁকতে শুরু করলেন বেশি বয়েসে। এই দুটি বিষয়ে তাঁর খুব যেন একটা আঘাতিশ্বাস ছিল না। অথচ ছোটগল্পে তিনি আজও অপরাজেয়। তিনি গ্রামজীবনের ওই মধুর গল্পগুলি না লিখলে বিভূতিভূষণ জগ্নাতেন কিনা সন্দেহ। আর ছবি আঁকলেন তাঁর সমকাল থেকে অনেক এগিয়ে। পল ভালেরির মতন দু' চারজন সাহেব ছাড়া তাঁর ছবির বিশেষ সমাদুর করেনি কেউ, এখন দিনদিন তাঁর ছবি চিলতে শিখছেন সমঝদাররা।

মৃত্যুর বছরেও প্রফ দেখতে দেখতে তিনি রানী চন্দকে একদিন বলেছিলেন, “এত লিখেছি জীবনে যে লজ্জা হয় আমার। এত লেখা উচিত হয়নি...জীবনের আশি বছর অবধি চাষ করেছি অনেক। সব ফসলই যে মড়াইতে জমা হবে তা বলতে পারিনে। কিছু ইদুরে থাবে। তবুও বাকি থাকবে কিছু। জোর করে কিছু বলা যায় না; যুগ বদলায়, কাল বদলায়, তার সঙ্গে সব কিছুই প্রয়োব্দলায়। তবে সবচেয়ে স্থায়ী হবে আমার গান, এটা জোর করে বলতে পারি।”

শেষ পর্যন্ত গান সম্পর্কে দুর্বলতা ছিল তাঁর। আজি হতে শত বর্ষ পরে কেউ তাঁর কবিতা আর পড়বে কিনা সে সম্পর্কে বিশ্বাস টলে গিয়েছিল? এত গদ্য লিখেছিলেন, ছেড়ে দিলেন তার সব দাবি? তিনি শুধু গানের শষ্ঠা? শুধু একজন গানের শষ্ঠাকে কি একজন বড় সাহিত্যিকের সম্মান দেওয়া যায়?

মৃত্যুর বছরে তাঁর ওই দ্বিষ্ণু-আশঙ্কার কোনও ভিটি ছিল না। বেশি লিখেছেন তিনি ঠিকই, পৃথিবীর আর কোনও সাহিত্যিক তাঁর সমতুল্য পৃষ্ঠা লিখে গেছেন কিনা সে বিষয়ে গবেষণার দরকার, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পঁয়তাল্লিশ বছর পরেও বলা যায়, সাহিত্যের সব কঢ়ি শাখায় বিচরণ করে তিনি একটা উচু মান তৈরি করে দিয়ে গেছেন। বাংলা ভাষাকে তিনি করে দিয়েছেন সর্বত্রগামী। যে কোনও ভাষায় এরকম একজন লেখকের আবির্ভব প্রায় অলৌকিক ঘটনা।

এখন মাঝে মাঝে ভাবি, রবীন্দ্রনাথের কবিতা পুরনো হয়ে গেছে। বড় বেশি কথার বাস্তু, আর পড়বার দরকার নেই। তবু তাঁর দু' চারটি লাইন হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যায়। এখনও পাতা ওলটাতে ওলটাতে তাঁর কোনও কোনও কবিতায় আবিষ্কারের আনন্দ পাই যেন। তখন মনে হয়, তাঁর ‘পনেরো শ’ কবিতার মধ্যে বেছে এখনও একশ কবিতা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, যা আধুনিক পাঠককেও মুক্ত করতে পারে। কিন্তু সে রকম সংকলন কোথায়? তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলি দ্বিতীয়বার পড়ার জন্য মনের মধ্যে কোনও তাগিদ অনুভব করি না। তা হলেও দৈবাং তাঁর কোনও ছোটগল্পের পৃষ্ঠায় ঢোক আটকে গেলে, শুধু ভাষার সহায় মধুর দীপ্তির জন্যই শেষ না করে পারা যায়

না। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রসংগীতও বেশ একথেয়ে লাগে। মনে হয় ওই একই গান আর কতবার শুনব? তবু নিজের অজ্ঞাতসারেই যখন-তখন তাঁর গান দু' এক লাইন গেয়ে উঠি। কোনও প্রিয় গায়ক-গায়িকাকে গাইতে শুল্লে ঠৌট নড়ে। এক-একটা গান আচমকা বুকে ধাক্কা দেয়। গীতবিভানের পৃষ্ঠা উলটে একটা গান খুঁজতে গিয়ে তার পাশের গানটি এবং তারও পাশের গানটি ঢোখ টেনে রাখে।

মানুষ রবীন্দ্রনাথের কথা যখনই ভাবি, তখন রামেন্দ্রসুন্দরেরই মতন, আমারও বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আবার চিঠিপত্রগুলি যখন পড়ি তখন ক্ষোভের সঙ্গে মনে হয়, এমন নিপুণভাবে তিনি আস্থাগোপন করে থাকলেন কী করে? তাঁর এত অসংখ্য চিঠিতে, তাঁর কোনও জীবনীতেই তাঁকে চেনা যায় না। রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি চিনতে আমাদের আরও অনেকদিন লাগবে মনে হয়।

আধুনিকতা ও আইয়ুব

আবু সয়ীদ আইয়ুব মুসলমান নন। যেমন আমি হিন্দু নই। কোনও একটি রচনায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন। ঈশ্বরকে বাদ দিলে আর ধর্মের প্রয়োজন কোথায়? কেননা ধর্মগুলি তো ঈশ্বরের কাছে পৌছাবার পথ বা সোপান। বৌদ্ধধর্মের মতন জটিল নেতৃত্বাচক দর্শনটির প্রসঙ্গ এখানে আনবার দরকার নেই। মোট কথা, যিনি ঈশ্বর মানেন না, বা নিজেক বৌদ্ধ বলে ঘোষণা করেন না, তাঁকে বিশেষ কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত না করাই উচিত। বাল্যকালের সংস্কার ও পারিবারিক আচার-আচরণ থেকে মুক্ত হয়ে উনিশ কুড়ি বছর থেকে আমিও নিরীশ্বর হয়ে উঠি। আমি ঈশ্বর-বিরোধী নই, কিন্তু একথা নিশ্চিতভাবে বুঝে গেছি, আমার কোনও প্রয়োজন নেই ঈশ্বর অনুসন্ধানের। মনুষ্য জাতির কোনও অমানবিক সৃষ্টিকর্তা বা নিয়ন্ত্রা নেই। মৃত্যুতেই এক জীবনের সব কিছুর পরিসমাপ্তি।

প্রাচীন ধর্মগুলির সবকঠিই দীর্ঘকালের দোষগুণে ভরা কিছু সংস্কৃতির জন্ম দিয়ে গেছে। ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হলেও এই অঞ্চলিয় জড়িয়ে থাকা সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া সহজ কথা নয়। অসম্ভবই বলা যায়। কটুর খ্রিস্টান হয়েও মাইকেল যেমন রশ্মি করতে পারেননি খ্রিস্টান। কিন্তু তাঁর মানসে বড় বেশি জড়িয়ে-মড়িয়ে ছিল হিন্দুত্ব। ব্রাহ্মরাও হিন্দুদের চেয়ে সম্ভেদের সম্পূর্ণ একটি আলাদা সম্প্রদায় হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কী ছিলেন, ব্রাহ্ম, না হিন্দু? এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে কয়েক বছর রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ একটু বেশি হিন্দুত্বের দিকে ঝুঁকে পড়লেও আবার সামলে নেন নিজেকে, পৌন্ডলিকতা ও পরজন্ম বিশ্বাস এড়িয়ে যান অত্যন্ত সাবধানে। কিন্তু মুক্ত হতে পারেননি রাধাকৃষ্ণ মিথ থেকে। নাম উল্লেখ না করলেও বনের মধ্যে বংশীধ্বনি বারবার ঘূরে এসেছে তাঁর অসংখ্য গানে।

‘দেশ’ সাম্প্রাহিকে প্রকাশিত আমার একটি কবিতা পাঠ করে আইয়ুব সিমলা থেকে আমাকে একটি ছোট্ট চিঠিতে জানান যে, সেই কবিতাটি পড়ে তাঁর জনেক সূফী কবির একটি রচনার কথা মনে পড়েছে। যেমন আমাদের মনে পড়ে বৈক্ষণ্ব পদাবলী। কিংবা রামায়ণ মহাভারতের কোনও অনুবঙ্গ। ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হয়েও আইয়ুব পূর্ণ আনন্দ পেতে পারেন গালিবের ভক্তিরসাত্ত্বক পদ্যবক্ষে, আমরা অনেকে যেমন পাই রামপ্রসাদী গানে। এবং আমাদের পক্ষে সূফী কবিতা বা গালিবের কাব্য উপভোগ করার মতনই আইয়ুবের পক্ষেও বৈক্ষণ্ব কাব্যের তারিফ করাও সহজ। (কাব্য আস্থাদনের সঙ্গে ধর্ম বিশ্বাসের কি সম্পর্ক আছে কিছু? আমরা অঞ্চল বয়েসে মনে করতাম, ধর্ম-টর্ম আর দুঁচারদিনের মধ্যেই ফুৎকারে উড়ে যাবে। ও নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাবে না। কিন্তু কিছুই বদলায়নি)।

শুধু রবীন্দ্রনাথের কবিতাই নয়, রবীন্দ্র জীবন দর্শনেও আইয়ুব এতখানি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হলেন ঠিক কী কারণে? যখন একালের কাব্য-পাঠকদের মধ্যে ক্রমশই রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে নিষ্পত্তি দেখা দিচ্ছে? এখন কি রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা, এই দুটি পক্ষ তৈরি করে তিনি তাঁর চমকপ্রদ জাদু লেখনী ধারণ করলেন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে।

যারা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করেছে, তারা ঈশ্বরের বদলে কাকে অবলম্বন করে? কেউ কেউ মেতে ওঠে ঈশ্বরদ্বোহিতায়। সেটাই হয়ে ওঠে একটা নেশার বস্ত। এরকম আগে অনেকবার দেখা গেছে। কেউ কেউ পুরোপুরি সরে আসতে পারেন না, অস্থীকার করেন বটে ঈশ্বর নামে বিগ্রহকে, এমনকী সৃষ্টিকর্তাকেও, কিন্তু কোনও একটি শক্তি, চেতনার অতীত কোনও সত্ত্বা, সৌন্দর্য-অনুভূতি দিয়ে দেখা অঙ্গল-অঙ্গলের কোনও নিয়মক যেন তাঁদের জীবনে থেকেই যায়। এই মোহময় সত্ত্বা সম্পর্কে যুক্তিহীন সুস্থানুভূতি ভাষায় অনেক কিছু লেখা হয়েছে উপনিষদে। সেই উপনিষদিক ধারণাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দিয়ে অনেকটা চুইয়ে এসে, অনেকটা সরলীকৃত হয়ে নানা বর্ণবাহারে ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায়।

আইয়ুবও কি সেই মোহেরই বিলাসী? তিনিও পুরোপুরি ছাড়তে পারেননি? এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তিনি এখনও এত আনন্দ পান, অথচ আমাদের একধেয়ে লাগে? বুদ্ধদেব বসুকে আইয়ুব তাঁর প্রশংসন বাংলা গ্রন্থটির (আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ) পাদটীকায় প্রশ্ন করছিলেন: “তিনিকি মানেন যে কবি ও পাঠকের মধ্যে বিশ্বাস বা দৃষ্টিভঙ্গির মৌল বিরোধ কাব্যগ্রন্থস সঙ্গেগের অন্তরায় হতে পারে?”

বুদ্ধদেব বসু এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন কিনা জানি না। প্রশ্নটি নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করেছি। এর উত্তর হিসেবে আমাদের বলতে ইচ্ছে করে, না। মানি না। কবি ও পাঠকদের মধ্যে মৌল দৃষ্টিভঙ্গির তফাত থাকলেও কাব্য রস সঙ্গেগের বাধা হয় না। এর পরেও একটা কিন্তু থেকে যায়। সব ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। কবিতায় কোনও নিয়মই যেন চূড়ান্ত নয়। অনেক সময় দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধ থাকলে সে কাব্য বারবার পাঠ করতে ইচ্ছেও তো করে না। যে সব কবিতায় ‘নাথ’ ‘প্রভু’ সরাসরি সম্মোহন করা হয়েছে, সেগুলি আমার নিজের নিরালা মুহূর্তের কবিতা হয়ে ওঠে না। প্রকৃত কবি বোধহয় কখনও সুস্থির নন, তাঁর বিশ্বাস অচল অটল নয়, তিনি বারবার নিজেই নিজেকে কন্ট্রাডিক্ষ করেন বা করতে পারেনই। এই জন্যই বলা হয় যে কবিতার ইতিহাস তার বক্তব্যের ইতিহাস নয়, ক্লপের ইতিহাস।

আধুনিকতার দুটি লক্ষণ তুলে ধরেছেন আইয়ুব। এক, কাব্য দেহের প্রতি একাগ্র মনোনিবেশ, যার পরিণাম কাব্য রচনায় ও সমালোচনায় দেহাত্মবাদ। দুই, জাগতিক অঙ্গল বিষয়ে চেতনার অত্যাধিক্য। পাছে তাঁকে ভুল বোঝে, তাই আইয়ুব এই সঙ্গেই যোগ করে দিয়েছেন যে, তাঁর “নালিশ সমগ্র আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে নয়, আধুনিক সাহিত্যের পূর্বেলিখিত দুই ধারার বিরুদ্ধেই...যা করেছি, সঞ্চিত বেদনা থেকে করেছি, সজ্জান বা নির্জন অশ্রদ্ধা থেকে নয়।”

এই ব্যাখ্যা সত্ত্বেও আমার দীর্ঘকালব্যাপী এক খটকা রয়ে গেছে। সে ওই ‘সঞ্চিত

বেদনা' সম্পর্কে। কীসের বেদনা? আধুনিক সাহিত্যের উপরোক্ত ওই দুই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে বেদনা দিয়েছে? তাঁকে বহুভাবে অত্মপ্রতি দিয়েছে? তাই তিনি সাম্ভূত পেয়েছেন রবীন্দ্রকাব্যে? বহু কিছু পাঠ করেও তাঁর অত্মপ্রতি মন প্রথম শাস্তি পায় ইংরিজি গীতাঞ্জলিতে। তারপর তিনি নিজে উদ্যোগ করে বাংলা শিখলেন এবং নিমজ্জিত হয়ে গেলেন রবীন্দ্র সমুদ্রে। বাকি জীবনে, বাংলা ভাষায় অস্তত, তিনি আর কিছুই লিখলেন না, রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে ছাড়া। গালিবের কাব্য অনুবাদে কিংবা তাঁর আত্মজীবনীর টুকরোতে ও ভাষারীতিতে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত। তাঁর বাংলা গদ্য ভাষায় উর্দু শব্দের কোনও স্থান নেই (সৈয়দ মুজতবা আলীর সম্পূর্ণ বিপরীত), জীবাঙ্গা, পরমাঙ্গা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত সাবলীল। তবে কি তাঁর মনের ঝোঁকই ছিল এইদিকে? ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হয়েও তিনি মানবজীবনের একটি গভীর অর্থ খুঁজতে চেয়েছেন? আপন আলোকে ধৌত এক 'চিরন্তন পথ' তাঁকেও মুক্ত করে?

তাঁর দেখানোর আধুনিকতার দ্বিতীয় লক্ষণটি আমাকে গোড়া থেকেই অবাক করেছিল। 'জাগতিক অমঙ্গল বিষয়ে চেতনার অত্যাধিকা?' আমরা যাদের আধুনিক লেখক বলি, তাদের রচনায় কোথায় এ লক্ষণ? কখনও একথা খেয়াল হয়নি তো? আমি নিজেকেও যদি একজন আধুনিক লেখক হিসেবে দাবি করি, তা হলে আমি তো জাগতিক অমঙ্গল বিষয়ে কখনও চিন্তা করি না। এই সূত্রটি আইয়ুবকে দিয়েছেন একজন পাশ্চাত্য বিশারদ। সাহিত্য সম্পর্কে স্নেহিত সাধারণ সূত্র খুঁজতে গেলে যে বিপদ হয়, আইয়ুবও সেই বিপদে পড়েছেন। একজন তাঁকে মনগড়া একটা হাওয়ায় ভাসমান অলীক দুর্গ দেখিয়েছে, আইয়ুব সেই দুর্গকে প্রতিপক্ষ ভেবেছেন। এই সূত্র থেকেই তাঁর ধারণা হয়েছে যে, রবীন্দ্র পৱনবর্তী বাংলা কবিতা অনেকটাই বোদলেয়ার প্রভাবিত। এবং বোদলেয়ার অমঙ্গলের প্রধান স্তোত্র রচয়িতা! (আমর মনে হয়, বোদলেয়ারের অমঙ্গল স্তোত্রও আসলে কবিতা রচনার একটা কায়দামাত্র। কবির দৃঢ়বিশ্বাস প্রসূত নয়। 'শক এলিমেন্ট' সাহিত্যের একটি জরুরি অংশ। কয়েক দশক পরে পরেই কোনও লেখক এরকম একটা কিছু সাড়া জাগানো ব্যাপার করেন। এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা। বাংলা সাহিত্য তো দূরের কথা, আধুনিক ফরাসি সাহিত্যেও বোদলেয়ারের প্রভাব নগণ্য। এখানকার কবিদের কাছে বোদলেয়ারের কবিতা কৌতুহল-পাঠ্য মাত্র। বৃক্ষদেৰ বসু, বোদলেয়ারের কবিতাবলীর অনুবাদ করলে আমরা শুধু অনুবাদ সৌকর্যেরই বিচার করেছিলাম।) সুতরাং বোদলেয়ারের নামে রচিত অমঙ্গল চিন্তার অমঙ্গলবোধের পরিপ্রেক্ষিতে আইয়ুব বিচার করেছেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা। সুতরাং, কিছুটা নিম্নস্বরে বলা যায়, আইয়ুব চিনতে ভুল করেছিলেন আধুনিকতার চরিত্র লক্ষণ। কিন্তু ভুলের উপরও তিনি নির্মাণ করতে পেরেছেন অসাধারণ একটি উদ্যান। তাঁর বইটি পড়তে পড়তে আমরা তাঁর সঙ্গে তর্কে নামার জন্য একটুও প্রবৃত্ত হই না, বরং মুক্ত হয়ে দেখি অপরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে রবীন্দ্রচনার মধ্যে তাঁর আঘা-অনুসন্ধান।

আধুনিককালে, ঈশ্বরকে হারিয়ে আমাদের আর কোনও বিকল্প নেই। আমরা প্রত্যেকে একা, সমস্ত দৃঃখ সুখ আমাদের একা একা ভোগ করে যেতে হবে। প্রকৃতি

আমাদের কাছে শুধুই প্রকৃতি, বিশ্বপ্রকৃতি নয়, এবং সমস্ত জনপ্রশ়িত্য এক জীবনে ক্ষয়ে যাবার। আধুনিক মানুষ অভ্যন্তর বেদনার সঙ্গে জ্ঞানে গেছে যে চিরপথ বা চিরশাস্তি বলে কিছু নেই। সেইজন্যই সে মুহূর্তের সুখ বা সাময়িক সুখকেও সুবিশাল করে দেখতে চায়। জ্ঞাগতিক অঙ্গসমূহের কথা সে চিন্তাই করে না, সে জ্ঞানে তার নিজের মধ্যে ডুব দেওয়া ছাড়া আনন্দের আর কোনও খনি নেই।

আইয়ুব একা হতে চাননি। তিনি রবীন্দ্র-রচনার মধ্যে শাস্তি পেয়েছেন। নিচ্যয়ই তাঁর ‘সংক্ষিত বেদনা’ সব কেটে গেছে। তিনি শাস্তি ও আনন্দ পেয়েছেন জ্ঞানে আমন্ত্রণাও সুর্যী।

বিভূতিভূষণ ও বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা

বিভূতিভূষণের আরণ্যক উপন্যাসটি যখন প্রবাসীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন আমার বয়েস তিন-চার বছর। বই পড়ার বদলে বইয়ের পৃষ্ঠা ছেঁড়ার দিকেই ঝোঁক ছিল বেশি। কী জানি, হয়তো ‘প্রবাসী’র পৃষ্ঠাও আমি ছিড়ে কুচি-কুচি করেছি।

এখনকার দিনের বাচ্চারা দু’-আড়াই বছর বয়েস থেকে মাথায় লেখাপড়ার বোঝা চাপাতে বাধ্য হয়। আমাদের সময়ে পাঁচ বছর বয়েসে সরস্বতী দেবীপ্রতিমার সামনে হাতেখড়ি হত। তার আগে পর্যন্ত অক্ষরজ্ঞান নিষিদ্ধ ছিল। তার পর থেকেই অগ্রগতি হত অতি দ্রুত। ‘আট-ন’ বছর বয়েসের মধ্যেই সুকুমার রায় ও হেমেন্দ্রকুমার রায় পড়ে শেষ করে ফেলেছি। সেই বয়েসে লেখকের নাম না জেনে কিংবা খেয়াল না করেই পড়ে যেতাম অনেক বই, সম্ভবত সেই ভাবেই পড়েছি বিভূতিভূষণের ‘চাঁদের পাহাড়’ ও ‘মিসমিদের কব্জি’।

পাঠক হিসেবে আমরা প্রাপ্তবয়েস হই ছিল কবে থেকে? কয়েক দশক আগেও একুশ বছরের কম বয়স্কদের নাবালক বলা হত। এখন ভোটাধিকারের বয়েস আঠারো করা হয়েছে, কিন্তু পিউবার্টি এসে যাব্বা চোদ্দ বছর বয়েসেই, মেয়েদের বোধহয় আর একটু আগে। স্পষ্ট মনে আছে, আমি প্রথম প্রেমপত্রটি লিখেছিলাম চোদ্দ বছর বয়েসে, সুতরাং ‘এই বন্দীই আমার প্রাণের’, এই ধরনের বাক্য বোঝার মতন পরিণত হয়েছে মস্তিষ্ক, সব ধরনের বই পড়বারও অধিকার জন্মে যায়। আমাদের গুরুজনরা অবশ্য তখনও আমাদের নিতান্ত বালক বলেই গণ্য করতেন, এ বই পড়বে না, সে বই পড়বে না, এরকম নির্দেশ জারি করতেন, তখন লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ার জ্ঞে আরও বাঢ়ে। আমার ক্ষেত্রে অবশ্য বিধিনিষেধ তেমন কড়া ছিল না। আমার মায়ের ছিল খুব বই পড়ার নেশা, লাইব্রেরি থেকে প্রায় প্রতিদিন মায়ের জন্য দু’খানা বইয়ের জোগানদার ছিলাম আমি, এবং সেই দুটি বই আমারও পড়া হয়ে যেত।

কৈশোর-যৌবনের সম্মিলনে আমার পাঠাভ্যাস ছিল এলোমেলো। হাতের কাছে যা পেয়েছি তাই-ই পড়েছি। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রহস্যলহরী সিরিজের পাশাপাশি বক্ষিম রচনাবলী, কিংবা ফালুনী মুখোপাধ্যায়ের রগরগে উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে রমেশ দন্তের ঐতিহাসিক উপন্যাস। ক্ষুধার্তের যেমন খাদ্যাখাদ্যের বাছবিচার থাকে না। তারপর যখন লেখকদের চিনতে শিখলাম, তখন লাইব্রেরিতে গিয়ে এক একজন লেখকের নাম ধরে তাঁর সমস্ত লেখা পড়ে ফেলতে শুরু করি।

বিভূতিভূষণের মৃত্যুর বৎসরে আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি। ততদিনে তাঁর প্রকাশিত সবগুলি বই আমার পড়া হয়ে গেছে। তিনি আমার বিশেষ প্রিয় লেখক।

আমি শুধু তাঁর একটি উপন্যাস নিয়ে পাঠক হিসেবে আমার বিবর্তনের কথা বলব।

‘আরণ্যক’ প্রথম পাঠে ছিল অবিমিশ্র মুঝতা। সিকি অংশ পড়ার পরেই সন্দেহ হয়েছিল, এ রকম বই আগে কখনও পড়িনি, বাংলা ভাষায় এ রকম বিষয়বস্তু নিয়ে লেখার কথা আগে কেউ চিন্তাও করেননি। সত্যিই তো, অরণ্যজীবন নিয়ে বাংলায় কে আর তেমন কী লিখেছেন? রামায়ণ ও মহাভারতের অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে অরণ্য, কিন্তু বাংলা সাহিত্য প্রথম থেকেই সমাজভিত্তিক। বক্ষিম বা রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের অরণ্য-অভিজ্ঞতা ছিল না। বাড়ির পাশেই এত বড় সুন্দরবন একেবারে অপরিচিত। ‘কপালকুণ্ডলায়’ অরণ্যের ভূমিকা নামমাত্র, যেটুকু আছে তাও বাস্তবতাবর্জিত।

প্রথম পাঠে আরণ্যকের প্রকৃতি-বন্দনাই দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছিল, প্রতিটি পৃষ্ঠাই ছিল এক অচেনা জগতের উপ্পোচনের মতন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কিছুটা অরণ্য-টান থাকে, বিবর্তন-স্মৃতির সূত্রে, আমরা খুব বেশিদিন অরণ্য ছেড়ে বাইরে আসিনি। নগরবাসী হয়েও যে আমাদের মাঝে মাঝেই জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়ার ঘোঁক, সেটাও হয়তো ওই বিবর্তন-স্মৃতি, ফিরে যাবার ইচ্ছে। কেউ কেউ জোর করে এটা অস্থীকার করতে চায়, যেমন বৌদ্ধলয়ার শহরেও গাছপালা থাকা অপছন্দ করতেন, কিন্তু এই অস্থীকারও স্মৃতিকে প্রমাণ করে।

সেই বয়েসে লবটুলিয়া-বইহারের জ্যোৎস্নাশীথের বর্ণনায় এতই অভিভূত ছিলাম যে বুঝিনি, আরণ্যক উপন্যাসের মূল উপজীব্য শুধু অরণ্য বা আরণ্যক জীবন নয়। ন্যুট হামসুনের ‘প্যান’ কিংবা উইলিয়াম হেনরি হাডসনের ‘গ্রীন ম্যানসানের’ সঙ্গে এ উপন্যাসের অনেক তফাত।

একবার পূর্ণিয়ায় বেড়াতে মিঝোছিলাম সতীনাথ ভাদুড়ীর বাড়ি ও তাঁর নিজের হাতে তৈরি করা বাগান দেখার জন্য। সেই সঙ্গে সাধ হয়েছিল, বিভূতিভূষণের ‘আরণ্যক’ উপন্যাসের পটভূমিতেও থেকে আসব কয়েকটি দিন। কিন্তু খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, ও রকম কোনও অরণ্যের অস্তিত্ব সে অঞ্চলে নেই, যদিও পূর্ণিয়া শহরের নৈকট্যের কথা আরণ্যকে উল্লেখিত হয়েছে বারবার। কিন্তু আরণ্যক তো ভ্রমণকাহিনী বা ডায়েরি নয়, উপন্যাস, একথা লেখক জানিয়ে দিয়েছেন গোড়াভেই। সুতরাং ওই অরণ্য কাল্পনিক হতে বাধা নেই। শুধু তাই নয়, যে নিবিড়, নিষ্ঠক অরণ্যভূমির কথা তিনি লিখেছেন, তার ধ্বংসের কথা, জঙ্গল সাফ করে মানুষের গৃহস্থালি স্থাপনের কথাও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন উপসংহারে। কিন্তু পাঠক হিসেবে তা আমরা মানতে পারি না। বাস্তবের সেই অরণ্য অপসৃত হয়ে গেলেও আমাদের কল্পনায় তা চিরস্থায়ী হয়ে গেছে।

আরণ্যক দ্বিতীয়বার পাঠ করি ছাবিশ সাতাশ বছর বয়েসে। কৈশোরের সেই মুঝতার বদলে খানিকটা সমালোচকের ঢাক নিয়ে। তখন আমরা সাহিত্যের আধুনিকতা নিয়ে মেতে আছি। রবীন্দ্রনাথের প্রবল উপস্থিতিকে ধাক্কা মারছি বারবার, শরৎচন্দ্র অনেকখানি আড়ালে চলে গেছেন, একদিকে তারাশঙ্কর-মানিক-সতীনাথ প্রমুখ, অন্যদিকে কল্লোল যুগের লেখকরা আমাদের মন জুড়ে আছেন। বিভূতিভূমণও

আমাদের প্রিয় লেখক বটে, কিন্তু তিনি ঠিক আধুনিক কিনা, সে বিষয়ে মনস্থির করা যাচ্ছে না। এবার আরণ্যক পড়ার পর দুটি কারণে উকুশিত হয়েছিল। প্রথমত, ভাষা। আধুনিকতার একটা শর্তই হল, পুরনো আঙ্গিক ও ভাষা ব্যবহার একেবারে পরিত্যাগ করা। আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেই সাহিত্যের অগ্রগতি। এমনকী অনেকে এমন কথাও বলতে শুরু করেছিলেন যে, সাহিত্যের মধ্যে কোনও বক্তব্য বা বাণী খোঁজা উচিত নয়। আঙ্গিকই তার বাণী। ফর্ম ইজ দ্য মেসেজ। বুদ্ধদেব বসু তাঁর ‘অ্যান একার অফ গ্রীন গ্রাস’ নামে ইংরিজি প্রবন্ধের বইতে এমন মন্তব্য করেছিলেন যে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় বিষয়বস্তু বা মালমশলা অনেক আছে, কিন্তু কী করে লিখতে হয় তা তিনি জানেন না। আর প্রবোধকুমার সান্যালের আছে উন্নত লেখার স্টাইল, কিন্তু বিষয়বস্তু কিছু নেই। উক্তিটি চমকপ্রদ, কিন্তু বলাই বাহ্যিক, সত্য নয়। সেই বয়েসে আমরা কল্পোলীয় লেখকদের ভাষাবৈচিত্র্যে এতই আকৃষ্ট হয়েছিলাম যে, এই ধরনের মত খানিকটা বিশ্বাসও করেছিলাম।

বিভূতিভূষণের ভাষা বেশ এলানো। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সাধু বাংলা ছেড়ে চলিত ক্রিয়াপদ চালু করে গেছেন, রবীন্দ্র-বিরোধী কল্পোলগোষ্ঠীও বকবাকে চলিত গদ্য লেখেন, কিন্তু বিভূতিভূষণ অনেকদিন ধরে আকড়ে ছিলেন সাধু বাংলা। শনিবারের চিঠির যুগের অনেকেই সাধু বাংলায় লিখতেন, আমরা তাঁদের মনে করতাম প্রাচীনপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল। আরণ্যকের ১৫মং পৃষ্ঠায় এরকম একটি বাক্য আছে—‘কেন জানি না, এই অন্নভোজনলোকে সেরল ব্যক্তিগুলিকে আমার সে-রাত্রে এত ভাল লাগিল !’ এর ঠিক দু’পাতা পচেই আবার আছে, ‘কেন জানি না, ইহাদের হঠাৎ এত ভাল লাগিল !’ এত কাছাকাছি একই রকম বাক্য ব্যবহার করা তো অমার্জনীয় অপরাধ। একজন লেখক কেন এমন অমনোযোগী হবেন ?

আরণ্যক সম্পর্কে দ্বিতীয় আপত্তি, এই দুশো চালিশ পৃষ্ঠার উপন্যাসটিতে যৌনতার নামগন্ধ নেই। শরীর একেবারে অনুপস্থিত। উপন্যাসটি নিছক কল্প-কাহিনী নয়, গাছপালার চেয়ে মানুষের কথাই বেশি, বর্ণনাভঙ্গিও রোমাঞ্চ জাতীয় নয়, বাস্তব ঘৰ্ষণ। স্বয়ং গল্পের লেখক বা উন্নত পুরুষে বর্ণিত নায়ক একটি অবিবাহিত যুবক, সে শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্যে আচ্ছন্ন অথবা সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সম্ভাবনী, তার নিজস্ব কোনও কামনা বাসনা নেই ? জঙ্গলে দিনের পর দিন বাস করেও মানুষ শুধু জঙ্গলের সৌন্দর্য দেখে না, অধিকাংশ সময়েই সে নিজেকে দেখে। নিঃসংত্তা কখনও কখনও উপভোগ্য, কখনও তা গলা টিপে ধরে। জল যেমন জঙ্গলের দিকে যায়, মানুষও তেমনি মানুষকে চায়। আরণ্যকে বিভূতিভূষণ জোর করেই যেন এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করেছেন।

সেক্সুয়াল টেনশন বা যৌন-টান অধিকাংশ উপন্যাসেই অন্তর্লীন থাকে। অনেকে হয়তো এটা মানতে চাইবেন না। আর একটু মনোরম করে বলা যায়, নারী-পুরুষের পরস্পরের সঙ্গ বাসনা কি জীবনের প্রধান অঙ্গ নয় ? আরও মধুর করে বলতে গেলে, ভালোবাসার এত ব্যাকুলতা ছাড়া কি জীবন-যাপন সম্ভব ? প্রকৃতি কি তার বিকল্প হতে পারে ?

সেই তুলনায় ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ কিংবা ‘অচি রাগিণী’ অনেক বেশি জীবনসত্ত্বের কাছাকাছি।

এরপর আরণ্যকে বইখানি পড়িনি বহুদিন। এমন বই বারবার কেই বা পড়ে! বিভূতিভূষণকে ঠিক আধুনিক ধারার লেখক হিসেবে গণ্য না করে বিশেষ এক ধরনের লেখক হিসেবে ধরে রেখেছিলাম। একটা ব্যাপার অনুভব করতাম, অনেক বই ভাল লাগলেও কিছুদিন পর সবটা মনে থাকে না, কিন্তু বিভূতিভূষণের লেখাগুলি মনে গেঁথে যায়। আমি কোনও নির্জন রেল স্টেশনে, কিংবা গ্রামের রাস্তায় কিংবা জঙ্গলের প্রান্তে এক একটা মানুষকে দেখে চমকে উঠেছি। ঠিক যেন বিভূতিভূষণের এক একটি চরিত্র। সারা বাংলায় বিভূতিভূষণের যত চরিত্র আজও ছড়িয়ে আছে, তত বোধহয় আর কোনও লেখকের নেই।

মাত্র বছর পাঁচেক আগে, কিছুদিন জ্বরে ভোগার সময় শয্যাবন্দি হয়ে, হাতের কাছে আর কোনও বই না পেয়ে বিভূতিভূষণের রচনাবলী পড়তে শুরু করি। এর মধ্যে আমার জীবন ও মানসিকতায় বহু পরিবর্তন এসে গেছে। ‘পথের পাঁচালী’র চেয়ে ‘অপরাজিত’ এক সময় আমার উৎকৃষ্টতর মনে হত, এবার পথের পাঁচালীই বেশি ভাল লাগল। ‘দেব্যান’ পড়তে পড়তে অসমাপ্ত রেখে আমি আবার শুরু করলাম ‘আরণ্যক’। কাহিনী অংশ সম্পূর্ণ মনে আছে, তবু প্রতিটি পৃষ্ঠাকে যেন আবিষ্কার করতে লাগলাম নতুন ভাবে।

সবচেয়ে বেশি ভাল লাগল তাঁর ভাষা ও স্টাইল। আগে স্টাইল বা আক্রিক সম্পর্কে কী ভুল ধারণাই না ছিল। ভাষার বেশি বেশি চাকচিক্য, শব্দ নিয়ে মন্মযুদ্ধ, পাঁচালো বাক্যগঠন আসলে নিকৃষ্ট স্টাইল, রচনায় এনে দেয় আড়ষ্টতা ও কৃত্রিমতা। যাঁরা বড় শিল্পী তাঁরা ভাষাশৈলীকে পেছনে যে প্রচেষ্টা তা স্যাত্তে মুছে দেন। সহজ সরল ভাষা রচনাই সবচেয়ে কঠিন। ‘এখানে বনের ধারে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি’, জীবনানন্দ দাশের এই ধরনের লাইন মনে হয় যেন অতি সাধারণ, কিন্তু কতখানি যদ্দে, কত চিন্তা করে যে তিনি এই রকম পঙ্ক্তি রচনা করেন, তা বোঝা যায় তাঁর পাশুলিপি দেখে। তাঁর সমসাময়িক কিছু কবি কত চতুর, কত উজ্জ্বল বাক্যবন্ধ রচনা করেছেন, সেগুলি আর মনে দাগ কাটে না, অথচ জীবনানন্দের কবিতা অমলিন রয়ে গেছে। সতীনাথ ভাদুড়ীর বৈদক্ষের কথা আমরা জানি, কিন্তু ‘টেড়াই চরিত মানস’ রচনার সময় ভাষাকে তিনি কত সাধারণ স্তরে নামিয়ে এনেছেন, কোথাও লেখকের কেরামতি দেখে হোচ্চট খেতে হয় না, সেই জন্যই ওই বই বারবার পড়া যায়। বিভূতিভূষণের আরণ্যকের ভাষার সারল্যও ইচ্ছাকৃত, পথের পাঁচালীর চেয়েও এই ভাষা বেশি সরল এবং তাঁর বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ উপযোগী।

আরণ্যকে শরীরের জ্বালার কথাও একেবারে অনুপস্থিত নয়। এই উপন্যাসে সবরকম উদ্দেশ্যক ঘটনাই স্যাত্তে পরিহার করা হয়েছে। অরণ্যটি শ্বাপদসংকুল, হিংস্র জানোয়ারদের উপস্থিতির কথা আমরা জানি, তবু কোথাও তাদের বর্ণনা নেই। কোথাও শিকার করার বর্ণনা দেননি লেখক, অথচ বোঝা যায় অনেকবারই জন্ম-জানোয়ার শিকার করা হয়েছে, তখন গাছ কাটা বা প্রাণিহত্যা কোনওটাই নিষিদ্ধ ছিল

না, কিন্তু লেখক যে একবার একটি নীলগাইকে মারতে গিয়েও মারেননি, শুধু সেই কথাটাই জানিয়েছেন। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষেরা এসে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করেছে, প্রথম প্রথম নিজেদের মধ্যে রেষারেষি, মারামারি হওয়া স্বাভাবিক, তার কোনও উল্লেখ নেই। একবার আছে শুধু জমির লড়াইয়ের কথা। তিনি শুধু মানুষের বেঁচে থাকার জেদের দিকটার কথাই লিখতে চেয়েছেন। এই উপন্যাসে সব কিছুই চাপা সুরে, সেই কারণে নারী-পুরুষের পারস্পরিক টানের কথাও প্রচ্ছন্ন রেখেছেন যথাসম্ভব।

বিভূতিভূষণ যে প্রেমের তীব্রতা বা যৌন আকর্ষণ সম্পর্কে একেবারে অস্ত ছিলেন কিংবা শুধু মানুষের ভালমানুষীর কথাই লিখে গেছেন, তাও ঠিক নয়। তাঁর ‘অঁই জলে’ নামে উপন্যাসটি বহুপঠিত নয়, সেই উপন্যাসে তিনি যেন হঠাৎ কল্পোলগোষ্ঠীর লেখকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিলেন, এবং শহরে প্রেম দেখাতে গিয়ে আমদানি করেছিলেন অনেকখানি আদিরস। কিন্তু সব লেখকের কলম সব দিকে খোলে না। ও পথ বিভূতিভূষণের নয়। আরণ্যকে অবিবাহিত যুবকটির নারীসঙ্গ বাসনা বা ঝুপানুরাগ সম্পূর্ণ উহ্য নয়, অসাধারণ মুনশিয়ানায় দু’ একটা আঁচড়ে মাত্র তা ফুটিয়েছেন। এই কাহিনীতে প্রধান স্ত্রী চরিত্র তিনটি, মঞ্চী, কৃত্তা ও ভানুমতী, যেন নারীর তিনটি রূপ। বৃক্ষ নকচেদীর দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী বধূর সঙ্গে লেখকের বেশ একটা বঙ্গুত্ব গড়ে উঠেছিল, চরমাদারিপ্রের মধ্যেও এ মেয়েটি ছিল খানিকটা রহস্যময়ী। এই মঞ্চীর প্রতি লেখকের টান ঝুটে ওঠে একটিমাত্র বাক্যে। স্বামীর বৃক্ষির দোষে মঞ্চীর একমাত্র পক্ষটি মারা যায়, কিছুদিন পর অভিমান করে মঞ্চী বৃক্ষ স্বামীকে ছেড়ে চলে যায় অস্য কাঙ্গল সঙ্গে। নকচেদী যখন এই কাহিনী লেখকের পা জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বোঝালে, তখন বিভূতিভূষণ লিখেছেন, “বিস্মিত ও স্তজ্ঞিত হইলাম। কিন্তু দেখিলাম, বৃক্ষ নকচেদী ভক্তের প্রতি আমার কোনো সহানুভূতি নাই, যা কিছু ভাবনা সবই বন্য মেয়েটির জন্য।” আদিবাসী রাজবংশের কল্যাণ ভানুমতীর সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক বঙ্গুত্বের চেয়ে একটু বেশি, তিনি তাকে আয়না কিনে উপহার দিয়েছেন, দু’জনে নির্জন পাহাড়ের পাথরখণ্ডের ওপর বসে গাঢ় করে, অঙ্গস্পর্শ পর্যন্ত এগোননি বিভূতভূষণ। এই মেয়েটির কথা লেখার সময় তাঁর মনের মধ্যে দ্বিধা ছিল, একবার তাকে প্রায় যুবতী বলেও পরে আবার তাকে কিশোরীতে পরিণত করেছেন, এবং শেষের দিকে প্রকাশ করেই ফেলেছেন, ‘এখানেই যদি থাকিতে পারিতাম। ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম।’

এক সময়ে বাংলা সাহিত্যে বড় সাদা-কালোর উপন্যাস হয়েছিল। কিছু কিছু চরিত্র একেবারে সাদা, তারা সৎ, সরল, অত্যাচারিত, নিপীড়িত, আর কিছু কিছু চরিত্র কুচকুচে কালো, যারা জমিদার, মহাজন, কারখানার মালিক বা জোতদার। সব কাহিনীতেই এই দুই শ্রেণীর লড়াই, অবাস্তব, রক্তমাংসহীন, কার্ডবোর্ডের মানুষ। শিল্পীর চোখ সব মানুষের মধ্যেই মানুষকে খোঁজে। ধাওতাল সাত কিংবা যুগলপ্রসাদের মতন চরিত্র বাংলা সাহিত্যে আগে দেখা যায়নি। ধাওতাল সাত একজন বিস্তবান মহাজন, বেশিরভাগ আধুনিক উপন্যাসেই সে অত্যাচারী, ব্যভিচারী রূপে

দেখা দিত, কিন্তু এমন মানুষও থাকে, যে ঝণ দিয়ে তাগাদা দেয় না, বিনা দ্বিধায় দলিল ছিড়ে ফেলে, এমনই লাজুক ও ভদ্র সে যে, ঝণগ্রহণকারীর বাড়ির ধারকাছ দিয়েও হাঁটে না। আর যুগলপ্রসাদ নিঃস্বার্থভাবে জঙ্গলে নানান ফুলগাছ লাগিয়ে যায়, তার নিজস্ব উদ্যান নেই, পৃথিবীটাকেই সুন্দর করে দিতে চায় সে। সামান্য ঘাসের বীজ সেদ্ধ করে খেয়ে যারা বেঁচে থাকে, তারাও হাসে, তাদের জীবন ধেকেও সৌন্দর্যবোধ একেবারে অস্তর্ভিত হয়নি, এই দৃষ্টিভঙ্গিটাই আমাদের আশ্চৰ্য করে। আসলে যা চিরকালীন, সেটাই প্রকৃত আধুনিক।

সুধীন্দ্রনাথের ‘দুঃসময়’

সুধীন্দ্রনাথ দশের মুখে কবিতা পাঠ শোনার সৌভাগ্য আমার একবার মাত্র হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর বছরখানেক আগে গীতা ভবনে একটি ছোট ফরাস-পাতা অনুষ্ঠানে সমবেত কবি ও পাঠকদের মাঝখানে তিনি বৈদূর্যমণির মতন বসে ছিলেন। তাঁর ভাব-ব্যবহারে সব সময় এক ধরনের চাপা অংকার প্রকাশ পেত, কিন্তু যে কারণেই হোক, সেদিন তিনি খুব উৎফুল্ল ও সহজ ছিলেন, কবিতা সম্পর্কে না-বাঁধা-ধরা কথা বলছিলেন এবং অনেকগুলি কবিতা পড়লেন, তার মধ্যে কয়েকটি রবীন্দ্রনাথের ও কয়েকটি নিজের। আমরা একেবারে পেছনের সারিতে বসে নিবিড় আগ্রহের সঙ্গে তাঁকে লক্ষ করছিলুম।

আমি এখনও তাঁর সেই কষ্টস্বর শুনতে পাচ্ছি, সেই দৃশ্য মনে করা মাত্র। সেদিনও আমার মনে হয়েছিল, এখনও মনে হয়, তিনি কবিতা একটু সুর করে পড়তে ভালবাসতেন। প্রত্যেক লাইনের শেষে একটা ট্রান্স-যোঁক (তাঁর কষ্টস্বর ছিল অতিশয় সুলিলিত পৌরুষময়) — প্রতিটি লাইনকে আজ্ঞাদা ভাবে ঝংকারয় করে তুলেছিল। পরবর্তীকালে তাঁর কবিতা পড়তে গেলেই আমার মনে পড়েছে তাঁর সেই ঝংকার প্রবণতা। সুধীন্দ্রনাথের বহু কবিতা বারবার পড়ার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, সংগীতের ধর্ম, ঝংকার, বাক্যের শব্দগুণের সার্থক ব্যবহারের প্রতিই তাঁর যোঁক ছিল বেশি। সব মিলিয়ে তাঁর কবিতা আসলে হালকা ধরনের।

প্রাবন্ধিক সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যিই কবি সুধীন্দ্রনাথের ওপর গাঢ় ছায়া ফেলেছে। তাঁর প্রবন্ধাবলী কিছুটা খটমটে ও দুর্পাঠ্য—এরকম ধারণা প্রচলিত আছে, সেই সঙ্গে তাঁর কবিতাও কঠিন। কবিতায় দুরহ বা অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দের প্রয়োগের ওপর কবিতার কাঠিন্য-সরলতা নির্ভর করে না। মাইকেল মধুসূদন খুব বোম্বাস্টিক শব্দ ব্যবহার করতেন বটে, কিন্তু তাঁর কবিতাকে কেউ কঠিন বলবে না, মাইকেলের কবিতা জলবৎ সরল। কবি সুধীন্দ্রনাথও সরল ধরনের কবি, হালকা মেজাজে গানের মতন কবিতা লিখতেন, কিছু শব্দ ও বাক্যবন্ধ জটিল এই যা। কিন্তু তাঁর কবিতায় কোথাও দুর্বোধ্যতা নেই, প্রায় সব কবিতাতেই একটি নির্দিষ্ট আরম্ভ, মাঝখানে উত্থান ও শেষে পরিণতি বা সমাধানের কথা আছে, সুতরাং রহস্যেরও অবকাশ কম। এই কারণে, সুধীন্দ্রনাথের কবিতা আমি বারবার পড়তে ভালবাসি, কিন্তু তিনি আমার প্রিয় কবি নন।

যেন মনে হয়, হাইনের হালকা মেজাজের বিন্দুপ গাথা ও প্রেমের গানগুলির সঙ্গেই তাঁর কবিতার মিল বেশি। ব্যক্তিগতভাবেও তিনি হাইনের খুব অনুরাগী ছিলেন শুনেছি, তা ছাড়া আর একটা বাইরের মিল আছে। সুধীন্দ্রনাথের জন্ম ১৯০১ সালে,

তাঁর কবিতায় আছে, ‘আমি এই শতাব্দীর সমান বয়সী’। হাইনেও নিজের জন্মস্থান থেকে বছর তিনেক চুরি করে, নিজেকে উনবিংশ শতাব্দীর সমান বয়েসি বলতে ভালবাসতেন। অবশ্য শতাব্দী চেতনা হাইনের কবিতায় খুব কমই উপস্থিত, সুধীন্দ্রনাথ নিজের কবিতায় শতাব্দী চেতনা সম্পর্কে খুব জাগরুক ছিলেন, এবং তা সীমিতভাবে সার্থক ও উপস্থিত। যাই হোক, সংগৃত ও ঝংকার গুণ এবং এগুলির অহেতুক আকর্ষণ তাঁর কবিতায় কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, একটি কবিতা আলোচনা করে দেখা যাক। কবিতাটির নাম ‘দুঃসময়’।

কবিতাটি পড়ার সময় একটি মাত্র শব্দের মানে জানবার জন্য আমাকে অভিধান দেখতে হয়েছে। ‘প্রেতাকুল ব্যবধানে সঞ্জীবনী বাহুর নিবীত’—এই লাইনের নিবীত শব্দের অর্থ আমার জানা ছিল না। শব্দটি অপ্রচলিত, এর মানে হতে পারে যজ্ঞসূত্র অথবা চতুর্বেদীଆক্ষণ্যরা মোটা পৈতে যখন মালার মতো করে গলায় পরে সেই পৈতে অথবা সাধারণভাবে উন্তরীয় বা চাদরও হতে পারে। অর্থাৎ কঠলঘ মেয়েলি হাতের সঙ্গে যজ্ঞসূত্র, পৈতে বা উন্তরীয়ের তুলনা। এমন কিছু অবশ্যস্তাবী ব্যবহার নয়, বুঝতেই পারছি—শব্দটা এসেছে মিলের খাতিরে, এ কবিতায় মিলের বড় কড়াকড়ি, প্রতিটি লাইনের মিল সুচিপ্রিয়, একটি কথার সঙ্গে আট লাইন পরেও মিল দেওয়া আছে, আবার কোথাও পরপর তিন লাইনে সমজাতীয় মিল। নিবীত শব্দটির আগে দু’ লাইনের শেষে আছে ‘ভিত’ আর ‘অতীত’। কানিংহামের একটি শব্দ আমার অপছন্দ হয়েছে, ‘আস্ফালিবে স্তু দুঃস্বপন’—এর আস্ফালিবে শব্দটা শুনতে ভাল না। আরেক জ্ঞানগায় শব্দের ব্যবহার আমার কাছে মনে হয়েছে অনুচিত। ‘উচ্চারিত হৃদয়সিদ্ধু সৃজনের প্রথম প্রভাতে/অভ্যর্জিত সুধাভাণ্ড অপিলাম মোহিনীর হাতে’;— এখানে, নিজের হৃদয় মন্তন করে অমৃত বার করে আনার উল্লেখ একটু বেশি সেন্টিমেন্টাল, তা ছাড়া অমৃতের পাত্র নারীর হাত থেকে গ্রহণ করার দৃশ্যই সুসহ ও আবেগসিদ্ধ, তা ছাড়া ‘সুধাভাণ্ড’ শব্দটি মন্তনের প্রসঙ্গে একেবারে রবীন্দ্রনাথের ছাপ মারা। মন্তনের কথা বলতে গিয়ে ‘সুধাভাণ্ড’ কথাটি প্রয়োগ করলেই রবীন্দ্রনাথের মনুহাস্য অন্তরীক্ষে দেখা যায়। এইরকমই আর একটি শব্দ ‘অমরা’—এর এক লাইন পরেই আছে।

কবিতাটি পড়লেই বোঝা যাবে, কবিতাটিতে মিলের বড় বেশি বাড়াড়ি হয়েছে। অনেকটা যেন অঙ্কক্ষা মিল। সুধীন্দ্রনাথ দস্ত কবিতার চেহারার দৃঢ়তায় খুব বিশ্বাস করতেন। আলগা-ছড়ানো লাইন সম্পর্কে তাঁর খুব আপন্তি ছিল, মালার্মে ও ভালেরি গোত্র সুধীন্দ্রনাথ পরিশ্রমী, নির্খুত ওজনের শব্দসম্পর্ক কবিতা না হলে খুবই অপছন্দ করতেন। এই টিলেমির জন্যই বোধহয় জীবনানন্দ দাশের কবিতা তাঁকে কখনও তেমন আকর্ষণ করেনি। বুদ্ধদেব বসুর মুখে শুনেছি, জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতায় যে এক পাতা পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি ছাপা আছে, তাই দেখে সুধীন্দ্রনাথ বিস্ময়প্রকাশ করে বলেছিলেন, এত কাটাকুটি করেও একজন লোক কী করে এত খারাপ লিখতে পারে? আমি একটি ঘটনা জানি, সিগনেট প্রেস থেকে যখন তাঁর ‘স্বগত’ ছাপা হচ্ছিল, তখন দৈবাং একদিন সেই বইয়ের প্রুফ সংক্রান্ত আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলাম।

শুনলাম, সুধীন্দ্রনাথ একটি শব্দ বারবার প্রুফে কাটছেন, প্রেস বারবার ভুল করছে। তিনি লিখেছিলেন, ‘কমঠ বৃত্তি’, প্রেস থেকে বারবার ভুল করছে সেটাকে ‘কর্মঠ বৃত্তি’ বলে। বলাই বাহ্য্য, ‘কর্মঠ’ শব্দটির মানে আমি জানতুম না এবং সেখানে মুখ খুলে অঙ্গতা প্রকাশ করিনি। বাড়িতে এসে চুপি চুপি অভিধান দেখলাম, খুবই সাধারণ কথা। কর্মঠ মানে কচ্ছপ, অর্থাৎ কথাটা কূর্মবৃত্তি নামেই প্রচলিত। এই ধরনের অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করে তিনি তাঁর রচনায় একটি বিশেষ স্বাদ ও আবহাওয়া সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কবিতা ভাল করে বিচার করে বিচার করে দেখলে বোঝা যায়, কবি হিসেবে তিনিও আসলে ঢিলেচালা প্রকৃতির, তাঁর শব্দাবস্থী মোটেই উজন করা ও অমোগ নয় এবং সবচেয়ে বড় কথা, প্রচলিত, গতানুগতিক ছবি ব্যবহার করার দিকে তাঁর বোঁক ছিল খুব বেশি, অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হবার পর্যায়ে। বস্তুত, বহু ব্যবহৃত ছবি তিনি প্রয়োগ করেছেন বড়ই বেশি, এতে তাঁর কবিতা বেশ দুর্বল হয়ে গেছে। এই দুঃসময় কবিতাতেই সে-রকম ক্রটি অনেকগুলো। যেমন অঙ্ককার বললেই এলো চুল ছড়ানোর বর্ণনা (তমো তবু কবরী এলায়), আকাশ বললেই আয়নার উল্লেখ (তারই প্রতিবিম্ব হেরি মুহূর্মূহ আকাশ মুকুরে), মৃত্যুর মাধুরী কিংবা মৃত্যুর জাল ছড়ানো—সচেতন কবির এ সব প্রয়োগ কাম্য নয়। তারপর, মিলের কাঙ্কার্য দেখাবার জন্য তিনি অনেকবার বিপথে গিয়েছেন। আট লাইন পরে গিয়েও আবার ঘূরিয়ে মিল দেবার কী প্রয়োজন? আমার বক্সিগত ধারণা, মিলের লোভেই বাংলা কবিতার বড় বেশি ক্ষতি হয়েছে। মিলের খাতিরেই তিনি ‘স্বপ্ন’ এই কথাটির বদলে—‘স্বপ্ন’ এই কোমরভাঙ্গ শব্দটি বারবার ব্যবহার করেছেন। অনেক অবস্থার কথাও এসেছে, যেমন কুরিভাটির শেষ লাইনে ‘নব নীহারিকা’ কিছুটা অযৌক্তিক। এরকমই অযৌক্তিক, ‘অনুচিত অঞ্চনার লাজ’, ‘আশ্ফালিবে শুক্র দুঃস্বপ্ন’। ‘লাজ’ কথাটা এসেছে, ছ’ লাইন আগের ‘সমাজে’র সঙ্গে মিল দেবার জন্য। লাজ-এর মানে এখানে লজ্জা কিংবা খই—যেটাই হোক না, কিন্তু তাঁর সঙ্গে পরবর্তী ‘আশ্ফালিবে শুক্র দুঃস্বপ্ন’ কী অর্থ বহন করে?

‘দুঃসময়’ সুধীন্দ্রনাথের অন্যতম বিখ্যাত কবিতা, এর প্রথম লাইন ‘মোদের সাক্ষাৎ হল অশ্বের রাক্ষসী বেলায়’ অনেকের কষ্টস্থ। এটি একটি প্রেমের কবিতা—কেননা, আবু সমীদ আইয়ুব সম্পাদিত ‘পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা’য় হানলাভ করেছে। (আমার অবশ্য ধারণা, পৃথিবীর সব কবিতাই প্রেমের কবিতা)—যাই হোক, এ কবিতার মধ্যে কোনও বড় কথা নেই, সাধারণভাবে সুন্দর কবিতা। কিন্তু গঠনের এই সব ক্রটিই কবিতাটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তা ছাড়া, যুক্তিবাদ এসে, পরপর সিড়ি দিয়ে ওঠার মতন বিন্যাসও কিছুটা সৌন্দর্যহানিকর। গঞ্জেরই মতন কবিতাটির প্রস্তাবনা ও সুরু সমাপ্তি আছে। শেষের কয়েক লাইনে যেন খানিকটা আশাবাদ, যা কবিতাটিকে আর একটু লম্ব করে দেয়। অর্থাৎ, কবির সঙ্গে তাঁর নারীর দেখা হল অবেলায়, দুঃসময়ে, এখন দুর্মর অতীত সমস্ত বিশ্বাসের ভিত নষ্ট করে দিয়ে গেছে, এখন মিলন অসম্ভব। অসাধ্য সিদ্ধির যুগ আর ফিরবে না, কবির ঢোকে অঙ্ককার, তবু সেই নারী যেন সাহসিকা হয়ে নরের হাত ধরে, তা হলে হয়তো লজ্জিত নিয়তি

সামনের গতি ফেরাতেও পারে, মৃত্যুর জাল থেকে কবি হয়তো তা হলে অব্যাহতি পেতেও পারেন। এই বোধ শাশ্বত, যে-কোনও প্রেমের কবিতার উপজীব্য, কিন্তু সুধীল্লোঢ়ি কবিতাটিকে বেশি আড়ম্বরপূর্ণ করে ফেলেছেন। এ-কথা বলার জন্য দু'বার বিধাতাকে ডেকে আনা—কোনও অতিব্যস্ত মানুষকে অকারণে বিরক্ত করার মতনই অ-রুচিসম্ভব। কবিতাটিতে চাপা বিষাদ ও তীব্র আর্তি ফোটাবার চেষ্টার বদলে শব্দের ঝংকার ও ছন্দের সৌকুমার্য ফোটাবার দিকেই তাঁর বেশি মনোযোগ, যুক্তাঙ্কর-বহুল শব্দগুলি গৃঢ় ব্যঙ্গনাময় নয়, কিন্তু উচ্চারণে শ্রবণের আনন্দদায়ক। ‘আধো-জাগা অগ্নিগিরি আমাদের উদ্ধত হেলায়/সান্দুবরে কী অনিষ্ট হাঁকে’—এখানে শব্দের গান্ধীর্ঘ ও ধ্বনিমাধুর্য সত্যিই অননুকরণীয়। সেইরকমই, ‘বজ্রধ্বজ প্রভুজন রথ রাখি অলঙ্ক্ষে; অদূরে/ফুৎকারিছে দিঘিজয়ী শাঁখে’—এইরকম ব্যবহারও শ্রবণাভিরাম। কিন্তু এখানে আসল কথাটা কি, বড় তার শাঁখ বাজালে, এই তো? এ ছবি পুরনো শুধু নয়, বাগবহুল, কেননা, ‘সশব্দ বড় উঠেছে’ এই কথাটাই যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে অমোঘভাবে প্রকাশ করাই এখনকার কবিতার লক্ষণ, অতিরিক্ত অলংকারপ্রিয়তা কবির দুর্বলতা।

সুধীল্লোঢ়ির কবিতার দুর্বলতা দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার বিচার তো পদে পদে ভুল হতেই পারে। আমার উদ্দেশ্য এই প্রশ়িটি উত্থাপন করা, তাঁর কবিতায় যে ঝংকারের ছাঁটা ও ছন্দ লালিত্য—তা কি সজ্ঞাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ছিল? অপ্রচলিত সাধু শব্দের অধিক ব্যবহার করে তিনি তো সমস্তের উলটো দিকেই যেতে চেয়েছিলেন, যখন সব কবিতারই এখন ভাষা প্রায় সুন্দরের ভাষা। কিন্তু উলটোদিকে গিয়েও যদি কেউ অন্য ধরনের সার্থকতা অর্জন করেন সে-কথা আলাদা, কিন্তু তিনি কি সেইরকম সার্থক হয়েছেন?

একবার সুধীল্লোঢ়ির সাহেবপাড়ার বাসস্থানের সান্ধ্য আড়তায়—শেষ জীবনে তিনি মাঝে মাঝে তরুণ কবিদের ডাকতেন, আমি সবিনয়ে মৃদুবৰে তাঁকে এই রকম অপ্রচলিত, আভিধানিক শব্দ-প্রয়োগের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, ইয়াংম্যান, আই হ্যাড টু বি ডিফারেন্ট!

অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছিলেন, রাবীন্দ্রিক প্রভাব, রবীন্দ্রনাথের ভাষা ব্যবহার থেকে আলাদা হবার জন্যই তিনি বেছে নিয়েছিলেন এই ভাষা রীতি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে এড়াবার জন্য তিনি পিছু হঠে মাইকেলের রাস্তায় গেলেন কেন, তা আমার বোধগম্য হয়নি। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, হালকা মেজাজের, মানবীপ্রেমমূলক গান ধরনের রচনাই ছিল তাঁর মেজাজযোগ্য, কিন্তু শব্দঝংকারের প্রতি বেশি ঝোঁক তাঁকে অসমীচীন ছবি প্রয়োগে বাধ্য করেছে, তাতে তাঁর কবিতাক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁর যেগুলো উৎকৃষ্ট রচনা হিসেবে গণ্য, যে সব লাইন সবারই মনে আছে সেগুলো কিন্তু খুব সরল। যেমন চোখ বুজলে এক্ষুনি মনে পড়ে—

একদা এমনই বাদল শেষের রাতে—

মনে হয় যেন শত জনমের আগে—

সে এসে সহসা হাত রেখেছিল হাতে

চেয়েছিল সুখে সহজিয়া অনুরাগো।
একটি কথার দ্বিধা থরোথরো চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী।—ইত্যাদি

কিংবা,

ফলত নিশ্চিন্ত কষ্টে তাকে বলেছিলুম সেদিন
অধ্বানের অত্যাচারে পাকা পাতা ঝরে তো ঝরম্ব;

কিংবা,

একবার ভূমি তাকালে না তার পানে,
গঞ্জে পরাগে নিলে না নিজেরে ভরি,
কর্ণিকসার তাই সে দিনাবসানে
ত্রিসীমানায় আর আসিবে না মধুকরী।—ইত্যাদি

এসব লাইনগুলো পড়লে মনে হয় না, প্রায় বাউল গানের মতন সহজ? কবিতায় জটিলতা কিংবা জীবনানন্দের মতন রহস্য সন্ধান সুধীল্পনাথের একেবারেই স্বভাবধর্ম ছিল না। মনে হয়, তাঁর অহংকারী অবয়বের মধ্যে একটা সাদামাঠা বাউল মন লুকিয়ে ছিল, শেষ পর্যন্ত সেটা পূর্ণভাবে বেরিয়ে আসবার সুযোগ পায়নি।

প্রেমেন্দু

প্রেমেন্দু মিত্রকে আমি প্রথম সশরীরে দেখি শ্রীরামপুরের এক কবিতা পাঠের আসরে। ঘটনাটি কিছুটা নাটকীয়, তাই মনে আছে। সম্ভবত পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকের কথা, শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটি থেকে একটা বেশ বড় আকারের কবি সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, প্রবীণ ও নবীন মিলিয়ে প্রায় তিরিশ-পঁয়তিরিশজন কবির মধ্যে কোনওক্রমে আমিও একটা আমন্ত্রণপত্র পেয়েছিলাম। সভাপতি প্রেমেন্দু মিত্র। কিন্তু সভা শুরু হবার নির্ধারিত সময় পেরিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যেও তিনি এলেন না। ধরে নেওয়া হল, তিনি আর আসবেন না। সাহিত্যিক হিসেবে তিনি খ্যাতির তুঙ্গে তো বটেই, তা ছাড়াও তিনি তখন খুব ব্যস্ত মানুষ। তিনি স্বয়ং চলচ্চিত্র পরিচালনা করছেন, অনেক বাংলা ছবির চিনাট্য ও সংলাপ লেখেন, এ ছাড়াও তিনি আকাশবাণীর শলাহকার। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হৃষ্মায়ুন কবির সাহেব তাঁর মতো কয়েকজনের জন্যই এই পদ সৃষ্টি করেছেন, এরকম শোনা গিয়েছিল।

যথারীতি সভাপতিকে বাদ দিয়েই সভা শুরু হয়ে গেল, ঘণ্টা দেড়েক বাদে যখন আমার ডাক পড়েছে, মধ্যে এসে আমি দুক্তির লাইন পড়েছি মাত্র, এমন সময় শোনা গেল গেটের কাছে একটা হাঁচট। উদ্যোগাদের অনেকে ছুটে বাইরে চলে গেল। প্রেমেন্দু মিত্র এসে গেছেন। কোনও বিশেষ কাজে তিনি আটকা পড়েছিলেন, তারপর কাছাকাছি সময়ের কোনও ট্রেন নেই বলে তিনি কলকাতা থেকে একটা ট্যাঙ্কি ভাড়া করে চলে এসেছেন। কলকাতা থেকে শ্রীরামপুর পর্যন্ত ট্যাঙ্কি? তখনকার দিনে প্রায় অবিশ্বাস্য ছিল। তাও একটা কবি সম্মেলনে উপস্থিত হবার জন্য, যেখানে একটা পয়সাও পাওয়া যায় না!

বাইরে প্রেমেন্দু মিত্র এসে গেছেন, এই সময়ে সুনীল গাঙ্গুলীর মতন একজন এলেবেলে ছোকরার কবিতা কে শুনবে? শ্রোতারা অনেকেই বাইরে উকিলুকি মারছে, আমি মাইকের সামনে বোকার মতন দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে। একটু পরে সপারিষদ রাজার মতন মধ্যে প্রবেশ করলেন প্রেমেন্দু মিত্র, ধপধপে সাদা ধূতি ও পাঞ্জাবি পরা, গৌরবণ্ণ নাতিদীর্ঘ শরীর, মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল, বুক্কিদীপ্ত মুখ। সভাপতির শূন্য আসনে তিনি বসবার পর আবার সভার কাজ শুরু হল। আমাকে বলা হল গোড়া থেকে পড়তে। কিন্তু ততক্ষণে আমার মেজাজ বিগড়ে গেছে। প্রত্যেকের দুটি করে কবিতা পাঠ করার কথা, আমি একটি কবিতাই কোনওক্রমে শেষ করে প্রস্থানেদ্যত হতেই প্রেমেন্দু মিত্র আমাকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলেন। তাঁর পাশের খালি চেয়ারটায় আমাকে প্রায় জোর করেই বসিয়ে বললেন, তোমার কবিতা শুনলুম কিন্তু তোমার নামটা তো জানা হল না।

আমার নাম শুনে তাঁর মনে একটুও দাগ কাটার কথা নয়। আমার একটাও বই বেরোয়নি, পত্রপত্রিকায় দু'চারটি কবিতা ছাপা হয়েছে মাত্র এবং ‘কৃতিবাস’ পত্রিকা সম্পাদনা করছি। প্রেমেন্দ্র মিত্র ‘কৃতিবাস’ পত্রিকার দু’একটা সংখ্যা দেখেছেন বললেন এবং আমি কী করি, কোথায় থাকি, এইসব জানতে চাইলেন। আমি তখন ছাত্রজীবন শেষ করে কাঠ বেকার, পরিচয় দেবার মতনও কিছু নেই। তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় আমি একটু একটু কাঁপছিলাম, তাঁর কাছে আমি অঙ্গাতকুলশীল, কিন্তু তিনি যে আমার বিষয় চেনা। আমি প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রত্যেকটি বই-ই পড়েছি, হাঁ, জোর দিয়েই বলা যায় প্রত্যেকটি বই, আমি অল্প বয়েস থেকেই বইয়ের পোকা, তা ছাড়া, সেই সময়ে লাইব্রেরিতে এক একজন লেখকের নাম ধরে ধরে তাঁদের সব বই পড়ে শেষ করছি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের যে সব ছেট উপন্যাসের আর পুনর্মুদ্রণ হয়নি, তাও আমার পড়া। এ সব ছাড়াও তিনি আমার কাছে একটি জীবন্ত চরিত্র, অচিন্ত্যকুমারের ‘কল্পোল যুগ’ নামের উপন্যাসোপম স্মৃতিকাহিনীতে প্রেমেন্দ্র মিত্রই তো প্রায় নায়ক।

এ সব কথা অবশ্য আমি তাঁকে কিছুই বলিনি। বড় লেখকদের সামনে এলেই দারুণ লাজুকতা পেয়ে বসত আমায়।

এর দু’তিন দিন পরেই একটা খাকি রঙের খামে লস্বা চিঠি এল আমার ঠিকানায়। আকাশবাণীর একটা কবি সম্মেলনে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের হাতের লেখা একটা ছেট চিরবৃক্ষ। সেদিন শ্রীরামপুরে যে কবিতাটি পড়েছিলে, সেটি কোথাও ছাপিয়ে ফেলোনি কৈজু? সেই কবিতাটাই তুমি পাঠ করবে!

সেইকালে তি ভি-র কথা কেউ শোনেয়নি বলতে গেলে, রেডিয়োর খুব রমরমা। রেডিয়োতে যুববাণী, বিবিধ ভারতী ইন্ড্যান্ডও ছিল না। রেডিয়োতে কেউ একবার অনুষ্ঠানের সুযোগ পেলেই সে হয়ে যেত ‘বেতার শিঙ্গী’, অনেকে গর্ব করে সেটা নামের পাশে লিখত। কবি-সাহিত্যিকরা বেতারের অনুষ্ঠান পাবার জন্য নিজেদের রচনার নমুনা সমেত দরখাস্ত পাঠাতেন। এইসব দরখাস্তকারী কবিদের নিয়ে আমরা হাসি ঠাট্টা করতাম কফি হাউসে। বেতার শিঙ্গী হবার বিশেষ বাসনা ছিল না আমার। কিন্তু এ যে বিশেষ আমন্ত্রণ। সাধারণ রেকর্ডিং নয়, গারস্টিল প্রেসে, পুরনো রেডিয়ো অফিসের ছাদে বিশিষ্ট শ্রোতাদের সামনে পুরোপুরি এক প্রকাশ্য কবি সম্মেলন, সেই অনুষ্ঠানই সরাসরি সম্প্রচারিত হল বেতারে। আমন্ত্রিতদের মধ্যে আমি সর্বকনিষ্ঠ। এবং পরদিন সংবাদপত্রগুলিতে সেই অনুষ্ঠানের ছবি।

আমার যোগ্যতা কিংবা কবিতার শুণে নয়, সেদিন শ্রীরামপুরে কবিতার আসরে হঠাৎ একটি নতুন ছেলের কবিতা পড়ার মাঝখানে তিনি এসে পড়ায় কিছুটা চক্ষুলজ্জায় পড়েছিলেন এবং সেইজন্যই যে তিনি রেডিয়োর অনুষ্ঠানে আমায় সুযোগ দিয়েছিলেন, তাতে আমার কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু এরকম চক্ষুলজ্জা এবং ঔদ্যোগ্য বা ক'জন বড় লেখকের থাকে?

সে আমলে এত ব্যক্তি মানুব হওয়া সম্বন্ধে তিনি যে তরুণ লেখকদের সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন, সে প্রমাণ পেয়েছি বারবার। ভাগলপুরের এক অতি তরুণ গল্প-লেখক দিবোন্দু পালিতের লেখার তিনি উচ্ছিসিত প্রশংসা করেছিলেন বারবার,

মনে আছে। নিজের লেখার ব্যাপারে তাঁর যে কী দারুণ আলস্য ছিল তা ভুক্তভোগী সম্পাদকমাত্রই জানেন, কিন্তু অন্যের লেখা পাঠ করার ব্যাপারে তাঁর কোনও আলস্য ছিল না।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের চেয়েও বুদ্ধদেব বসু এবং তাঁর বাড়ির সকলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল অনেক বেশি। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুকে আমি কোনওদিন বুদ্ধদেবদা বলিনি, তাঁর বাড়িতে সে রকম রেওয়াজ ছিল না, কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র কী করে যেন হয়ে গেলেন প্রেমেন্দ্র। তিনি সকলেরই প্রেমেন্দ্র! বুদ্ধদেব বসু তাস খেলা দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছিল তাস খেলার নেশা। তাঁর সঙ্গে দু'একটা তাসের আসরে যোগ দেবারও সুযোগ পেয়েছি আমি। তাসের আসর বসত সাগরময় ঘোষ, সঙ্গোষ্কুমার ঘোষ, কানাইলাল সরকার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর এক বন্ধু শচীন করমশাইয়ের বাড়িতে, যিনি 'দেশ' পত্রিকায় 'ট্রামে-বাসে' নামে একটি ফিচার লিখেছেন দীর্ঘদিন। অধিকাংশ কবি সম্মেলনের মতন, এই তাসের আসরেও আমি ছিলাম কনিষ্ঠতম সদস্য। তবে কবিতা রচনার তুলনায় ব্রিজ খেলাটা আমি ভালই জানতাম। প্রেমেন্দ্র কালবার্টসনের চেয়েও অভিনব নানারকম পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন বটে কিন্তু খেলার সময় তাঁর বিশেষ ধৈর্যের প্রমাণ পাওয়া যেত না।

ষাটের দশকে আমি মার্কিন দেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশিপ পেয়ে যাই দৈবাত্ম। তখনই খবর শুল্লাম যে প্রেমেন্দ্র মিত্রও সরকারি সফরে সে দেশে যাচ্ছেন কয়েক সপ্তাহের জন্য। সেই প্রথম আমার বিদেশ যাত্রা, থাকতে হবে অনেক দিন, মার্কিন দেশে আমার চেনাশুনো একজনও ছিল না, সুতরাং প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে সেখানে দেখা হতে পারে এই সঞ্জীবনায় আমি বেশ একটা উৎসোভনা বোধ করেছিলাম। যাত্রার আগে এক দুশূরে ঠিকানা খুঁজে আমি প্রেমেন্দ্রার বাড়িতে হাজির হয়ে তাঁকে বললাম, ওদেশের সরকার আপনাকে আর যেখানেই নিয়ে যাক, আপনাকে একবার আয়ওয়া শহরে আসতেই হবে। তিনি খুব উৎসাহিত হয়ে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আমি বেশি ঘোরাঘুরি পছন্দ করি না। আমি তোমার বাড়িতে গিয়ে থাকব বেশ কয়েকটা দিন। ওখানে কী রকম ঠাণ্ডা বলো তো? তুমি আমাকে রান্না করে খাওয়াবে তো?

আয়ওয়ায় পৌছে আমি প্রেমেন্দ্রার প্রতীক্ষায় ছিলাম দিনের পর দিন। তিনি এলেন না। পরে চিঠি লিখে জেনেছি, আমেরিকায় পা দেবার কয়েক দিন পরেই তিনি নাকি ঠাণ্ডার ভয়ে দেশে ফিরে গেছেন। ঠাণ্ডা তাঁর একেবারে সহ্য হয় না। যিনি ঘনাদার শ্রষ্টা, বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী লিখে যিনি তাঁর নায়কদের কখনও মঙ্গল প্রাহে, কখনও সমুদ্রের নীচে পাঠিয়েছেন, সেই তিনিই ঠাণ্ডার ভয়ে দেশ ভ্রমণ বাতিল করে দেন, এটা জেনে বেশ মজা পেয়েছিলাম।

আমার বাড়িতে তাঁর আসার ব্যাপারে কিছু একটা গেরো লেগে গিয়েছিল মনে হয়।

আমেরিকা থেকে ফিরে আমি বেশ কিছুদিন ছিলাম দমদম-বাণুইআটি অঞ্চলে। যদিও ভাড়া বাড়ির ফ্ল্যাট, কিন্তু সেই বাড়িটার সামনে পাশে অনেকখানি মাঠ ও বাগান

এবং একটি পুরুর ছিল। সেই বাড়ির বর্ণনা শুনে প্রেমেনদা খুব আগ্রহী হয়ে বললেন, পুরুর আছে? তা হলে আমি একদিন নিষ্ঠয়ই যাব। কীভাবে যেতে হয়, কত নম্বর বাস, সে সব জানতে চাইলেন। তিনি ভৃগোল সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন, নিয়মিত ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকা পড়তেন। ছেটদের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীতে তাঁর স্থান বর্ণনা পুস্তানুপুস্ত, তিনি দমদমের ভৃগোলও বুঝে নিতে চাইলেন। তখন তি আই পি রোড সদ্য তৈরি হচ্ছে, সে সম্পর্কেও কৌতুহল ছিল। কিন্তু ছ'-সাত বছরে তিনি বেশ কয়েকবার যাব যাব করেও যেতে পারেননি।

সাহিত্য জগতে তাঁর যত প্রচণ্ড খ্যাতি, সেই তুলনায় সেই ষাটের দশকে তিনি লিখছেন বেশ কম। উপন্যাস তিনি কোনওদিন তেমন মন দিয়ে লেখেননি, সম্ভবত বেশি বড় লেখার ধৈর্য তাঁর ছিল না। কিন্তু এক সময় অনেকগুলি অসাধারণ ছোটগল্প লিখলেও, তখন লিখছেন বছরে একটি-দুটি মাত্র, কবিতাও কদাচিং। সম্পাদকরা তাঁর লেখা পাবার জন্য ব্যাকুল, তিনি পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান। পত্রপত্রিকায় তিনি বহু আলোচিত লেখক, অথচ নিজে লিখতে চান না। এরই মধ্যে হঠাতে এক বছর দেশ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হল তাঁর চমৎকার উপন্যাস ‘প্রতিধ্বনি ফেরে’। যতদূর মনে হয়, সেটাই তাঁর শেষ পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস।

অবশ্য ছেটদের রচনার জন্য তাঁর মমত্ব ছিল বেশি। দেব সাহিত্য কুটিরের পূজা বার্ষিকীতে প্রত্যেকবার তাঁর ঘনাদা-কাহিনী বিশেষ আকর্ষণীয়। ছেটদের জন্য তাঁর প্রত্যেকটি লেখা বড় বয়েসেও পড়তে ইচ্ছে করে।

বেশ কয়েকবার বাড়ি বদল করার পর আমি দক্ষিণ কলকাতার একটা লম্বা বাড়ির দশতলায় উঠে এলাম। এন এফ ডি স্ট্রিয় স্ক্রিপ্ট কমিটির একটা মিটিং-এ দেখা হবার পর আমি কৌতুকছলে বললাম, জ্ঞানেন প্রেমেনদা, আমার ফ্ল্যাটের পেছনের বারান্দা দিয়ে সুন্দরবন পর্যন্ত দেখা যায়। প্রায় বিশাস করে বললেন, তা হলে তো একদিন তোমার বাড়ি যেতে হয়! দশতলায় থাকো? মাথা ঘোরে না? সত্যি একদিন গিয়ে দেখতে হয়! আমাদের কালে তো এত বড় বড় ছিল না। কোনও দিন দশতলায় উঠিনি। আমি বললাম, আপনি আমেরিকায় আমার বাড়িতে যাননি, দমদমে যাননি, আর বালিগঞ্জে এত কাছে, এ কি আপনার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে? তিনি জোর দিয়ে বললেন, এবার যাবই। পরবর্তী সপ্তাহের একটা তারিখও ঠিক হল, আমি তাঁকে নিয়ে আসব। এরই মধ্যে একদিন টেলিফোন করে তিনি জানালেন যে, তাঁর চোখে খুব অসুখ হয়েছে, ভাল দেখতে পাচ্ছেন না, এখন বাড়ি থেকে বেরুন অসুবিধে।

চোখের অসুখে তিনি ভুগলেন দীর্ঘকাল। শুনেছি, অপারেশনের যাপারে তাঁর খুব ভয় ছিল, একবার নাকি শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েও চলে এসেছিলেন হাসপাতাল থেকে। দৃষ্টিক্ষণতা তিনি মেনে নিলেন।

এই চোখের অসুখের পর তাঁর অন্য একটা পরিচয় প্রধান হয়ে উঠল। নিজের লেখার ব্যাপারে যিনি ছিলেন কৃপণ কিংবা অলস, তাঁর মধ্যে জেগে উঠল এক অদ্যম পাঠ্তত্ত্ব। পড়ার নেশা তাঁর আগেই ছিল নিশ্চিত কিন্তু চোখ খারাপ হবার পর কে আর বেশি পড়তে চায়। সাধারণত প্রবীণ লেখকরা পরবর্তী প্রজন্মের রচনা বিশেষ

পড়েন না, কিন্তু প্রেমেনদা সবসময়ই সাম্প্রতিক সাহিত্যের খুটিনাটি খবর রাখতেন। প্রথম প্রথম তিনি পড়তেন ম্যাগনিফাইং প্লাস দিয়ে। তারপর চোখের অবস্থা আরও খারাপ হওয়ায় মাইনে করে একজনকে রেখেছিলেন, যিনি তাঁকে বই, পত্রপত্রিকা পড়ে শোনাতেন।

চোখের অসুবিটা মেনে নেবার পর তিনি বাড়িতে আবদ্ধ হয়ে থাকতেও চাইলেন না। এর পর থেকে তাঁকে দেখা যেতে লাগল নানান সভাসমিতিতে। আমাদেরও তো বয়েসটা থেমে নেই, জুলপিতে পাক ধরেছে, এখন আমাদেরও মাঝে মাঝে বাধ্য হয়ে মঞ্চের ওপর বসতে হয়। প্রেমেনদার পাশে বসলে তিনি ভুক্ত কুঁচকে দেখবার চেষ্টা করেন, প্রথমটা চিনতে পারেন না। নিজের নামটা বললেই তিনি অবধারিতভাবে বলবেনই, ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার অমুক লেখাটা পড়লুম। আর ছোটদের পত্রিকায় তোমার ধারাবাহিকটা পড়ছি প্রত্যেক সংখ্যা।

একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, প্রেমেনদা, আপনার চোখের এই অবস্থা, তবু এত পড়েন কেন?

তিনি বললেন, না পড়ে যে পারি না! পৃথিবীটাকে এখন আর ভাল করে দেখতে পাই না, এইসব লেখাপত্রের মধ্যে দিয়েই পৃথিবীকে দেখি, বুঝলে!

এবং এই রকম সময়েই তাঁর আবার লেখার ইচ্ছে জেগেছিল। শুনেছি, প্রায় আন্দাজে কলম ধরে ধরে, অনেক কষ্ট করে লিখতেন। কিছু কিছু ডিকটোন দিয়েও লিখিয়েছেন। এইভাবে, সম্প্রতিকালে তাঁর বেশ কয়েকটি রচনা বেরিয়েছে।

এই তো মাত্র কিছুদিন আগে, বইমেলাটি এর সভায় তাঁর সঙ্গে দেখা। সেদিন তিনি আমায় খুব লজ্জায় ফেলে দিয়েছিলেন। দুটি বইয়ের প্রথম প্রকাশ উপলক্ষে সেই সভা, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও লীলা মজুমদার এসেছিলেন একটি ছোটদের গল্প সংকলনের প্রকাশ উপলক্ষে, আর আমি ওঁদের পাশে ছিলাম দুই বাংলার একটি কবিতা সংকলনের সম্পাদক হিসেবে। সভার কাজ চলছে, এর মধ্যে প্রেমেনদা আমায় বললেন, সুনীল, তোমার এই সংকলনটায় তুমি আমার কবিতা নাওনি শুনলুম? তুমি আমায় বাদ দিয়েছ?

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, প্রেমেনদা, আপনি বইটা বোধহয় ভাল করে দেখেননি। এটা শুরুই হয়েছে অরূপ মিত্রকে দিয়ে, আপনাদের জেনারেশনের পর থেকে। জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, এঁদেরও তো কবিতা নেই।

তিনি অসহিষ্ণুভাবে বললেন, আহা, ওরা তো কেউ নেই এখন আর। কিন্তু আমি তো বেঁচে আছি। আমি তো এখনও বেঁচে আছি!

আমি মাথা নিচু করে রইলাম। যদিও সংকলনটির সময়সীমা বাঁধা ছিল, প্রবীণদের চেয়ে তরুণদের লেখার প্রতিই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে, তবু সেই মুহূর্তে প্রেমেনদাকে আর কোনও উন্নতির দিতে পারলাম না। সত্যিই তো তিনি বেঁচে আছেন, তাঁর কবিতার কত লাইন আমার মুখস্ত, এই সংকলনের শিরোমণি করা উচিত ছিল তাঁকেই।

প্রেমেনদা অবশ্য প্রসঙ্গ বদলে সহাস্যে বললেন, তোমার সেই দশতলা বাড়িতে

যাব যাব করে আৱ খাওয়া হচ্ছে না। এবাৰ একদিন যাব, মুখলৈ। এখন অনেকটা
ভাল আছি। তবে চোখেৰ যা অবস্থা, বারান্দা দিয়ে সুন্দৰকল তো আৱ দেখতে পাৰ
না, কিন্তু টাটকা বাতাস তো খাওয়া যাবে।

কল্পেকদিন বাদেই তাঁৰ অন্যতম চিকিৎসক ডঃ জয়ন্ত সেনেৰ কাছ থেকে জানতে
পাৱলুম যে এক বিষম কালব্যাধি তাঁকে আঁকড়ে ধৰেছে। আৱ আমাৰ বাড়িতে তিনি
পাস্তেৰ ধূলো দিতে আসতে পাৱবেন না।

সৈয়দ-দা

অত্যন্ত রোগা, সিডিজে, গায়ের রং ছাতার কাপড়কেও লজ্জা দেয়, এবং তোতলা, কথা বলার সময় মুখ দিয়ে থুতু ছোটে—এইরকমভাবে সৈয়দ মুজতবা আলী একটি লেখায় নিজের বর্ণনা দিয়েছিলেন। আসলে আমরা সবাই জানি, বাঙালি লেখকদের মধ্যে এরকম রূপবান ও গুণবান পুরুষ অঙ্গুলিমেয়। শুধু লেখাতেই নয়, বৈঠকী আভাতেও তিনি মন্ত্রমুক্ত রাখতে পারতেন শ্রোতাদের।

বহুকাল আগোকার, হয়তো আমার জন্মেরও আগের, প্রবাসী পত্রিকার একটি বাঁধানো ফাইল কিছুদিন আগে আমার হাতে এসেছিল, পাতা ওলটাতে ওলটাতে একটি খবর চোখে পড়ে। ‘বাঙালি যুবকের কৃতিত্ব’ বা এই ধরনেরই কিছু শিরোনাম ছিল খবরটির, আফগানিস্তানের সরকারের আমন্ত্রণে সৈয়দ মুজতবা আলী তখন সেদেশে শিক্ষকতা করতে যাচ্ছেন। খবরটির সঙ্গে তৎকালীন ফ্যাশান অনুযায়ী ডিস্ট্রিক্ট দিস্ট্রিক্টের ছবি। রূপবান, তেজস্বী এক যুবা মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, সুসজ্জিত, গলায় বো। মুক্ত হয়ে তাকিয়ে থাকবার মতো পরে যখন আলী সাহেবকে আমি স্বচক্ষে দেখি, প্রায় চলিশ বছরের বয়বানেও সেই চেহারার আভাস কিছুটা ঝুঁজে পাওয়া যেত।

আমার মতন সদ্য-আগত সাম্রাজ্য লেখকের পক্ষে ওর মতন প্রখ্যাত লেখকের সামন্থে আসার সুযোগ পাওয়া হয়তো সহজ ছিল না, কিন্তু আলী সাহেব ছিলেন সকল বয়সেরই লেখকের বন্ধু। অবিলম্বেই উনি আমাকে সৈয়দ-দা বলে ডাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। আমি ওর লেখার এমনই ভক্ত ছিলাম যে, মুখ ফুটে ওর সামনে কথা বলতেই সংকোচ বোধ করেছি।

লেখক সৈয়দ মুজতবা আলীর চেয়েও মানুষ সৈয়দ মুজতবা আলী কম বিশ্বায়কর ছিলেন না। যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে তাঁর অন্তরঙ্গ ছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই পরে সে সম্পর্কে লিখবেন। অত্যন্ত চঞ্চল এই মানুষটিকে কিছুতেই সাধারণ সংসারী-মানুষদের মাপে আঁটানো যায় না। প্রতিভা জিনিসটা খুব সুবের নয়, বরং এর বিষম জ্বালা আছে—এই জ্বালাতে ইনি সারাজীবন ছটফট করেছেন বললে অত্যুক্তি হবে না। এর সম্পূর্ণ জীবন কাহিনী প্রকাশিত হলে মনে হবে, ইনি একটা জীবনেই অনেকগুলো জীবন কাটিয়ে গেলেন। কখনও ইনি শাস্তিনিকেতনে, কখনও কলকাতায় সংস্কৃত শিখছেন, আবার মিশনে আরবী ফার্সী ঝালিয়ে নিতে, রমন মহৰির আশ্রমেও ইনি, আবার কাবুলে বাছাও সাকোর আক্রমণের সময় যিনি উপস্থিত, তিনিই আবার জার্মানিতে দেখছেন হিটলারের অভ্যর্থন।

জ্বানতঞ্চার ব্যাপারেও এর মতন ছটফটে মানুষ কদাচিৎ দেখা যায়। কোন বিষয়ে

আগ্রহ ছিল না? যিনি ডক্টরেট করেছেন খোজা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি বিষয়ে, তিনিই বাঙালি ও সাহেবি ধরনের রক্ষণ প্রণালী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলতে গেলে। আধুনিক সমর প্রণালী সম্পর্কে যে-রকম, ক্যানসার রোগ সম্পর্কেও তত্ত্বানিই আগ্রহ। ভাষাতত্ত্বের অন্তর্নিহিত মজা যিনি খুঁজেছেন সারাজীবন, তিনিই লিখেছেন মধুর প্রেমের কাহিনী। তাঁর নিজের নামের রচনাগুলি ছাড়াও সত্যপীর, রায় পিঠৌরা এই সব ছন্দনামে অজ্ঞ রচনা ছড়িয়ে আছে হাজারটা বিষয়ে। মাত্র কয়েক মাস আগেও ঢাকা থেকে একটি চিঠিতে তিনি আমাকে লিখেছেন গাঞ্জুলি বা গঙ্গোপাধ্যায় পদবির দীর্ঘ ইতিহাস। তাঁর নিজস্ব মূল বিষয় অবশ্য ছিল তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, যে সম্পর্কে তাঁর অধ্যয়নে আলস্য ছিল না কখনও—একমাত্র সেই বিষয়েই তিনি খুব বেশি কিছু লিখে যেতে পারেননি। প্রায়ই অন্তরঙ্গদের বলতেন, এ সম্পর্কে তিনি লিখবেন একটি সুনীর্ধ গ্রন্থ, তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, আর সময় পেলেন না।

রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্র প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন, সৈয়দ-দা সম্পর্কেও হয়তো সে কথা আংশিকভাবে খাটে। তাঁরও প্রতিভা যত ধনী ছিল, ততটা গৃহিণীপনা ছিল না। নাই বা থাকল। এ জগতে সবাই সংসারী হয় না। এই দুর্দান্ত দুরস্ত মানুষটির পক্ষে সুস্থিরভাবে বসা সম্ভব হয়নি, যদি সম্ভব হত, তা হলে তাঁর কাছ থেকে হয়তো আমরা আরও অনেক বেশি কিছু পেতাম। যা পেয়েছি, তাও কম নয়, অমূল্য বলা যেতে পারে।

বাংলা ভাষায় তিনি যে স্টাইলের প্রবর্তন করেছেন, তা চিরস্থায়ী হ্বার জন্য এসেছে। এই গদ্য রীতি সৈয়দ মুজতবী আলীতেই শেষ হয়ে যাবে না—পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যেও যে আর একটি ধারা প্রবর্তিত হল, তার চিহ্ন স্পষ্ট। প্রথম যখন বাঙালি লেখকরা সাধু বাংলা ছেড়ে চলিত বাংলা ধরলেন, তখন অনেকেই ভয় পেয়েছিলেন যে ভাষার গান্ধীয় বুঝি চিরতরে নষ্ট হয়ে গোল। তা যায়নি। তেমনি, সৈয়দ মুজতবী আলী এগিয়ে এলেন আর একধাপ, তিনি দেখালেন যে, নিছক মুখের ভাষা কিংবা গল্প-আভ্যাস ভাষাতেও উচ্চাসের রস সৃষ্টি করা যায়, কৃটি উন্নত রেখেও ভাষা কত সরস হতে পারে। অনেকের ধারণা, আলী সাহেবের ভাষাতে শুধু বুঝি হাস্যরস প্রকাশ করাই সম্ভব। বস্তুত করুণ রস ফোটাতে তিনি ছিলেন আরও বেশি দক্ষ। শবনম উপন্যাসের কোনও অংশ কিংবা পঞ্চতাঙ্গের সেই যে মেয়েটি, প্রেমিক তাকে বঞ্চনা করার পর যার মুখের চেহারা আলোহীন চিনে লঠনের মতন—এই রকম অনেক অংশ পড়তে-পড়তে আমি অশ্রু সংবরণ করতে পারিনি।

আমরা বাংলা গদ্য লিখতে গিয়ে অনেকেই ইংরিজি-ফরাসি শব্দ প্রয়োগ করি, কিন্তু অচেনা আরবি-ফার্সি শব্দ সম্পর্কে কীরকম যেন একটা শুচিবাই-এর ভাব। সৈয়দ মুজতবী আলী সমস্ত সংস্কারের বাঁধ ভেঙে দিয়েছিলেন। যে-কোনও ভাষা থেকে যে-কোনও শব্দ নিয়ে এসেছেন প্রয়োজন মতন, হোক না আরবি কিংবা নিছক বাংলার গ্রাম্য মেয়েলি শব্দ, আমাদের কোনও এক সময়েও মনে হয়নি, ঠিক হল না। তিনি লিখতে জানতেন, তাই যা খুশি লিখেছেন। একটা জিনিস খুবই লক্ষ করার মতন, তাঁর কোনও একটি রচনাতেও হতাশা কিংবা আস্থান্বিত সামান্য চিহ্নও নেই।

ক'জন লেখক এরকম পারেন? সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁরা খুব রসিক বলে পরিচিত, তাঁরা কদাচিৎ নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করতে সাহস পান। আলী সাহেবের অধিকাংশ রসিকতাই নিজেকে ন্যূন করে।

সৈয়দ-দা নিজের জীবন কাহিনী লিখতে চাননি কখনও। ওঁর বাল্যকাল সম্পর্কে আমি কিছু কিছু জেনেছিলাম ওঁর দুই দাদার লেখা দুটি আত্মকাহিনী পড়ে। বই দুটি সৈয়দ-দা আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। সেই বই দু'খানি অত্যুত্তম তো বটেই, তা ছাড়াও প্রায় প্রত্যেক পাতার পাশে পাশে ওঁর বিখ্যাত সেই সবুজ কালিতে লেখা নিজের হাতের অজস্র নোট, আমাকে বহু সরস তথ্যের সঞ্চালন দিয়েছে। ওঁর কাছে আমি কখনও কখনও নানা বিষয়ে প্রশ্ন করেছি। একবার শ্রীহট্টের কবি হাসানরাজা সম্পর্কে আমার আগ্রহ হয়, ওঁর কাছে জানতে চাই, উনি তারপর ‘দেশ’ পত্রিকায় কয়েক সংখ্যা ধরে হাসানরাজা সম্পর্কে লিখেছিলেন। সেইরকমই, আমি ওঁকে আর একটি বিষয় নিয়েও লিখতে বলেছি অনেকবার, উনি কিন্তু সেটা উড়িয়ে দিয়েছেন প্রত্যেকবার। আমি চেয়েছিলাম ওঁর আত্মজীবনী। উনি বলেছিলেন, আমার মতন গবেষের আত্মজীবনী পড়বে কোন গবেট?

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রাজশেখর বসুর ধারায় এই আর একজন লেখক, বৈদ্যুত ও সরসতাকে মেশাবার দুর্ভ গুণের অধিকারী অসময়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। জীবিতকালে এঁকে রবীন্দ্র পুরস্কার বা আকাদেমি পুরস্কার দেবার কথা কারুর মনে পড়েনি, সেজন্য কর্তব্যক্তিরা আজ নিশ্চয়ই অনুশোচনা করে পাপস্থালনের চেষ্টা করবেন। আমরা সে ব্যাপারে চিন্তিত নই। বাংলা সাহিত্যে ও আমাদের জীবনে তিনি একটা ছল্লোড় তুলে চলে গেলেন, আমরা এখনও অভিভূত হয়ে আছি।

সবার যিনি এক বয়েসি

শিবরাম চক্রবর্তী আসলে ক'জন? আগামী শতাব্দীতে হয়তো এমন গবেষণা হবে যে, শিবরাম চক্রবর্তী নামে চার পাঁচজন মানুষ লিখতেন। শিশু সাহিত্যে অনাবিল রসের ভাণ্ডারি হিসেবে আমরা পেয়েছি গত পঞ্চাশ বছর ধরে, সেই একই মানুষ কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা নিয়ে শুরুগন্তীর প্রবন্ধ লিখতেন? রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেই অতি-উগ্র আধুনিক কবিতার দুটি বই, নাম 'চুম্বন' আর 'মানুষ' যিনি লিখেছিলেন তিনি কি এই একই হাস্যরসিক শিব্রাম চক্রবর্তী? বষ্ঠিত মানুষদের নিয়ে 'একদিন যারা কথা বলবে' এই নাটক লিখেছিলেন কে? শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের যিনি নাটকৰূপ দিলেন, শিশির ভাদুড়ীর পরিচালনা ও অভিনয়ে যা বাংলা মঞ্চে চিরস্মরণীয় হয়ে রইল, সেই 'শোড়শী'র নাট্যকারও ইনি?

ওই সব পরিচয়গুলি অনেকদিনই আবছা হয়ে গেছে, নিজের জীবন ও কলম নিয়ে তিনি শিশু-কিশোরদের জগঠটাই আপন করে মিলেন জীবনের পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে। শিশু সাহিত্যের সপ্তাটি কিংবা সেনাপতি আখ্যা দেওয়া যায় না তাঁকে, সৃষ্টি কিংবা চন্দ্রের সঙ্গেও তুলনা দেওয়া যায় না, তাঁর সব লেখা মিলিয়ে যেন একটা বিশাল উদ্যান, যার মধ্যে সব বয়েসি প্রয়োক্তি মনের সুখে বিচরণ করতে পারে। এই উদ্যানটিকে খেয়াল-খুশি মতন সম্ভজ্যেছেন শিবরাম, বৃহৎ-মহৎ কোনও সৃষ্টির দাবি নেই, খ্যাতির লোভ নেই, তাঁর জীবনেও কোনও কিছুই যেন শুরুত্বপূর্ণ নয়। আপন মনে মশগুল হয়ে এই জীবনটা যতদিন চলে চলুক, কিংবা যদি না চলে তো চলল না, এই রকম মনের ভাব। এমন সরলতম সুন্দর দর্শন নিয়ে একটা গোটা জীবন তো সত্যিই কাটিয়েও গেলেন তিনি। সারা জীবন তিনি যেন সবার সঙ্গে এক বয়েসি থেকে গেলেন।

খ্যাতির প্রতি এমন নির্মোহ লেখক আধুনিক কালে আর দেখা গেছে কিনা জানি না। কফি হাউসে একদল ছেলেমেয়ে তাঁকে একদিন ঘিরে ধরে বলল, আমরা আপনার খুব ভক্ত। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, তোমরা বুঝি ভোবেছ, আমি হেমেন্তকুমার রায়? বাপরে বাপ, কতবড় লেখক তিনি। আমাদেরও এরকম অভিজ্ঞতা আছে। আমাদের বয়েসি যারা শিবরামের রচনার সাহচর্যে ছেলেবেলা থেকে বেড়ে উঠেছি, পরে তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়েরও সুযোগ হয়েছে, সেই আমরাই কখনও যদি বলতে গেছি যে, আপনার অমুক লেখাটা এত ভাল...সঙ্গে সঙ্গে তিনি কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলেছেন, অমুকের লেখা পড়েছ? কী দারুণ লেখে? আর প্রেমেন, ওঃ, ওরকম কেউ লিখতে পারে না! আর মানিক, কী কলমের জোর।

ক঳োল যুগের লেখকদের তুলনায় শিবরাম অনেক বর্ষীয়ান, কিন্তু নিজের

বয়েসিদের চেয়েও কল্পালের লেখকদের সঙ্গেই তাঁর বেশি স্থ্য ছিল। বাংলা ছোটগল্পে মানিক বন্দোপাধ্যায় যখন নতুন যুগ আনছেন, তখন শিবরামও যে ইচ্ছে করলে ওই রকম কিছু করতে পারতেন, তার প্রমাণ তিনি রেখেছেন অন্তত একটি গল্প, ‘দেবতার জন্ম’। রাস্তার নুড়ি কী করে একদিন দেব-শিলা হয়ে যায়, তাকে ঘিরে মন্দির গড়ে ওঠে, শত শত লোক এসে সেখানে ধরনা দেয়, একটি ছোটগল্পের পরিসরে সেই অঙ্কতা ও সংক্ষারের কথা ফুটিয়ে তোলার জন্য শক্তির দরকার। অথচ শিবরামের সে লেখায় বিদ্রূপ নেই, ক্ষোভ নেই, জ্বালা নেই। সেরকম গল্প আর বেশি লিখলেন না শিবরাম, সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে বলতেন, ওই তো মানিক লিখছে, তারাশঙ্কর, বিভূতিবাবু লিখছেন, বাপ্তৃ বাপ, কী ভাল লেখা, আমি কি ওসব পারি? কুন্ত নয়, আপনভোলা মহাদেবকেই যাঁর পছন্দ, কীর্তি স্থাপনের কোনও বাসনাই তাঁর না থাকাই সম্ভব।

ইচ্ছে হোক, অনিচ্ছে হোক, জীবিতকালেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। বাকি সব লেখক একদিকে, শিবরাম চক্রবর্তী অন্যদিকে। সুদূর ইংল্যান্ড-আমেরিকায় দুই বাঙালি যুবক কথোপকথনের মধ্যে একজন কোনও রসিকতা করে ফেললে অন্যজন বলে ওঠে, এই, শিবরাম চক্রবর্তীর মতন হয়ে গেল না? তাঁর লেখা যে ব্যক্তি কোনওদিন পড়েনি, সেও তাঁর কোনও না কোনও গল্প জানে। ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি, চটির সঙ্গে চটাচটি, হাতির সঙ্গে হাতাহাতি, এই রকম কতকগুলো কথা তৈরি করে দিয়ে গেছেন তিনি, সেই অনুযায়ী কেউ যদি মিলিয়ে মিলিয়ে এই রকম কিছু কথা বানায়, অমনি সে নিজেই স্বীকার করে শিবরামের মতন।

শিবরাম চক্রবর্তীর জীবন তাঁর চৰচনার মতনই বিচ্ছিন্ন ও অসাধারণ। প্রায় অর্ধশতক তিনি কাটিয়ে গেলেন একা একা মেস বাড়ির একটা ছোট ঘরে। মুক্তারাম বাবু ট্রিটের মেসে তক্ষণামে শোয়া আর শুক্রাম ভক্ষণ, তাতেই আঞ্চারামের সুখ। সে ঘরের চার দেয়ালে লেখা অসংখ্য মানুষের ঠিকানা। একদিন কেউ না কেউ তাঁর পূর্ণাঙ্গ একটি জীবনী লিখবেন নিশ্চয়ই, তাতে ভবিষ্যৎকালের পাঠকরা জানতে পারবেন, এমন সরল অস্তংকরণের মহৎ মানুষও হয় এ যুগে। ‘দেশ’ পত্রিকায় দীর্ঘকাল ধরে আঞ্চাজীবনী লিখলেন তিনি, তাতে নিজের কথা প্রায় কিছুই নেই, সবই অন্যান্যদের কথা। শোনা যায়, কোনও এক জমিদার বৎশে তাঁর জন্ম, তাই যদি হয় তা হলে সেই মানুষের জীবনের একটি ঘটনা আমি বর্ণনা করতে চাই। একদিন তরুণ ঔপন্যাসিক সুব্রত সেনগুপ্ত এই পত্রিকার দপ্তরে এসে খুব উৎকঢ়িত ও চিন্তিত ভাবে বললেন, একটু আগে শিবরাম চক্রবর্তীকে দেখলুম, ফুটপাথে শুয়ে আছেন, বোধহয় খুবই অসুস্থ, তারপর আস্তে আস্তে এখানেই এলেন...। আমি খোঁজাখুঁজি করে দেখলুম, তিনি চারতলায় ক্যাশিয়ারবাবুর কাছে একটা টুল বসে আছেন। আমি প্রথমে সন্তুর্পণে জিজ্ঞেস করলুম, শিবরামদা, আপনি কেমন আছেন? উনি বললেন, এই তো, খুব ভাল আছি, এই মহীর পাশে বসলে শীত করে না। চারদিকে টাকার গরম তো! এরপর জিজ্ঞেস করলুম, আপনি নাকি ফুটপাথে শুয়ে পড়েছিলেন? উনি অবাক হয়ে

বললেন, হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে? মেন বিকেলবেলা ফুটপাথে শুয়ে পড়া একজন
বিখ্যাত লেখকের পক্ষে অতি সাধারণ ঘটনা! ফের জিন্দেস করলাম, হঠাৎ রাস্তায়
শুতে গেলেন কেন! উনি বললেন, বুঝলে চাঙোয়ার সামনে ইচ্ছে হলো রাস্তায় একটু
বসি, বেশ ভাল গন্ধ তো! তারপর বসে থাকতে থাকতে শুয়ে পড়লুম, বেশ ভাল
লাগে, শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখা যায়, আগে কোনওদিন দেখিনি...তারপর একটি
ছেলে বুঝলে, লেখে-ঢেখে বোধহয়, আমার হাত ধরে তুলল, তারপর আমার হাত
ধরে ধরে আসতে লাগল...বুঝলে, ছেলেটির বোধহয় স্বাস্থ্য খারাপ, নিজে হাটতে
পারছিল না, তাই আমাকে ধরে ধরে...।

এই শিবরাম। সিক্ষের ঢোলা পাঞ্জাবি পরা সদা হাস্যময়, নিঃশক্ত এই মানুষটিকে
আর দেখা যাবে না। এক একজন মানুষ চলে ষাবার পর উপলব্ধি করা যায়, তাঁদের
বিচ্ছেদ কর অসহনীয়।

AMARBOI.COM

বাংলা ছোটগল্লের তিন দিকপাল

সব সাহিত্যেই কিছু কিছু লেখক থাকেন, যাঁদের আবির্ভাব হয় আকশ্মিকভাবে, পরেও যাঁরা থেকে যান মূল ধারার বাইরে। আক্ষরিক অর্থেই যাঁদের বলা যায় আউটস্ট্যান্ডিং। সব লেখকেরই প্রথম জীবনে একটা প্রস্তুতিপর্ব থাকে, সেই পর্বটি সম্পর্কে আমাদের কৌতুহল থাকে, জানতে ইচ্ছে করে, অধিকাংশ লেখকের ক্ষেত্রেই জানা যায়। সকলেই লেখে না, কেউ কেউ লেখে। এক পরিবারের অনেক সদস্যের মধ্যে অন্য কেউ লেখা-টেখার তোয়াক্তা করে না, শুধু একজন কেন গোপনে অনেক সাদা পৃষ্ঠা অক্ষরে ভরিয়ে দেয়, সে রহস্যের আজও কোনও সমাধান হয়নি। ছাপার অক্ষরে প্রকাশের সুযোগ নেই, খ্যাতি কিংবা অর্থপ্রাপ্তির সুদূর সভাবনা নেই, তবু কেউ কেউ লেখে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডিত কোনও আসামিও লিখেছে, অমর সাহিত্য রচনা করে গেছে।

সাহিত্য সৃষ্টির স্ফূরণ হয় কৈশোরেই। যৌবনে আকাঙ্ক্ষার ব্যাপ্তি থাকে আকাশের মতো সীমাহীন। কলম হাতে নিয়ে যে একবার শব্দকে নিজস্বভাবে ব্যবহার করার অভিনব স্বাদ পেয়েছে, সে সেই শব্দ সঙ্গে করেই তার কাছাকাছি এক টুকরো পৃথিবীর ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। নিজের মনোজগতের নির্যাস অপরকে জানাবার জন্য যে ব্যাকুলতা তা থেকেই রচিত হয় কবিতা, গল্প, উপন্যাস। যাঁরা শেষ পর্যন্ত সার্থক সাহিত্যিক হন, তাঁরা সাধারণত অনেক কিছু পেয়ে যান, পাঠকদের শ্রদ্ধা-ভালবাসা, খ্যাতি, অর্থ ও প্রতিষ্ঠা। তাঁদের বলা হয় সফল লেখক। কিন্তু কোনও সার্থক লেখকেরই রচনা শুরু করার সময় এই সাফল্যের প্রতি লোভ থাকে না, হয়তো স্বপ্ন থাকতে পারে, কিন্তু অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ঝুঁকি, স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ কিংবা আত্ম-নিপীড়নের নেশাই তখন বেশি থাকে। যৌবনেই এসব মানায়। যৌবনেই বোধ যায়, শুধু কলম হাতে নিয়ে কে এই কণ্টকাকীর্ণ পথে এগোবে, অনেকেই কিছুদিন পর ফিরে যায়।

বিশ্বের প্রায় সব সাহিত্যিকই যৌবন বয়েসেই আত্মপ্রকাশ করেছেন। যার যৌবন কেটে যায় ভিন্ন মনস্কতায়, পরে সে আর সাহিত্যের প্রতি সক্রিয়ভাবে আকৃষ্ট হতে পারে না। তবে, যৌবন পার করেও সাহিত্যের অঙ্গনে সক্ষম পদক্ষেপে আগমন খুব বিরল হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। এই বিরল আগমন অবশ্যই বিশ্ময়কর।

সাহিত্যজগতে যাঁরা প্রতিষ্ঠা পান, তাঁরা আসেন সাধারণত কোনও পত্রিকাকে অবলম্বন করে কিংবা কোনও লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে কিংবা পারিবারিকভাবে বা সামাজিক সূত্রে তাঁদের জীবনে অন্য কোনও লেখকের প্রভাব থাকে, সাহিত্যের একটা পরিমণ্ডলের কাছাকাছি এসে তাঁরা কোনও না কোনওভাবে প্রেরণা পান।

বক্ষিমচন্দ্র কলেজজীবনের শুরুতেই মাসিক পত্রিকায় কবিতা লিখেছেন, তারপর নিজেই পত্রিকার সম্পাদক হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়েস থেকেই তাঁদের নিজস্ব পরিবারিক একাধিক পত্রিকায় লেখার সুযোগ পেয়েছেন। শরৎচন্দ্রের উদয় অনেকটা ধূমকেতুর মতন বলে মনে হলেও তিনি কৈশোর-প্রথম ঘোবনে হাতে-লেখা পত্রিকায় লিখে হাত পাকিয়েছেন। তা ছাড়া, তাঁর মাতৃল পরিবারের অনেকেই ছিলেন সেকালের খ্যাতনামা লেখক।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের তিনজন বিশেষ প্রতিভাবান লেখক এসেছেন এই প্রথার সম্পূর্ণ বাইরে থেকে। জগদীশচন্দ্র শুণ্ঠ, সতীনাথ ভাদুড়ী ও কমলকুমার মজুমদার। এঁদের শিল্পপ্রক্রিয়া এখনও আমাদের কাছে রহস্যময় মনে হয়। এরা সমসাময়িক নন, বরং বলা যায় পর্যায়ক্রমিক, যেন একজনের হাতের মশাল নিয়ে অন্যজন এগিয়েছেন, কিন্তু পরস্পরের সম্পূর্ণ অঙ্গে, মনে হয় মনোজগতের তিনটি পৃথক প্রদেশের বাসিন্দা, কারুর সঙ্গে কারুর রচনারীতি কিংবা জীবনদর্শনের মিল নেই বিন্দুমাত্র।

কিছু কিছু সাধারণ লক্ষণ ধূঁজে বার করা যায় অবশ্য। এই তিনজনই সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত হয়েছেন প্রৌঢ় বয়েসে, এরা সাহিত্যের জন্য কীভাবে প্রস্তুত হলেন তা আজও প্রায় অজ্ঞাত। জগদীশ শুণ্ঠ কলেজ-বয়েসেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংস্কৰ ত্যাগ করেন অর্থাত্বাবে। কিন্তু ইওরোপীয় সাহিত্য কিংবা সংস্কৃত সাহিত্য যে তাঁর বেশ পড়া ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কমলকুমার মজুমদারও কোনওরকম ডিপ্রি পাওয়ার জন্য পড়াশুনো করেননি, যদিও অর্থাত্বাব তার কারণ নয় এবং তাঁর জ্ঞানতৃক্ষণ ছিল অগাধ। কলকাতার প্রাচীন পরিবারগুলির ধারা অনুযায়ী তিনি স্বশিক্ষিত এবং ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যে ছিলেন বিশেষজ্ঞ। সতীনাথ ভাদুড়ী আবার প্রথাগতভাবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন অর্ধনীতি এবং আইন, কিন্তু এই বিদ্যার প্রয়োগ করেননি তেমনভাবে। আইন পাস করেও তিনি শামলা এঁটে বেশিদিন যাতায়াত করেননি আদালতে, তার বদলে প্রথমে জীবনে রাজনীতি, পরে উদ্যান-সৌন্দর্যচর্চায় মগ্ন থেকেছেন। ইনিও ফরাসি ভাষার চর্চা করেছেন নিজে নিজে এক মফস্বল শহরে বসে। হিন্দি-উর্দুতে দখল তো ছিলই, রূপ ভাষাও শিখতে শুরু করেছিলেন এক সময়। জগদীশ শুণ্ঠ জীবনদশায় কোনও প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান কিংবা পুরস্কার পাননি, শেষ জীবন কেটেছে দারিদ্র্য ও সামাজিক অবহেলায়। যাদবপুরের এক রেফিউজি কলোনিতে তিনি প্রায় অক্ষ অবস্থায় শেষনিষ্পাস ফেলেছিলেন, তখন তাঁর ওষ্ঠে নিশ্চিত নিদারণ তিক্ত স্বাদ ছিল। পাঠকদের কাছেও সমাদর পাননি তিনি, কিন্তু সমালোচকদের স্বীকৃতি পেয়েছেন অনেকখানি, সমস্ত অগ্রগণ্য সাহিত্য-পণ্ডিত ও সমালোচকরা তাঁর প্রতি যথেষ্টরও বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কলম ধরেছেন তাঁর জন্য। কমলকুমার মজুমদার জীবিতকালে পাঠক পাননি, সমালোচকদেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি তাঁর দিকে, তাঁর নামে বক্ষিম পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর এগারো বছর পর, যা এক নির্মম রসিকতার মতন, যা মুকুল্দ দাসের বিখ্যাত গানের লাইনটি মনে করিয়ে দেয়। সতীনাথ ভাদুড়ী আবার এদিক থেকে এক অভূতপূর্ব ব্যতিক্রম, এক অজ্ঞাতকুলশীল

লেখক হয়েও প্রথম উপন্যাসের জন্যই তিনি পেরেছেন রবীন্দ্র পুরস্কার, যা এ দেশে শ্রেষ্ঠ প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান। এ দৃষ্টান্ত আজও তুলনারহিত।

প্রথমে জগদীশচন্দ্র গুপ্ত থেকেই শুরু করা যাক।

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত জন্মেছিলেন গত শতাব্দীতে পূর্ব বাংলার কুষ্টিয়ায়। প্রথম যৌবনেই তাঁকে চাকরি নিতে হয়, অতি সাধারণ চাকরি, আদালতের কেরানিগিরি। চাকরিসূত্রে বদলি হতে হতে তিনি আসেন বোলপুরে, অদূরেই শাস্তিনিকেতন, কিন্তু রবীন্দ্রসামিখ্যে যাওয়ার স্পৃহা তাঁর ছিল না। তিনি কম্পিনকালেও রবীন্দ্র-অনুরাগী ছিলেন বলে মনে হয় না, বরং মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই আদালতের কেরানিটির মানসিকতার বিস্তর ব্যবধান। সেই সময়ে কংসোল, কালি-কলম গোষ্ঠীর তরশ লেখকরা প্রকাশ্যে রবীন্দ্র-বিরোধী বলে পরিচিত হলেও আসলে সকলেই ছিল প্রচন্ড রবীন্দ্রভক্ত, তখনই তাঁরা গোপনে, নিভৃতে পাতার পর পাতা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে চিঞ্চুঙ্কি করতেন এবং পরবর্তীকালে সকলেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে গেছেন। বাংলা ভাষায় যাঁরা চর্চা করবেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে মাথার ওপর বসিয়ে রাখাটা অপছন্দ করতে পারেন, কিংবা রবীন্দ্রনাথকে গুরুত্বকুর হিসেবে মান্য করাটা ন্যাকামি মনে করতে পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে হৃদয়ে স্থান না দেওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। সেই দিক থেকে জগদীশচন্দ্র কী করে রবীন্দ্র-বর্জিত হয়ে রইলেন, তা বেশ কৌতুহলজনক।

বোলপুরে থাকার সময়েই, একচালিশ বছর বয়েসে জগদীশচন্দ্রের প্রথম গল্প-গ্রন্থ ‘বিনোদিনী’ ছাপা হয়। এত বেশি বয়েসে আদালতের এক কেরানির হঠাতে লেখক হবার সাধ জন্মালো কেন? অঞ্চলে বয়েসে তিনি কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন, তাঁর কাব্যগ্রন্থটি খুবই দুর্লভ, তাঁর রচনাগুলীতে কিছু কিছু কবিতার নমুনা আছে, সেগুলি নিতান্তই অকিঞ্চিত্কর, তার মধ্যে প্রতিভা কিংবা বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন নেই। তারপর সুনীর্ধকাল সাহিত্যজগতের সঙ্গে তাঁর কোনও সংস্রব ছিল না। ‘বিনোদিনী’ গ্রন্থটির আগে তাঁর দু’ চারটি গল্প পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে বটে, কিন্তু তাও প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিয়ে। এমনকী প্রথম গল্প প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া জাগাতেও পারেননি। ‘কালি-কলম’ পত্রিকার সম্পাদক মুরলীধর বসুর সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ থেকে জানতে পারা যায়, প্রথম দিকে তাঁর অনেক রচনাই ফেরত আসত, সম্পাদকের নির্দেশে গল্পের কিছু কিছু অদল বদল করে নতুনভাবে লিখতে হত। প্রথম গল্প-গ্রন্থ ছাপার জন্যও তিনি প্রকাশক পাননি, বোলপুরের এক সহদয় ব্যক্তি খরচ দিয়েছিলেন, সেই বইয়ের তিরিশ-পঁয়তিরিশ কপির বেশি বিক্রি হয়নি, বাকি কপিতে ধূলো জমেছে।

তবু তিনি সাহিত্যকেই অবলম্বন করে রইলেন কেন? ‘গল্প কেন লিখিলাম?’ এই নামে জগদীশচন্দ্রের একটি রচনা আছে। তাতে তিনি কৈফিয়ত দিয়েছেন যে, তাঁর স্তুর তাড়না থেকে বাঁচার জন্যই তিনি কলম ধরেছেন। তাঁর স্তু তাঁকে চুপ করে বসে থাকতে দেখলেই হাতে একটা পয়সা দিয়ে বলতেন বাজার থেকে ধনে কিংবা কাঁচালঙ্ঘ কিংবা পান কিংবা সোজা কিংবা মৌরি কিনে আনতে। অনবরত বাজারে

ছোটা এবং বড়য়ের ফরমাশ খাটা এড়াবার জন্যই তিনি কলম হাতে নিয়ে লেখার ভান করতেন। ভান করতে-করতে একদিন গল্প লিখে ফেললেন। এটা বেশ একটা ভাল ধরনের রসিকতা, কিন্তু সত্যিকারের আত্ম-উদ্ঘাটন নয়। লেখকরা সাধারণত তাঁদের প্রেরণার গৃহ সত্যটি বলতেও চান না। অন্তরের তাগিদ, নিজেকে প্রকাশ করার যত্নণা কিংবা সাহিত্যে নতুন কিছু সংযোজনের বাসনা, এ সবই গালভরা বা আজ্ঞাভৰিতার মতন শোনায়। ‘কেন লিখি’ এই প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ লেখকই ঠাণ্ডা-ইয়ার্কি করে উত্তিরে দেন। সৈয়দ মুজতবা আলি অনেকবার স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন, লিখি শুধু টাকার জন্য ! আমরা জানি, তাঁর ক্ষেত্রেও এই উত্তর একেবারেই সত্য নয়।

একজন মহৎ লেখকের গুপ্ত সাহিত্য প্রতিভা হঠাৎ ফেটে বেরিয়েছে, ‘বিনোদিনী’ পড়লে সে কথাও মনে হয় না। গল্পগুলি গল্প হিসেবে বেশ দুর্বল। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই বাংলা ছোটগল্পের আঙ্গিক যথেষ্ট উন্নত, উপন্যাসের তুলনায় ছোটগল্পতেই প্রতিভাবান লেখকরা পরম্পরের সঙ্গে স্পর্ধা করছেন, কিন্তু জগদীশ গুপ্ত সেই আঙ্গিক আয়ন্ত করতে পারেননি। আমার মনে হয়েছে, সেগুলি ছোট গল্পের বদলে যেন উপাখ্যান। কিছু কিছু রোমাঞ্চক ঘটনা কেউ কেউ যেমন মুখে বর্ণনা দিয়ে চমকে দেয়, তার নিজের অভিজ্ঞতাও নয়, শোনা কথা, সেই ধরনের। ‘পল্লী শ্রান্ত’ গল্পটির গঠনেও সেই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে তার গ্রামের বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করায় বন্ধুটি বলল, গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ আর নেই, সবাই ছেড়ে চলে এসেছে। কারণ হিসেবে সে একটি কাহিনী বিবৃত করল। দেশের সেই বাড়িতে এক সময় থাকত গুটিপাঁচেক বিধবা, এক অথবা বৃন্দ ও একটি কিশোর। এর মধ্যে আসাম থেকে এক আঘীয়া এলেন শরীরে নানারকম রোগ নিয়ে। গ্রামে ডাক্তার নেই, সুতরাং সেই অসুস্থ বৃন্দটিকে মরতে হল-শিগগিরই। মৃত্যুতেও সে এই পরিবারটিকে বিপদে ফেলে গেল। শ্রান্তে নিয়ে গিয়ে শবটিকে দাহ করা হবে কীভাবে, তাও আবার ব্রাহ্মণের শব ? কাছাকাছি প্রতিবেশীরা সবাই মুসলমান। এক সময়ে হিন্দু-মুসলমানে যথেষ্ট মেলামেশা ছিল, পরম্পরের বিপদে-আপদে সহায়তার জন্য এগিয়ে আসত। ছাবিশ সালের দাঙ্গার পর যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনীতি শুরু হয়ে গেছে, ওই হিন্দু বিধবারা তা জানেন না। কিশোরটিকে বারবার পাঠানো হল মুসলমান পাড়ায়। মুসলমানরা সবাই একবাক্যে বলে দিল, তারা হিন্দুর মড়া ছেঁবে না, কাঠ দিয়েও সাহায্য করবে না। এ দিকে মড়া বাসি হয়ে যাচ্ছে। অতি কষ্টে কিশোরটি দূর গ্রাম থেকে কয়েকজন আঘীয়কে ডেকে আনল, তারা মৃতদেহটি শ্রান্তে নিয়ে গেল বটে, কিন্তু নমো নমো করে কোনওক্রমে শুধু মুখে আগুন দিয়ে আর পুরো পোড়াবার ধৈর্য থাকল না তাদের। বালির বস্তা বেঁধে সেই শব ডুবিয়ে দেওয়া হল নদীতে। বালির বস্তাটার মুখ বাঁধা হয়নি ভাল করে, একটু একটু করে ঝরে গেল সব বালি, দু’ দিন পরে ভেসে উঠল শব। সেই বিধবারা ঘাটে গিয়ে দেখল, ব্রাহ্মণের লাশ শুক্ল-শেয়াল-কুরু-কাকেরা মিলে বাটাপাটি, কামড়াকামড়ি করে ছিড়ে ছিড়ে খাচ্ছে। তারপরেই অসহায়, সন্ত্রিপ্ত পরিবারটি গ্রাম ছেড়ে পালালো। এটা একটা বীভৎস পল্লীচিত্র হতে পারে, কিন্তু এটা কি গল্প ?

‘দিবসের শেষে’ নামে গল্পটি আরও বিচ্ছিন্ন। এটাও যেন পুরনো আমলের মাসি-পিসিদের গালগল্পের মতন। সাধারণত এই সব গল্প আরম্ভ হয় এইভাবে: শুনেছিস, অমুক গ্রামে একবার কী হয়েছিল? সেইরকমই, এক গ্রামে একটা ছেটা নদীর ধারে রতি নামে এক নাপিতের বাড়ি। তার স্ত্রী নারায়ণী তিনটি মৃত সন্তান প্রসব করার পর অনেক পুজো-আচ্চা, তাগা-তাবিজ ধারণ করে আর একটি ছেলের জন্ম দেয়, তার নাম পাঁচু। এই পাঁচুকেও অনেক মাদুলি-কবচ পরিয়ে সাবধানে রাখা হয়, সে বাবা-মায়ের বড় আদরের। এই পাঁচু একদিন সকালবেলা ঘূম থেকে উঠেই বলল, ‘মা, আজ আমায় কুমিরে নেবে।’ এ কথা শুনে মায়ের মন আশঙ্কায় কেঁপে উঠলেও রতি নাপিত রেগে উঠল, এটা একটা অসম্ভব কথা। তাদের এই ছেটা নদীতে কেউ কোনওদিন কুমির দেখেনি, কুমির আসার কোনও প্রশ্নই উঠে না। এই নদী সন্ধিদায়ীনী জননীর মতন দয়াময়ী।

কথাটা রটে গেল সারা গ্রামে। বাবুরা কুমিরের কথা শুনে ঠাট্টা করলেন। রতি নাপিতও জেদ ধরে ছেলেকে নিয়ে পুরুরে স্বান করতে গেল। কিছুই ঘটল না। বাড়ি ফেরার পর বাবা, মা, এমনকী পাঁচুর মুখেও হাসি ফুটল। সেদিন বিকেলে পাঁচু তার অন্য বন্ধুদের সঙ্গে একটা কাঠাল চুরি করে থেতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল মায়ের কাছে। কাঠালের আঠায় তার সারা শরীর মাখামাখি। এ বাড়ির সব জল-কাজই নদীতে। মা আবার ভয় পাচ্ছে বলে বাবাই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গেল সারা শরীর ধোয়াতে। তখন সঙ্গে হয়ে এসেছে। বাবার কাছ থেকে একটু দূরে সরে গেছে পাঁচু, এমন সময় তার সামনে ভেসে উঠল কালাস্তক যমের মতো এক বিশাল কুমির। রতি নাপিত ফিরে তাকাবার আগেই কুমিরে নিয়ে গেল পাঁচুকে। গল্পটি যেন নিয়তি নামে কোনও দেবীর পাঁচালির অংশ, যদিও অলীক কুমিরের বর্ণনা ব্যঙ্গনাময়।

‘ভো-সুখে’ গল্পে একটি বড় একান্নবর্তী পরিবারের জননী অনেকদিন অসুস্থ। এক সময় তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে সবাই খুব খুশি। তখন সমস্ত ছেলে, বউ, নাতি, নাতনি, নাতবউরা ঠিক করল, মা সেরে ওঠা উপলক্ষে সবাই কিছু না কিছু রাখা করে মাকে একটু করে খাওয়াবে। যেদিন সবাই এরকম একটা আনন্দভোজের ব্যবস্থা করে যখন মাকে খাওয়ার জন্য ডাকতে এল, মা তখন চিরকালের জন্য চোখ বুজেছেন।

‘এইবার লোকে ঠিক বসে’ গল্পে শিবপ্রিয় নামে এক গ্রাম্য নির্বাধকে সুখে থাকতে ভূতে কিলোল। সোনা বানাবার আশায় সে এক ধোঁকাবাজ সম্মাসীর পালায় পড়ে ঘর ছাড়ল। সর্বস্বাস্ত হয়ে ফিরে এসে সে তার পরিবারের সর্বনাশ সামলাতে পারল না, সে নিজেও পাগল হয়ে গেল। ‘পুরাতন ভৃত্য’ গল্পটির নাম রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে নেওয়া হলেও এখানে এক অতি বিশ্বাসী ভৃত্য একদিন নির্জন মাঠে প্রভুর গায়ে ছুরি মেরে অনেক টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল। শুধুই এইটুকু কাহিনী। ‘...পয়োমুখম’ কাহিনীটি কিপ্পিৎ বড়, এক কবirাজ টাকার লোভে তার ছেলের বিয়ে দেয়, আর একটার পর একটা পুত্রবধু মেরে ফেলে। এখানে যেন এক মাসিয়ে ভার্দু শ্বশুরের ভূমিকায়। ‘প্রলয়করী মষ্টী’ গল্পে সদু খাঁ নামে এক গ্রাম্য বদমাশ হঠাৎ ধনী হয়ে উঠে সুন্দরী মেয়েদের হরণ করতে শুরু করে। জসিম নামে এক গরিব চাষীর বউকে সে

আটকে রাখে নিজের বাড়িতে। অর্জুন নামে এক ডাকাবুকো নমঃশূদ্র এই ঘটনা শুনে খেপে যায়, জসিমকে সাহায্য করার জন্য সে দলবল জোগাড় করে। সদু খাঁর গুণ্ডাবাহিনীর সঙ্গে অর্জুনের দলের লড়াই হল জোর, এতে অর্জুন-জসিমরাই জয়ী হল। কিন্তু জসিম তবু তার বিবিকে ফেরত পেল না, কারণ সে নিজেই আসতে চায় না।

এগুলিকে নিটোল ছোটগল্ল বলা যায় না, সার্থক সাহিত্য হিসেবে আখ্যা দেওয়াও মুশকিল। তবু জগদীশ গুপ্তর এই পাঠক-বক্ষিত গল্ল-গ্রন্থটি সমালোচকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল। এমনকী এতকাল পরেও এই গল্লগুলি যারা প্রথম পড়বে, পড়তে পড়তে তাদের জ্ঞ কৃপ্তিত হবেই। লেখকের ভাষা বারবারে, গতিশীল, নির্লিপ্তভাবে তিনি পরপর মানুষের অসাধুতা, কল্যাণ, পাপ, নির্মতা, সর্বনাশ ও নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণের কথা লিখে যাচ্ছেন। সুস্থতা, সৌন্দর্যবোধ, প্রেম, আত্মদান, সাধারণত যে সব বিষয় সাহিত্যের উপজীব্য, সেগুলিকে তিনি একেবারেই পরিহার করে গেছেন। একজন লেখক পরপর শুধু মানুষের জীবনের খারাপ দিক ও পরাজয়ের কথাই লিখে যাবেন, এও কি সম্ভব? এ বিষয়ে আমাদের কোনও পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই বলেই এই লেখক সম্পর্কে আমরা বিস্মিত হই, কিছুটা বিরক্তও বোধ করি, গল্লগুলি আমাদের পছন্দ হয় না, তবু আমরা এই লেখক সম্পর্কে আকর্ষণ বোধ করি। আমরা বুঝতে পারি, এই লেখক সাহিত্যে এক সম্পূর্ণ নেতৃত্ব রস আনছেন, যাকে উচ্চত রস বললেও ঠিক বলা হয় না, মোহিতলাল যাকে বলেছেন উচ্ছ্বেষিততগ, যা অত্যন্ত অস্বস্তিকর হলেও অভিনব। সত্য-শিবসূক্ষ্মের একেবারেই তোয়াক্তা করছেন না একজন লেখক, এমনটি আর আহোমেখা যায়নি। অনেক লেখক প্রথানুগত ধারায় লিখে লিখে শেষ পর্যন্ত গতানুগতিক ও মাঝারি ধরনের হয়ে যান, কিন্তু জগদীশ গুপ্ত অনন্য।

একচল্লিশ বছর বয়েসে প্রথম গল্ল-গ্রন্থ, আর পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লঘু-গুরু'। এই গ্রন্থটিও উপন্যাস হিসেবে অসার্থক কিন্তু বিষয়বস্তুর জন্য বেশ আলোড়ন তুলেছিল। একটি বেশ্যা হতে চাইল গৃহবধূ, কিন্তু পুরুষ নামের কয়েকটি পাষণ্ড তাকে শাস্তি দিল না। তার নিষ্পাপ কল্যানির জীবন করে তুলল দুর্বিশ্ব। 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসটি এক বিবেকহীন তত্ত্বকের কাহিনী। আরও কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেছেন তিনি, পূর্ব প্রকাশিত ছোটগল্লকে পরে টেনে লম্বা করেছেন, কিন্তু তাঁর উপন্যাসগুলি খুবই দুর্বল, উপন্যাস পদবাচ্য হওয়ারই উপযুক্ত নয়। বরং আঙ্গিকের দিক থেকে তাঁর পরবর্তী ছোটগল্লগুলি অনেক উন্নত হয়েছে, ভাষা হয়েছে ধারালো, কিন্তু জেদীর মতন তিনি তাঁর নৈরাশ্যের দৃষ্টিভঙ্গি বদল করেননি কখনও। তাঁর ঢোখ সব সময় অশুভের দিকে, অশাস্তির দিকে। ক্রুরতার দিকে। কঁঠেল গোষ্ঠীর তরঙ্গ লেখকদের চেয়ে বয়েসে বেশ বড় ছিলেন জগদীশচন্দ্র, তবু তিনি ওই গোষ্ঠীভুক্ত হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সুরে মেলেনি, ভাবে মেলেনি। প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব-অচিন্ত্যকুমারেরা ছিলেন মূলত রোমাণ্টিক, তাঁদের ভাষা কাব্যগঙ্কী, তাঁদের যৌক্ত হৃদয় রহস্যের দিকে। রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে গিয়ে

তাঁরা বাস্তববাদকেও আশ্রয় করতে চেয়েছেন কখনও কখনও, কিন্তু সে বাস্তবের প্রতি দৃষ্টিতেও রোমান্টিকতার সুর্মা মাথানো। প্রেমের গল্পে তাঁরা এনেছেন শরীর, সেই শরীরে মিশিয়েছেন মোহময় আবেশ, কোনওরকম কর্দর্যতার স্থান নেই সেখানে। জগদীশচন্দ্র কিন্তু কাব্যের ধার ধারেন না, তার বাস্তবতা শুধু অবিচার আর বধ্বনায় ভরা, এমনকী অবিচারের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদও নেই। তাঁর চরিত্রগুলির হৃদয় নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই, আছে শুধু শরীর, অত্যন্ত চাঁচাছোলা ভাষায় তিনি বারবার বুঝিয়ে দিয়েছেন, নর-নারীর শারীরিক সম্পর্কের উর্ধ্বে আর কোনও সম্পর্ক হতে পারে না। তাঁর গল্পগুলির মধ্যে ‘শক্তি অভয়া’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মায়ের নাম অভয়া, মেয়ের নাম শাস্তি আর বাবার নাম অতুল। এই তিনটিই চরিত্র। এর মধ্যে বাবা আর তরুণী কল্যার মধ্যে খুব ভাব, মা যেন একটু বাইরে পড়ে থাকে। মা সেই জন্য ভয় পায়। ভয় পায়, আরও একটি কারণে, বাবা ও মেয়ের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু বড় বেশি খোলামেলা। মেয়েটি লেখাপড়া জানে, নাচতে জানে, বাবা মেয়েকে সব রকম প্রশ্ন দেয়। বাবা এস্বাজ বাজায়, মেয়েটি নাচে। বাবাকে সে হাজার প্রশ্ন করে, তার মধ্যে প্রেটোনিক লাভ, যৌনতা, পুরুষের বেশ্যার প্রতি আসক্তি—এ সবও এসে পড়ে। এই সব শুনে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকার কোনও মধ্যবিত্ত পরিবারের জননীর শক্তি হওয়ার কারণ থাকতেই পারত এবং বাবা-মা-মেয়ের সম্পর্কের জটিলতা নিয়ে হতেই পারত কোনও স্বাভাবিক গল্প, কিন্তু লেখক সেটাকে একটা আকস্মিক কুর আঘাতের দিকে নিয়ে যাবেন্তুরী গল্পের শেষে আচমকা মা মেয়েকে প্রশ্ন করল, বাবা তাকে শারীরিকভাবে নষ্ট করেছে কিনা! বিস্মিত মর্মাহত শাস্তির মুখের ওপর অভয়া আবার বলে দিলে অতুল তার বাবা নয়। একদিন বালিকা শাস্তিকে নিয়ে অভয়া কুলত্যাগ করেছিল অতুলের সঙ্গে। সুতরাং সেই ‘বেটাছেলে আর একটি মেয়েছেলেকে’ নষ্ট করতে তো পারেই। জগদীশচন্দ্র যেন প্রতিটি গল্প লেখার আগেই প্রতিষ্ঠা করে নিতেন, কিছুতেই তিনি নিষ্ঠুরতা, বধ্বনা ও ক্রেতে থেকে কোনও কাহিনীর উত্তরণ ঘটাবেন না। সেই যুগেও তিনি ঈশ্বর, ধর্মবিশ্঵াস বা শুভবোধের কোনও প্রসঙ্গই আনেননি কখনও। এও এক ধরনের বলিষ্ঠতা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘দিবারাত্রির কাব্য’-এর তিনটি চরিত্রের সঙ্গে এই তিনটি চরিত্রের যেন কিছুটা সাদৃশ্য আছে, কিন্তু মানিকের কাহিনী অনেক জটিল এবং নিষ্ক একটা গোপন কথা প্রকাশেই শেষ হয় না।

জীবন জগদীশচন্দ্রকে বিশেষ কিছু দেয়নি। দারিদ্র্য ছিল নিত্যসঙ্গী। লেখার জন্য যত পরিশ্রম ও আয়ুক্ষয় করেছেন, তার বিনিময়ে পাননি প্রায় কিছুই। তবু লিখেছেন নিষ্ক লেখার আনন্দেই। একেবারে শেষজীবনে তাঁকে সরকারি মাসোহারাব ওপর নির্ভর করতে হত, সেটাও মোটেই সম্মানজনক নয়। তাই তাঁর প্রায় সব লেখাতেই প্রতিফলিত হয়েছে নৈরাশ্য ও নিয়তির কাছে পরাজয়ের ইঙ্গিত। আমার মনে হয়, শুধু দারিদ্র্যই এর কারণ নয়। তাঁর চরিত্রেই কোনও রোমান্টিকতা কিংবা আশাবাদ ছিল না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কোনও প্রতিবাদ তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়নি। তৎকালে অনেককেই মার্কসবাদ একটা মুক্তির পথ দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল,

জগদীশ শুণ্ডি মার্কিসবাদকে কেন অবলম্বন করলেন না সেটাও একটা বিস্ময়ের কথা।
নৈরাশ্যের প্রতিভূত হয়ে থাকাটাই ছিল যেন তাঁর অহংকার।

সাহিত্য রচনার বিনিময়ে অর্থপ্রাপ্তি কিংবা কোনও পুরস্কারের স্বীকৃতির সম্ভাবনা ছিল না জেনেও কিন্তু জগদীশ শুণ্ডি ভেবেছিলেন কোনও না কোনওদিন তাঁর এই রচনাগুলি মর্যাদা পাবেই। সেটাই ছিল তাঁর লেখার প্রেরণা। ‘শাস্ক কবিবাজের স্ত্রী’ নামে তাঁর গল্প-গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে তিনি ভবভূতির ‘কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃষ্ঠী’ এই শ্লোকটি উদ্ঘার করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভবভূতির এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাটি কিন্তু সার্থক হয়নি। তাঁর এই শ্লোকটিই লোকে মনে রেখেছে, তাঁর অন্য রচনা বিশেষ কেউ পড়ে না। জগদীশচন্দ্রকে অবশ্য নিরবধিকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি, জীবদ্ধশাতেই তিনি সমালোচকদের মনোযোগ পেয়েছেন যথেষ্ট। অনেকে বলেন, জগদীশচন্দ্র কখনও জনপ্রিয় হননি। কথাটা ঠিক কি? আমাদের দেশে ‘জনপ্রিয়’ শব্দটির অর্থ বেশ গোলমেলে, অনেক ক্ষেত্রে খুবই লম্ব। বই বেশি বিক্রি হওয়া আর জনপ্রিয়তা কি এক? রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে কে বেশি জনপ্রিয়? শরৎচন্দ্রের বই বিক্রি আজও প্রচণ্ড, সেই তুলনায় রবীন্দ্রনাথের বিক্রি বরাবরই কম। অনেক লেখকের বই প্রচুর বিক্রি হয় কিন্তু সাহিত্য আলোচনায় তাঁদের নাম ওঠে না, আবার অনেক লেখকের বই তেমন বিক্রি হয় না, কিন্তু তাঁদের নাম লোকের মুখে মুখে ঘোরে। জগদীশচন্দ্রেরই সমসাময়িক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের বই প্রচুর বিক্রি হত। এখন তাঁর নাম অনেকের মনে পড়ে নায়। অর্থাত বাংলা সাহিত্যের যে-কোনও আলোচনায় জগদীশচন্দ্রের নাম অবধারিত।

অন্যান্য দিকে বঞ্চিত হলেও জগদীশচন্দ্রের সমালোচক-ভাগ্য ভাল। মোহিতলাল মজুমদার ও অধ্যাপক অনিলকুমার রায় বছদিন আগেই তাঁর রচনাগুলির সঠিক বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা জগদীশচন্দ্রকে মাথায় তোলেননি, তাঁর দোষ-ক্রটি দেখিয়ে তাঁকে ভিস্ত রসের উদ্গাতা হিসেবে সাহিত্যের অঙ্গনে একটি নির্দিষ্ট আসন দিয়েছেন। ক্রমে সমালোচকদের সুর বদলাতে থাকে। কেউ বললেন, ‘জগদীশ শুণ্ডের সোনার লেখনী’, কেউ বললেন তিনি ‘শরৎচন্দ্রের প্রতিভার মানসপুত্র’, কেউ বললেন, তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বসূরি বা মন্ত্রণুরু। এ সবই নিতান্ত অতিশয়োক্তি।

এখানে আমাদের দেশের সমালোচকদের সম্পর্কেও দু’একটা কথা বলা দরকার। অনেক সমালোচকই বিশেষ একজন কোনও লেখক সম্পর্কে আলোচনা করার সময় সাহিত্যের পূর্ণ পরিপ্রেক্ষিতটা মনে রাখেন না। একজন কোনও লেখককে প্রশংসা করার সময় অনেকে অন্যান্য সমসাময়িক লেখকদের নস্যাং করে থাকেন, যা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। একজন লেখককে বড় করার জন্য অন্যদের ছোট করার কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ সাহিত্য দৌড়-প্রতিযোগিতা নয়। সুকুমার সেন মহাশয় জগদীশচন্দ্রকে বড় করে দেখাবার অভিপ্রায়ে তাঁর সমসাময়িক অন্য আধুনিক লেখকদের প্রতি তাছিল্য দেখিয়েছেন। এতে সন্দেহ হয়, উক্ত পশ্চিত আধুনিক সাহিত্যের সঠিক পাঠ নিয়েছিলেন কিনা। কোনও কোনও সমালোচক আস্তার ডগ খোঁজেন। তাঁরা আবিষ্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চান। তাঁরা বেছে বেছে, খুঁজে

খুঁজে এমন একজন লেখককে তুলে ধরেন, যিনি বহুল প্রচারিত নন, যাঁর গ্রন্থগুলি দুর্লভ। এরকম কোনও লেখককে সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে আনার চেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু তাঁর রচনাকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করে তাঁকে এক চমকপ্রদ গুপ্তধন হিসেবে প্রতিপন্ন করা সমালোচকদের আত্মবিজ্ঞাপনের পর্যায়ে পড়ে। সেই সব সমালোচক যেন বলতে চান, দেখো, এতদিন তোমরা কেউ একে চিনতে পারোনি, আমি চিনিয়ে দিছি। আমি কত বড় বোন্দা! আন্দার ডগ হিসেবে বিবেচিত যে-লেখক কতিপয় সমালোচকের দ্বারা বাড়াবাড়ি রকমের প্রশংসিত হন, তাঁর আসলে অপমানিত বোধ করাই কথা।

জগদীশ গুপ্ত একজন মহৎ কিংবা অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লেখক নন। শরৎচন্দ্রের ধারার লেখক তাঁকে বলা যায় না, কারণ শরৎচন্দ্রের মতন আবেগ কিংবা চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা তাঁর ছিল না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বসূরি কিংবা মন্ত্রগুরু হিসার কোনও যোগ্যতাই তাঁর নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জগদীশচন্দ্রের চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট হলেও এঁরা দু'জনেই সমসাময়িক লেখক। জগদীশচন্দ্রের প্রথম গল্প সামুহিক ‘বিজলী’ পত্রিকায় ছাপা হয় ১৯২৫ সালে, আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প ‘বিচিত্রা’ মাসিক পত্রে ছাপা হয় এর মাত্র তিন বছর বাদে। জগদীশ গুপ্ত রচনা শুরু করেন প্রৌঢ় বয়েসে, আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তখন নিজাতই কলেজের ছাত্র, গল্প লিখেছিলেন বঙ্গদেশের সঙ্গে বাজি ফেলে। জগদীশচন্দ্রের প্রথম গল্প ‘পেয়ং গেস্ট’, গল্প হিসেবে অতি তুলুজ, আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প ‘অতসী মামী’। যে গল্প প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে লেখকের প্রতিভা চেনা যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু কিছু গল্পে নিষ্ঠারিত ও কুরুতা খানিকটা প্রাথম্য পেলেও তাঁর সাহিত্যের মূল সুর মানবতাবাদ। উভয়কালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক প্রতিবাদী ভূমিকা নিয়েছিলেন তো বটেই প্রথম দিকেও যে-কোনও লেখাতেই বিশেষ একটা চরিত্রের প্রতি থাকত তাঁর সহানুভূতি।

এই সহানুভূতি ব্যাপারটাই যেন জগদীশচন্দ্রের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজানা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় ঈশ্বরের স্থান নেই, কিন্তু শয়তানকেও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় মেনে নেননি। জগদীশ গুপ্ত ধর্মীয় সংস্কারকে দূরে সরিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু নিয়তির প্রতি আস্থাও এক ধরনের অঙ্গ সংস্কার।

জগদীশ গুপ্ত মূল ধারার থেকে একেবারে আলাদা, তিনি অন্য কানুর মতন নন, সেই কারণেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর অধিকাংশ রচনাই সাহিত্যের উচ্চ পর্যায়ে ওঠেনি, তবু অভিনবত্বের জন্যই তিনি স্মরণীয়।

জগদীশচন্দ্রের সমালোচকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও একজন। জগদীশচন্দ্র তাঁর প্রথম গল্প-গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ উন্নত দিয়েছিলেন সংক্ষিপ্ত, দায়সারা প্রশংসাপত্রে। পয়োধি দই কিংবা দিশি কোম্পানির তৈরি ফাউন্টেন পেনের কালি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে-রকম সার্টিফিকেট দিতেন, কিছু কিছু তরফনের রচনা সম্পর্কেও সে রকম সার্টিফিকেট দেওয়ার অভ্যেস ছিল তাঁর। এ ছাড়া হয়তো তাঁর উপায়ও ছিল না, কত বই তিনি পড়বেন? কিন্তু জগদীশচন্দ্রের উপন্যাস ‘লঘু-গুরু’

পেয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যে দীর্ঘ সমালোচনা লিখেছিলেন, সেটি সত্যিই বিশ্ময়কর। যে উপন্যাসটির সাহিতামূল্য বিশেষ নেই, সে বইটি নিয়েও রবীন্দ্রনাথ অনেকখনি সময় ব্যয় করেছেন। জগদীশচন্দ্র অবশ্য এ সমালোচনা একেবারেই পছন্দ করেননি, এর একটি উত্তরে রবীন্দ্রনাথকে রীতিমত অসম্মান জানিয়ে তিনি লিখেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের এ ‘জজিয়তি বিপথগামী’ এবং এর মধ্যে ‘অভদ্র হল’ ফোটানো হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ওই সমালোচনাটি আমি আগে পড়িনি। সম্প্রতি পাঠ করে দেখলাম, রবীন্দ্রনাথ এমন বিশুদ্ধ সমালোচনা খুব কমই লিখেছেন, তাঁর সঙ্গে একমত না হয়ে পারা যায় না। এই উপন্যাসের লেখককে একটুও নিন্দে করেননি রবীন্দ্রনাথ, কাহিনী ও চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন তন্মতবাবে। এক বাজারের বেশ্যা কিংবা কয়েকটি ব্যক্তিচারী ব্যক্তির কাহিনী বা বিষয়বস্তুকেও আক্রমণ করেননি রবীন্দ্রনাথ, বরং বলেছেন, হ্যাঁ, এই সব নিয়েও সাহিত্য হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মূল আপন্তি বাস্তবতা সৃষ্টির নামে অবাস্তবতা নিয়ে বাড়াবাড়ি। লঘু-গুরু উপন্যাসের চরিত্রটি একেবারেই অবাস্তব। প্রথমে মনে হয়েছিল উন্মম নামের গণিকাটি এক সাধারণ দেহোপজীবিনী, পরে জানা গেল, সে শুধু রূপসীই নয়, সে যথেষ্ট লেখাপড়া জানে, উপন্যাস পড়ে, প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারিণী, উচ্চ রুচি, রঞ্জন পটীয়সী, আরও গুণের শেষ নেই। এমন একটি রমণী ক্ষেত্রে গামের গঞ্জের বেশ্যা হয়, তার কোনও ব্যাখ্যা নেই, এ চরিত্র একেবারেই বাস্তবতার ধার ধারে না। এই উপন্যাসটি উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে রিয়েলিজ্ম সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা আজও প্রণিধানযোগ্য। দুটি মন্তব্য উক্তাব করছি: “রিয়েলিজ্মের নাম দিয়ে একালের শৌখিন আধুনিকতাকে খুশি করা সহজ। যেটা সহজ, সেটাই তো আর্টের বিপদ ঘটায়। দেশাভিমানকে রচনায় প্রশ্ন দিয়ে কালবিশেষে মোহ উৎপাদন করা সহজ, এই জন্যই দেশাভিমানী কাব্যে, গল্পে আর্ট জিনিসটা প্রায়ই বেকার হয়ে থাকে।” অনেক লেখায় মাটির গন্ধ খুঁজে আমরা উল্লিঙ্কিত হই, সে সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় মন্তব্য, “বঙ্গ বিভাগের সময় দেশি চিনির চাহিদা বেড়ে উঠল। ব্যবসায়ীরা বুঝে নিলে, বিদেশি চিনিতে মাটি মিশিয়ে দেশি করা সহজ। আগুন জ্বালিয়ে রসে পাক দেওয়া অনাবশ্যক, কেননা রসিকেরা মাটির রং দেখলেই অভিভূত হবে। সাহিত্যেও মাটি মেশালেই রিয়েলিজ্মের রং ধরবে, এই সহজ কৌশল বুঝে নিতে বিলম্ব হয়নি।”

জগদীশ শুণ্ড বিশ্মৃত বা বিলুপ্ত লেখক নন, তাঁর বইগুলি দুষ্প্রাপ্য নয়। তবে তিনি কোনওকালেই সাধারণ পাঠকদের হৃদয় জয় করতে পারেননি, ইদানীং তিনি সমালোচক ও গবেষকদের গভীর মধ্যে আবদ্ধ। তবে যে-সব উৎসাহী পাঠক বাংলা সাহিত্যের সব রকম রসের স্বাদ নিতে চান, তাঁরা জগদীশচন্দ্র শুণ্ডের রচনাকে অবশ্যই পাঠ্যতালিকায় স্থান দেবেন। আমি নতুন করে তাঁর বইগুলি পড়ে দেখলাম, তাঁর স্টাইল একালেও পাঠ্যোগ্যতা হারায়নি। নিরঙ্গন চক্রবর্তীর সম্পাদনায় জগদীশ শুণ্ডের রচনাবলীতে বহু তথ্য সংযুক্ত হয়েছে, যা গবেষকদের কাজে লাগতে পারে,

কিন্তু রচনাবলীর সব লেখাগুলি পড়ার ধৈর্য পাঠকদের থাকবে কিনা সন্দেহ। উপন্যাসগুলি না পড়লেও চলে। বছর পনেরো আগে সুবীর রায়চৌধুরী জগদীশ গুপ্তর গল্পের একটি নির্বাচিত সংকলন প্রকাশ করেছিলেন, যাতে লেখক সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়েও যুক্ত হয়েছিল। এমন সুনির্বাচিত ও সুসম্পাদিত গ্রন্থ বাংলায় বিশেষ তো চোখে পড়ে না।

॥ ২ ॥

আমি জগদীশ গুপ্তকে কখনও চোখে দেখিনি। তিনি বেঁচে ছিলেন একাত্তর বছর, মৃত্যু হয় উনিশ শো সাতাম সালে। সেই সময়ে আমরা 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা প্রকাশ করছি, সেই পত্রিকাকে ঘিরে একটা বেশ বড় অতি তরণ লেখক গোষ্ঠী জড়ে হয়েছিল। আমরা বাংলা ছাপার অঙ্করে প্রকাশিত সব লেখাই তত্ত্বাত্মক করে পড়তাম, অতি বিজ্ঞাপিত লেখকদের চেয়ে অল্পভাত লেখকদের প্রতিই ছিল বেশি আকর্ষণ। কিন্তু সে সময়ে আমরা জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে তেমন অবহিত ছিলাম না। তিনি বেঁচে আছেন কিনা জানতাম না। তাঁর একটি দুটি উপন্যাস ও কিছু গল্প পড়া ছিল, কিন্তু তাঁর জীবনীর উপাদান এতই কম জানা ছিল যে, মনে হত, তিনি বুঝি কলোলেরও আগেকার লেখক, এবং কিছু কিছু সমালোচকের গ্রন্থ অনুযায়ী বিশ্বাস করেছিলাম যে তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বসূরি। সেই সময়ে জগদীশ গুপ্তর বইগুলিও সুলভ ছিল না, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণতায় তাঁর কলমও স্তুত হয়েছিল। জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুও হয় অনেকেরই অগোচরে। তিনি বামপন্থীদের দলে যাননি, বড় পত্রিকা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হননি, তাই তাঁকে নিয়ে বিশেষ কেউ উৎসাহ দেখায়নি। প্রতিষ্ঠান কিংবা প্রকাশক-পাঠকদের উদাসীন্য কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুছে দিতে পারেনি তাঁর নাম, বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন পাতা হয়ে গেছে।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ায়, জগদীশচন্দ্র যখন অস্তমিত, সেই সময় বাংলা গদ্য লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত নাম সতীনাথ ভাদ্রুড়ী। 'জাগরী' এবং 'চৌড়াই চরিত মানস' প্রকাশের পর প্রমাণিত হয়ে গেছে, ইনি একজন বিরল প্রতিভাবান উপন্যাসিক। আমি ছিলাম তাঁর অতি ভক্ত পাঠক, তাঁর প্রতিটি লেখা পড়েছি বারবার। মনে আছে, 'জাগরী' উপন্যাস পড়ার সময় এক দুপুরে আমি এমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেন্দে উঠেছিলাম যে আমার মা ভয় পেয়ে ছুটে এসেছিলেন রান্নাঘর থেকে। অশ্রবর্ধণ কিংবা চক্ষু সজল হওয়া সাহিত্য-শিল্প বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না তা জানি। কিন্তু যারা অন্য সময়ে, অন্য অনেক বিচ্ছেদে-বিপদে কাঁদতে পারে না, বই পড়ে কানাকাটি করাটা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। 'জাগরী' উপন্যাসে বিলু-বীলু মা-বাবার ভুল বোঝাবুঝির জন্যই আমি কেন্দেছিলাম। পৃথিবীর বড় বড় ট্র্যাজেডিগুলো যুদ্ধ-বিশ্বাস বা ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষের জন্যই ঘটে না, আসল ট্র্যাজেডি মানুষে মানুষে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝিতে।

আমরা সেই সময়ে 'কৃত্তিবাস' নামে পৃথক একটি গল্পের পত্রিকারও পরিকল্পনা

করেছিলাম, প্রথম সংখ্যায় চেয়েছিলাম সতীনাথ ভাদুড়ী ও কমলকুমার মজুমদারের গল্প। কমলকুমার গল্প দিয়েছিলেন, সতীনাথ ভাদুড়ী গল্প পাঠাননি, আমার চিঠিরও উন্নত দেননি। তখন ভেবেছিলাম, নিশ্চয়ই চিঠিতে ঠিকানা ভুল ছিল, নইলে আমাদের মতন ভক্তের ডাকে তিনি সাড়া দেবেন না কেন? অনেক পরে অবশ্য জেনেছি, ঠিকানা ভুল ছিল না, আমি পূর্ণিয়ায় গিয়ে ভাট্টাবাজারে খুঁজে বার করেছিলাম তাঁর বাড়ি। ততদিনে তিনি মৃত এবং তাঁর সাধের বাগান জঙ্গলাকীর্ণ। সেই বাগান ছিল তাঁর অসম্ভব ভালবাসার, বাগানটি বিষয়ে তাঁর ডায়েরিতে অনেক কথা পড়েছি, কালিদাসের কাব্য মিলিয়ে মিলিয়ে সহকার বৃক্ষের অর্থাৎ আমগাছের সঙ্গে তিনি মাধবীলতার বিবাহ দিয়েছিলেন। বিশ্বয়ের কথা এই যে, মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাঁর সেই অতি যত্নের বাগান এবং তাঁর রচনাবলী দুই-ই ধূলিধূসরিত হয়ে পড়ে।

প্রথম উপন্যাসের বিশ্বয়কর সাফল্য যেমন একজন লেখককে অনেকখানি সাহায্য করে, আবার কিছুটা ক্ষতিও করে। সতীনাথ ভাদুড়ী সারা জীবন জাগরী উপন্যাসের জন্যই চিহ্নিত হয়ে রইলেন। যদিও জাগরীর তুলনায় ‘টেঁড়াই চরিত মানস’ অনেক উচ্চাসের উপন্যাস, বিশ্ব সাহিত্যে এরকম নতুন আঙ্গিকের ও গভীর জীবনবোধের উপন্যাস বিরল, কিন্তু হিন্দি-বাংলা মিশ্রিত ভাষায় লেখা এ উপন্যাস বাঙালি পাঠকের সমাদর পায়নি। এই উপন্যাসের একটি তৃতীয় খণ্ড রচনা করার ইচ্ছে ছিল তাঁর, পরে তা থেকে নিরত হয়েছেন, এবং নিজেকেই প্রশংসন করেছেন, যদি বইটি বিক্রি হত, তা হলে কি তিনি আরও খণ্ড উন্নতোভূত টেঁড়াই চরিত মানস’ লিখতেন না?

সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য রচনার কাণ্ড মোটামুটি উনিশ বছর, জাগরী যখন ছাপা হয়, তখন তাঁর বয়েস চল্লিশ, তাঁর মৃত্যু হয় উনষাট বছর বয়েসে। ‘জাগরী’ লেখার আগে সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যোগাছিল কতটুকু? অনেকেই কবিতা দিয়ে শুরু করে। সতীনাথ সে রকম ভাবে কবিতা লেখেননি, দু'চারটি কবিতা কখনও বানিয়েছেন খেলাছলে, কিছু স্যাট্যারধর্মী লেখা লিখেছিলেন পত্রপত্রিকায়। যৌবনের অনেকগুলি বছর মগ্ন হয়ে ছিলেন রাজনীতিতে, জেল খেটেছেন বেশ কয়েকবার, তার মধ্যে সাহিত্যসাধনার সময় ছিল না। কিন্তু জীবিকা-অর্জন কিংবা রাজনীতিতে নেতৃত্ব দেওয়া তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল না, তিনি সাহিত্যকেই অবলম্বন করার চিন্তা করে রেখেছিলেন অনেক আগেই। তাঁর প্রস্তুতিপর্বের কথা কারুকে জানতে দেননি। জেলখানাতে বসে তিনি তাঁর শিশ্যপ্রতিম, প্রখ্যাত হিন্দি লেখক ফণীশ্বরনাথ রেণুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, এবার লিখতে শুরু করো, আর দেরি কোরো না, অভিজ্ঞতা যথেষ্ট সঞ্চিত হয়েছে, এ যেন তাঁর নিজের প্রতিও স্বগতোক্তি। তিনি নিজেও জেলখানায় বসেই প্রথম মন-প্রাণ ঢেলে লিখতে শুরু করেন। দেশ স্বাধীন হবার অঙ্গ কিছুদিন পরেই সংশ্বর ত্যাগ করেন রাজনৈতিক দলের। যেন তিনি বলতে চেয়েছিলেন, দেশ স্বাধীন করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য, দেশ শাসন করা অন্যদের কাজ। ফণীশ্বরনাথ রেণুর মুখে শুনেছি, সতীনাথ ভাদুড়ীকে বিহারের মন্ত্রী করার কথা ছিল, কিন্তু তিনি সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। সতীনাথ ভাদুড়ী মন্ত্রী হয়ে গেলে বাংলা সাহিত্যের যে কী অপরিমেয় ক্ষতি হত, তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়।

প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়ে, রাজনীতি থেকে সরে আসার অব্যবহিত পূর্ব সময় থেকে সাহিত্যকেই জীবনের অবলম্বন করবেন বলে যিনি ঠিক করেছিলেন, তিনি কিন্তু খুব বেশি লেখেননি, তাঁর মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা পনেরো, এর মধ্যে সাতখনি উপন্যাস, একটি ভ্রমণকাহিনী, একটি নাটক, বাকিগুলি গল্প। মোট ষাটটি গল্প লিখেছিলেন তিনি, কখনও কোনও পত্রিকার তাগিদে কিংবা সম্পাদকদের অনুরোধে লিখতেন না, লিখতেন শুধু নিজের ইচ্ছে হলে। আমাদের কৃষ্ণিবাসের জন্য সেই জন্যই তিনি লেখা পাঠাননি, বুঝতে পারি। তা ছাড়া, লিটল ম্যাগাজিনের লেখক ছিলেন না তিনি, বরাবর থেকেছেন পূর্ণিয়াতে, হয়তো কলকাতা থেকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনগুলির খবরও রাখতেন না। অবশ্য সাহিত্যকে জীবিকা করেননি তিনি, করার প্রয়োজন ছিল না, তবু তাঁর লেখা অনেকে পড়বে এটা নিশ্চয়ই চাইতেন, তাই বহুল প্রচারিত পত্রপত্রিকাতেই লেখা দিতেন। প্রথম দিকের দুটি উপন্যাস ছাড়া তাঁর অন্য সব উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে ‘দেশ’ পত্রিকায় এবং অনেকগুলি গল্প।

তাঁর প্রথম দিকের গল্পগুলিকে ঠিক ছোটগল্প বলা যায় না। প্রত্যেকটিই বেশ বড় আকারের গল্প, কোনও কোনওটিকে আজকালকার বিজ্ঞাপনের ভাষায় ‘উপন্যাসোপম’ বড় গল্প’ও বলা যেতে পারে। ছোটগল্পকে বাড়িয়ে উপন্যাস করার রীতি আছে আমাদের দেশে, আর সতীনাথ যেন ভূপন্যাসের নির্যাস নিয়ে এক একটি গল্প লিখেছেন। তাঁর ‘বন্যা’ নামের গল্পটি অন্যাসে একটি উপন্যাস হতে পারতো। বনফুল ‘কিছুক্ষণ’ নামে এই ধীরেই উপন্যাস লিখেছেন। সতীনাথের ওপর বনফুলের কিছুটা প্রভাব পড়া বিচ্ছি কিছু নয়, ক্ষীরণ বিহারের তৎকালীন দু'জন খ্যাতিমান বাঙালি লেখক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বনফুলের কাছে লাজুক সতীনাথ মাঝে মাঝে যাতায়াত করতেন। প্রস্থাবলীতে মুদ্রণের ক্রম অনুসারে তাঁর প্রথম ছোটগল্প ‘গণনায়ক’। এই গল্পটি আকারে যথেষ্ট বড় তো বটেই, চরিত্রের সংখ্যাও এত বেশি যে, ছোটগল্পের আয়তনে যেন ধরে না। চরিত্রগুলো সব ভালভাবে ফোটেওনি, ‘গণনায়ক’ বিখ্যাত হয়েছিল তাঁর বিষয়গুলে।

দেশের স্বাধীনতা লাভ করার আকাঙ্ক্ষায় শত শত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের আত্মত্যাগ, কারাবরণ, পুলিশের হাতে অত্যাচার ও ফাঁসির দড়িতে জীবনদানের অনেক গৌরবময় কাহিনী আগে লেখা হয়েছে, কিন্তু স্বাধীনতা পাবার সঙ্গাবনার মুহূর্ত থেকেই, ব্রিটিশ শাসন যখন আলগা হয়ে যায়, তখনই যে একশ্রেণীর নেতাদের মধ্যে স্বার্থ, লোভ ও মূনাফাবাজির খেলা শুরু হয়ে যায়, সে কথা সতীনাথই প্রথম লিখলেন। বিহার-বাংলার সীমান্তের কয়েকটি অঞ্চল উনিশ শো সাতচল্লিশের পনেরোই অগাস্টের দু’ তিনি দিন আগে ভারতে থাকবে না পাকিস্তানে যাবে, তা নিয়ে খানিকটা অনিশ্চয়তা ছিল, দু’ একবার উলটো ঘোষণা হয়েছিল। সেই সুযোগে এক স্থানীয় নেতা বিপন্ন মানুষদের জিনিসপত্র কিনে নিতে লাগলেন জলের দামে, শুরু করলেন চিনির কারবার, এমনকী হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের পতাকা নিয়ে ব্যবসা করতেও দ্বিধা করলেন না। শুরু হয়ে গেল স্বাধীন ভারতের নৈতিক অবনতির ইতিহাস।

‘বন্যা’ গল্পটি বেশ সরল। কাছাকাছি গ্রামের ব্রাহ্মণ, ভুইহার, সাঁওতাল ও মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি, ছুঁত্মার্গ ও কোন্দল লেগেই থাকে। বন্যায় যখন গ্রামগুলি ডুবতে লাগল তখন সবাই এক উচু জায়গায় আশ্রয় নিল। দেখা গেল তখন সব বিভেদ ঘূঁচে যাচ্ছে, আপৎকালীন আঞ্চলিক-স্বজনের মতন প্রত্যেকেই পরম্পরাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। তারপর বন্যার জল যখন কমে যেতে লাগল, জেঙে উঠল নোংরা, পচা-গলা সব জিনিস, ক্রেত, আর তখনই মানুষগুলোর মধ্যেও পুরনো হিংসে, স্বার্থপরতা, নীচতা ফিরে এল। এটাকে বলা যেতে পারে একটা আঘাতিক জীবনের খণ্ডিত্র, ছেটগল্পের দীপ্তি এর মধ্যে নেই।

সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রথম দিকের গল্পগুলির কাহিনীর মতন ভাষাও সরল, যেন অতিমাত্রায় সরল। সমসাময়িক গল্পকারদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় রয়েছে ঝকঝকে আধুনিকতা, সোফিস্টিকেশন, তারাশক্তরের ভাষার মধ্যে আছে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য। এমনকী জগদীশ গুপ্তের গল্পগুলি চাঁচাহেলা ধরনের হলেও কোথাও ঝংকারবছল, যেমন, “চতুর্থ দিন সন্ধ্যার সময় লক্ষ্মীর মনে হইল, বায়ুমণ্ডল যেন লতার তাড়সে ঢিড় খাইয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। বাড়ির অঙ্ককার যেন ঠিক অঙ্ককার নয়, বিশাল পক্ষ একটা পক্ষী বাড়ির এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ডানায় ঢাক্কিয়া ও অগণ্য আনাগোনার একটি মড়য়স্ত্রের উপর হৃমড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে—সেখনেন উঠি উঠি করিতেছে; সে উঠিয়া গেলেই ষড়যন্ত্রকারীরা ভগস্তুপ ক্রিমির মতন পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িবে।...” (ভূষিত আঘা)

এই তুলনায় সতীনাথের গদ্য, ‘মিয়ারের বাড়ির মেয়েরা অন্য ভদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েদের জন্য উঠোনে ভাত রাঁধিতেছেন। এক প্রতিবেশিনী সাহায্য করিতেছেন। আঙিনার আর এক স্থানে দুইটি মুসহর স্ত্রীলোক ইট দিয়া উনুন ধরাইতেছে। তাহারা আজ আবার ঘোমটা দিয়াছে।’’ (বন্যা)

এই বর্ণনায় একটা ছবি ফুটছে বটে, কিন্তু গদ্য যেন এলানো। প্রতিটি বাক্যের শেষে প্রায় একই রকম ক্রিয়াপদ, বাংলা গদ্যের রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু সতীনাথ পড়াশুনো করে লেখক, দেশ বিদেশের সাহিত্য বিষয়ে কৃতবিদ্য, তিনি প্রতিটি লাইন ভেবেচিষ্টে লিখবেন, এটাই স্বাভাবিক। সারল্যও একটা স্টাইল। পড়ার সময় চতুর শব্দ যাবহারে হোঁচ্চি খেতে হবে না, লেখকের স্টাইল একেবারে বোঝা যাবে না, এমন সারল্য আনা আসলে খুব শক্ত। সতীনাথ সম্ভবত সেই দিকেই এসেছিলেন, তাঁর পরের দিকের গদ্যে আছে স্তুক নির্মলতা, যার শ্রেষ্ঠ নির্দর্শন ‘সত্য অমগ কাহিনী’তে।

প্রথম দিকের গল্পগুলিতে সতীনাথের ঝোঁক ছিল কাহিনীর নতুনত্বের দিকে। কখনও লিখছেন অতি সাধারণ গ্রাম্য মানুষের কথা, কখনও কাহিনী চলে যাচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার ইনকাদের ইতিহাসে, কখনও আধুনিক লক্ষনে। গল্পগুলি পড়তে পড়তে আমরা বুঝতে পারি, এই লেখকের মানসিকতায় ক্রোধ, তিক্ততা, নৈরাশ্যের কোনও স্থান নেই, জীবন যেমনভাবে বয়ে চলেছে, তাকে তিনি অবিকল সেইভাবে দেখাতে চান, তার মধ্যে খুব চাপাভাবে মিশে থাকে তাঁর মনু শ্লেষ এবং কৌতুক। তাঁর

এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প মনে হয়, 'আন্টা বাংলা'।

নীলকর সাহেবদের প্ল্যান্টার্স ফ্লাব সাধারণ লোকের মুখে মুখে হয়ে যায় আন্টা বাংলা। নীলকর সাহেবদের তখন এমনই প্রতাপ যে, সরকারি সাহেবদেরও তারা গ্রাহ্য করত না। নেটিভদের প্রবেশ অধিকার ছিল না সেই ফ্লাবের ত্রিসীমানায়। কুল-কামিনদের দিয়ে অবশ্য কাজ করাতে হত। ফ্লাবের সেক্রেটারি বেঞ্চামিনের প্রথম মেজাজ। এক রবিবার বেঞ্চামিন ফ্লাবের বার কুম্হটি নতুন করে তৈরি করাবে, কিন্তু বিরসা ওরাও নামে মজুরটি ঠিক সময় এসে পৌছয়নি। বিরসা এক নগণ্য ভূমিদাস। তাকে খেত থেকে ধরে আনা হল, তাকে এক পান্ত্রী বলেছিল, রবিবারে কাজ করতে নেই। এই অপরাধে বেঞ্চামিন তাকে প্রথমে একটা কাঁটাভরা লতা দিয়ে চাবকালো, তারপর রক্ষাকৃ বিরসাকে প্রচণ্ড রোদুরের মধ্যে দাঁড় করিয়ে তার মাথায় ইট চাপিয়ে দিতে বলল তারই পুত্রবধুকে। পুত্রবধু মোট ছ'খানা ইট দিয়েছিল, সাহেব ছমকি দিয়ে আরও দু'খানা ইট চাপালো। মাথায় আটখানা ইট নিয়ে বিরসা দাঁড়িয়ে রইল সূর্যের দিকে মুখ করে। কোনও প্রতিবাদ নেই। শাস্তি দেওয়া যেন সাহেবদের জন্ম-জন্মান্তরের অধিকার। সাহেবেরা চাবুক মারবে, লাথি মারবে, তাদের মেয়েদের ইচ্ছেমতন ভোগ করবে, কখনও দয়া দেখিয়ে এক টুকরো পাউরটি ছুঁড়ে দেবে, এ রকমই তো চলে আসছে। এমনকী কোনও এক সময় তার পুত্রবধু যখন চুপি চুপি এসে মাথা থেকে কয়েকখানা ইট কমিয়ে দেবান্তর কথা বলে, তাতেও রাজি হয় না বিরসা।

এক সময় সেই ইটসুন্দু মাটিতে পড়ে গেল বিরসা, তার আর জ্ঞান ফেরেনি। এই এলেবেলে লোকটা যেহেতু ছিল ক্রিস্টিয়ান, তাই এক সহস্র বুড়ি মেম তার কবরের ওপর ফলক বাঁধাবার খরচ দেয়। বিরসার নাতির হাতে একটা টাকা গুঁজে দেয় মিষ্টি খাবার জন্য। তাতেই পুত্রবধু ও নাতি অভিভূত।

বিরসার নাতির নাম বোটরা। তার বাবা নিরুদ্দেশ, ঠাকুর্দাকে সে খুব ভালবাসতো। সেই ঠাকুর্দাকে সে হারালো। মাঝে এক সাহেবের রক্ষিতা হয়ে গেল, বোটরা নিজে টেনিস বল কুড়োবার চাকরি পেল। বোটরার মনে কোনও কিছুই রেখাপাত করে না, বেঁচে থাকাটাই তো বড় কথা। মূল গল্পটি এই বোটরারই জীবনকাহিনী। সে ক্রমশ বড় হয়, আন্টা বাংলাও বদলাতে থাকে। কৃত্রিম নীল আবিষ্কারের ফলে নীলকর সাহেবেরা ব্যবসা গুটিয়ে চলে যেতে শুরু করে। ফ্লাবটা চলে টিম টিম করে, তবু বোটরা সেখানেই থেকে যায়। অন্য কোথাও চাকরির ডাক পেলেও সে যায় না। সে দিনরাত মদ খায় আর বার কুম্হটায় শুয়ে থাকে, অন্য কিছু মনে না থাকলে, সে প্রতি বছর ঠাকুর্দার মৃত্যুদিনটায় ঠাকুর্দার কবরে ফুল দিতে যায়। বিরসাকে আর সবাই ভুলে গেলেও তার এই মাতাল নাতিটা ঠিক মনে রেখেছে। বোটরা মাঝে মাঝে লক্ষ করে, এখনকার মজুররা মাথায় ছ'খানা করে ইট নিয়ে যায়, আটখানা নয়। ফ্লাবটির আরও অধঃপতন হতে হতে উঠেই যায় এক সময়, সে বাড়িটাকেও ভেঙে ইট-কাঠগুলো বিক্রির প্রস্তাব ওঠে। বোটরা এর মধ্যে গাড়ি চালানো শিখে নিয়েছে, ড্রাইভারের চাকরি পেয়েছে, কিন্তু ওই জায়গাটা ছেড়ে সে

কিছুতেই যাবে না। অথচ এবার তাকে যেতেই হবে। শেষবারের মতন ঠাকুর্দার কবরে ফুল দিয়ে আসে বোটরা, তারপর গাড়ির অ্যাকসিডেন্ট করে সে ওই ভূতপূর্ব আটা বাংলার সামনেই মারা যায়। সামনের নতুন তৈরি রাস্তাটার গোটা আঢ়েক ইট খসে গেছে তার গাড়ির ধাক্কায়।

অত্যন্ত শান্ত, ধীরভাবে এগিয়েছে গল্পটি। অসম্ভব সংযমের পরিচয় দেখিয়েছেন লেখক, কোথাও আবেগ-উচ্ছাসের বাড়াবাড়ি নেই। এই গল্পের গঠনে যে মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন সতীনাথ, তার তুলনা পাওয়া ভার।

এই ‘আটা বাংলা’ গল্পটির একটি বিচ্ছিন্ন সমালোচনা লিখেছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়। তিনি এক শ্রেণীর সমালোচকদের মুখ্যপ্রাত্র বলা যায়। নীরেন্দ্রনাথ রায় সতীনাথের প্রতিভা সম্পর্কে অবহিত হয়েও আটা বাংলা গল্পটি পড়ে ‘শক্তি’ বোধ করেছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, এই ধরনের গল্প লিখলে সতীনাথের প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাবে। ‘গণনায়ক’ গল্পে কিছু-কিছু কংগ্রেসীর এবং গাঞ্জী টুপি পরিহিত নেতাদের স্বরূপ ফুটেছে বলে তিনি খুশি কিন্তু ‘আটা বাংলা’ গল্পটি তাঁর পছন্দ হয়নি। কারণ, সতীনাথ অত্যাচারী নীলকরদের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত জনগণের কোনও প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের আভাস দেখাননি। তাঁর মতে, দুর্বার শ্রেণী সংগ্রাম, নিষ্কর্ষণ আততায়িত্ব, শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিরাট গণ-অভূত্থান, কেবল যাহারই পরিণামে রচিত হইতে পারে শ্রেণীহীন সমাজ ও শাস্তিময় পৃথিবী’, এইভোজ এই গল্পে দেখানো অপরিহার্য ছিল।

একজন লেখকের গল্পে দুর্বার শ্রেণীসংগ্রাম কিংবা বিরাট গণ-অভূত্থানের কথা লিখলেই কি ওইসব ব্যাপারগুলি সংযুক্ত হত? সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও গল্পটি যে একেবারে নষ্ট হত, তাতে ক্ষেনও সন্দেহ নেই। এই ধরনের সমালোচকদের পরামর্শে বাংলার রাশি রাশি গল্প-উপন্যাস নিছক অপাঠ্য-অসার রচনায় পর্যবসিত হয়েছে। সেসব গল্প-উপন্যাসের শেষ দিকে একদল দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষ কৃত্রিমভাবে উদ্দীপিত হয়ে লাঠি-সোটা নিয়ে বাঁপিয়ে পড়ত, একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় একটা লাল সূর্য উঠত। সেই সূর্য কতটা আশার বাণী শোনাতে পেরেছে তা জানি না, কিন্তু সাহিত্যকে আলোকিত করতে পারেনি। সাহিত্যিকদের রচনার বিশ্লেষণ করবেন সমালোচকরা, কিন্তু তাঁদের উপদেশ দেবার অধিকার যে সমালোচকদের নেই, তা অনেকে ভুলে যান।

আটা বাংলার রচনারীতিই একে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। এই গল্পের এমনকী শ্লেষ গোপন করেছেন সতীনাথ। বিরসা, বোটরা, তার মায়ের ব্যর্থ জীবনের প্রতিটি ঘটনাই পাঠকদের বুক মুচড়ে দেয়, সমাজের এই দুঃখী মানুষগুলি, যাদের দুঃখ-বোধ পর্যন্ত নেই, তাদের জন্য নীরব হাহাকার যেন ছড়িয়ে আছে প্রতিটি লাইনে, এর জন্য লেখকের কোনও মন্তব্যেরও প্রয়োজন হয় না। এর চেয়ে বেশি প্রতিবাদ জানাতে গেলে তা মেঠো বক্তৃতা হয়ে যায়, সাহিত্য হয় না।

জাগরী ও ঢোঁড়াই চরিত মানস পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন যে-সব সমালোচকরা, তাঁরা সতীনাথের পরবর্তী রচনাগুলি সম্পর্কে অনাগ্রহী হয়ে পড়েন। রাজনৈতিক

কাহিনী ছেড়ে সতীনাথ যখন মানুষে মানুষে জটিল সম্পর্ক ও হৃদয় রহস্য নিয়ে লিখতে লাগলেন, যেমন ‘অচিন রাগিণী’ কিংবা ‘সংকট’, তখনই অনেকে বিমুখ হলেন। মধ্যবিত্ত জীবনের টুকিটাকি কিংবা প্রেম ভালবাসার কাহিনী এককালে অনেক সমালোচকের কাছে বিষবৎ মনে হত। প্রেম বাদ দিলে যে সাহিত্যের প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তা অনেকেই বুঝতে চান না।

সতীনাথ ভাদুড়ীর পরবর্তীকালের গল্পগুলি আকারে ছোট হতে থাকে এবং মৃদু শ্লেষের বদলে তীব্র, তর্যক ব্যঙ্গের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এককালে রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে নিভৃতে, নিজের বাড়িতে বাগানের পরিচর্যা করতে করতেও রাজনীতি থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারেননি। এককালের দেশ-সেবকদের দেশ-শোষকের ভূমিকা, সরকারি অফিসের অনাচার বিষয়ে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে ফেলেছেন। ‘চরণদাস এম এল এ’, ‘মা আশ্র ফলেমু’, ‘পরকীয় সন-ইন-জ’ ইত্যাদি এই জাতীয় গল্প। আবার কিছু কিছু গল্প বিশুদ্ধ কৌতুক রসের, যেমন ‘পরিচিতা’, ‘তিলোত্তমা সংস্কৃতি সংঘ’, ‘পত্রলেখার বাবা’ ইত্যাদি। একটা অস্তুত ব্যাপার এই যে, কৌতুকরসের গল্প লেখা বেশ কঠিন তো বটেই, সকলের হাতে খুলতেও চায় না, কিন্তু আমাদের সমালোচকরা এই ধরনের গল্পকে গুরুত্ব দেন না। তাঁরা সব সময় বক্তব্য খোঁজেন।

কোনও কোনও গল্প একবার পড়লেই সারা জীবনের মতন মনে দাগ কেটে যায়। সতীনাথ ভাদুড়ীর অস্তুত তিনটি গল্প আমার সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে আছে। ‘চকাচকি’ তাঁর রচনাবলীর মধ্যে বিশেষ বিশ্বাস। বাহাস্তর বছরের বৃক্ষ দুবে আর তার ঘাট বছরের স্ত্রী দুবেনীর প্রেমকাহিনী। পরম্পরারের সঙ্গে মধুর ধূনসূটি সব সময় লেগেই আছে। দুই বৃক্ষ-বৃক্ষ যেন কিশোর-কিশোরীর মতন। পরম্পরার অবিচ্ছেদ্য। উত্তম পুরুষে লেখা এই গল্পে লেখক এঁদের সম্পর্কে মুক্ষ ছিলেন, তবু একদিন জানতে পারলেন, এই প্রেমের মধ্যেও একটা পাপ-বোধ আছে, এরা বিবাহিতা নয়, বহু বছর আগে দুবে তার স্ত্রী-পুত্রকে ছেড়ে এই দুবেনীকে নিয়ে নতুন করে সংসার বাঁধে। অথচ কী নির্মল, নিষ্কলৃষ্ট দুই নারী পুরুষ, প্রেম এদের জীবনকে বিশুদ্ধ করেছে। তবু দুবে যখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন দুবেনী তাকে ছেড়ে চলে যায়, এও প্রেমেরই এক দিক, কঠিন আত্মাগা। মৃত্যুশয্যায় ছেলের হাতে জল পাবে না দুবে, তা কি হয়? দুবেনী তাই দূরে সরে যায়। ডেকে আনা হয় দুবের প্রথম পক্ষের ছেলেকে। কিন্তু কোথায় যাবে দুবেনী? ওরা যে অবিচ্ছেদ্য, দুবেকে যখন চিতায় তোলা হয়েছে, তখন শুশানের ঝোপঝাড়ের মধ্যে অল্প শব্দ হয়। কোনও শেয়াল, না এক অঙ্গ-কম্পিতা বৃক্ষ?

দ্বিতীয় গল্পটি কোনও শারদীয় সংখ্যায় পড়েছিসাম ‘স্বর্গ-নরকের দুয়ারে’ এই নামে। এখন সেটি ‘সংকট’ উপন্যাসের একটি অধ্যায়। ‘সংকট’ বইখানি উপন্যাস না গল্পগ্রন্থ তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। অঙ্গুত বাণী দিয়েও অনেক কিছু বলা যায় কিলা, এই গল্পে যেন তারই পরীক্ষা করা হয়েছে। মূল বিষয়টি যৌনতা, এক অপরিণত মস্তিষ্ক মুক্তকের যৌন জাগরণের, যার একদিকে মা ও অন্যদিকে ভ্রাতৃবধু,

কিন্তু কী অসম্ভব দক্ষতার সঙ্গে এই কঠিন বিষয়টিকে গল্পে এনেছেন সতীনাথ। স্বর্গ ও নরকের মাঝখানে দোদুল্যমান কয়েকটি মুহূর্তে এই গল্পের পরিণতি।

তৃতীয় গল্পের নাম ‘বৈয়াকরণ’। এখানেও যেন কত সামান্য একটা কথাকে কত মহৎ প্রশ্ন করে তোলা যায়, তার একটি দৃষ্টান্ত। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিষয় নিয়ে সতীনাথ গল্প রচনা করেছেন। কোনও লেখকের সঙ্গেই অন্য কোনও লেখকের তুলনা করা যায় না। যে-যার নিজস্ব ধরনে বিশিষ্ট। তবু এক একটি লেখা পড়লে মনে হয়, এমনটি বাংলা ভাষায় অন্য কোনও লেখকের হাতে আসা যেন সম্ভব ছিল না। ‘বৈয়াকরণ’ সে রকম একটি গল্প। একজন সংস্কৃত পণ্ডিতের শালা ও তার স্ত্রী এসেছিল বেড়াতে। স্টোভ জ্বালাবার সময় অসাবধানে সেই যুবতী বধূটির শাড়িতে আশুন ধরে যায়। আশুনের দাহে তার সর্বাঙ্গ বীভৎস হয়ে গেল, শুধু মুখে কোনও অঁচ লাগেনি। প্রাণপণ চিকিৎসায় তাকে বাঁচাবার চেষ্টা চলছে, কিন্তু বধূটির নিজেরই আর বাঁচার ইচ্ছে নেই। একজন সাম্রাজ্য দেবার জন্য বলল, তোমার সবটা তো পোড়েনি, এখনও মুখখানা কত সুন্দর আছে! তা সে শুনতে চাইল না। শেষনিষ্ঠাস ফেলার আগে হৃদয় নিঞ্জিড়ে সে বলে গেল, ‘ওরা কি ওই চায়...’।

আশুনে পোড়ার ঘটনাটি আছে অতি সংক্ষেপে, কয়েক লাইনে, মৃত্যুপথ্যাত্মিণীর ওই শেষ কথাটাই মূল গল্প। কী বলতে চেয়েছিল মেয়েটি? পণ্ডিত ধৰ্মায় পড়ে যান। ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াবার সময় ওই কথাটাই তাঁর মাথায় ঘোরে। ওরা মানে কারা, তারা কী চায়? স্বামী সম্পর্কে হয়তো স্কোভ ছিল নারীটির, কিন্তু বহুবচন ব্যবহার করল কেন? সংস্কৃত ব্যাকরণ ছেটেও এর উত্তর পাওয়া যায় না। হঠাৎ একদিন ক্লাসরুমে একটি ছাত্রীকে পজাতে পড়াতে পণ্ডিত আবিষ্কার করেন, এই ‘ওরা’ শব্দের মধ্যে তিনি নিজেও পড়ে আসছেন।

এই সব গল্প বাববার পড়লেও আশ মেটে না।

সতীনাথ ভাদুড়ীর মৃত্যুর কিছুদিন পরই তাঁর ‘জাগরী’ ছাড়া অন্যান্য বইগুলি দুর্লভ হয়ে গিয়েছিল। জাগরীর কৃতিত্বে চাপা পড়ে গিয়েছিল তাঁর আর সব রচনা। বাংলা সাহিত্যের আলোচনা গ্রন্থগুলিতে, বিশেষত ছোটগল্প বিষয়ক রচনায় সতীনাথ ভাদুড়ীর উল্লেখ নিতান্ত দায়সারা গোছের। জাগরীর জন্য অতুলচন্দ্র শুপ্ত কিংবা গোপাল হালদারের মতন সমালোচক পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর ছোটগল্পের তেমন আলোচনা পাওয়া যায়নি। সতীনাথের বইগুলিও দুর্লভ হয়ে পড়ায় সনাতন পাঠক নামে এক সাংগৃহিক পত্রিকার কলামনিস্ট কয়েকবার সতীনাথ ভাদুড়ী সম্পর্কে লেখালিখি শুরু করে এবং তাঁর সমস্ত রচনা পুনঃপ্রকাশের দাবি জানান। উক্ত সনাতন পাঠকের পরিচিত এক প্রকাশক তাতে আগ্রহী হয়ে, অনেকখানি ঝুঁকি নিয়ে সতীনাথ ভাদুড়ীর সমগ্র রচনাবলী স্বত্ত্বে প্রকাশ করেন চার ব্যক্তি। সম্পাদনা করেছেন শৰ্ষে ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য। অত্যন্ত নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে এই সম্পাদকদ্বয় সতীনাথ সম্পর্কে বহু তথ্য, গ্রন্থ সমালোচনা, অন্যদের স্মৃতিকথা সংগ্রহ করেছেন। উপরন্তু পাওয়া গেছে সতীনাথের মূল্যবান ডায়েরি, তাঁর অপ্রকাশিত অনেক রচনার খসড়া।

চার খণ্ডের এই সমগ্র রচনাবলী পাঠকরা গ্রহণ করেছেন। একাধিক সংস্করণ

হয়েছে। তাতে প্রমাণ হয়, সমালোচকরা ঔদাসীন্য দেখালেও একালের পাঠকদের সমাদর পেয়েছেন তিনি। পরবর্তীকালের লেখকদের জন্যও সতীনাথ অবশ্যপাঠ্য।

॥ ৩ ॥

কমলকুমার মজুমদার বাংলা সাহিত্যের বৃহস্পতি ধৰ্ম। এরকম কোনও লেখক হতে পারে না, হওয়া সম্ভব নয়, অথচ সত্যিই কমলকুমার মজুমদার নামে একজন লেখক বেশ কয়েক বছর বাংলা সাহিত্যে দাপটের সঙ্গে বিচরণ করে গেছেন। সাহিত্য নিয়ে তিনি কি ছেলেখেলা করতে চেয়েছিলেন, না সাহিত্য তাঁর অঙ্গ-মজ্জায় মিশে হৎপিণ্ডের ধ্বনির সঙ্গে সমন্বিত হয়েছিল? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সহজ নয়। আমি তাঁকে প্রায় কৈশোর বয়েস থেকে দেখেছি, বহু বছর তাঁর সঙ্গলাভ করেছি, তবু মানুষটিকে ঠিক বুঝতে পারিনি। তাঁর রচনাগুলির মতনই রচয়িতাটিও দুর্বোধ্য ও রহস্যময়। যদিও আপাতত তিনি ছিলেন হাস্যময়, রসিকতামুখর, বৈদক্ষের সঙ্গে মিশে থাকত আদিরসাঞ্চক বাক্য। একটা কথা আছে যে, প্রকৃত বিদ্বক্তা তাঁকেই বলে যাঁর মন্তিক্ষটি হবে আ্যারিস্টটলের মতন আর মুখের ভাষা হবে চাষার মতন। কলেজ স্ট্রিট এবং ওয়েলিংটন অঞ্চলে বহু দুপুর-বিকেল সম্মায় হাঁটতে হাঁটতে, কখনও পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে তিনি কখনও ফৈয়াজ শুরি গান, কখনও গ্রাম্য শিঙ্গাদের ডোকরার কাজ, কখনও মার্সেল প্রস্তরের রচনা, কখনও দুবরাজপুরের ডাকাতদের চরিত্র, কখনও রামপ্রসাদী গানের ভাষা শব্দবহার, কখনও উইলিয়াম ব্রেকের কাব্য, কখনও সোনাগাছির গগিকাদের মধ্যে প্রচলিত ছড়া, কখনও যামিনী রায়ের ছবি ইত্যাদি বিষ্ণের যাবতীয় বিষয়ে শৰ্ষে বলতেন। তখন আমাদের মনে হত, আমাদের কাছে তিনি যেন আ্যারিস্টটলের মতনই এক চলন্ত শিক্ষক এবং তাঁর মুখের ভাষা অতি জীবন্ত, অর্থাৎ যাকে বলে কাঁচা বাংলা। অথচ তিনিই যখন নিজের লিখিত রচনার কয়েক পাতা শোনাতেন, সে ভাষার অর্থ উদ্ধার করতে মাথা ঘুরে যেত।

মানুষটির মধ্যে বৈপরীত্য ছিল অনেক। আমাদের সঙ্গে তাঁর যখন প্রথম পরিচয় হয়, তখন তিনি ছিলেন নাট্য পরিচালক। চমকপ্রদ ছিল তাঁর নির্দেশনা। আমরা অবশ্য নাট্য-অভিনয় নিয়ে বেশিদিন মেঢ়ে থাকিনি, কিন্তু কমলকুমার পরবর্তীকালেও নাট্য প্রযোজনায় অনেক নতুন পরীক্ষা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব প্রমাণিত হলেও কখনওই শব্দের প্রযোজনার বাইরে গেলেন না, বড় রকমের কোনও উদ্যোগ কিছুতেই নিলেন না। বাংলা নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে কমলকুমারের নাম লেখা থাকবে কিনা জানি না। এক সময় আমরা তাঁকে সর্বক্ষণ কাঠখোদাই করতে দেখেছি। জলরঙের ছেট ছেট ছবিও এঁকেছেন, চাইনিজ ইঙ্কে বহু স্কেচ করেছেন। এটাও মনে হয়েছিল তাঁর শখ, কিন্তু পরে জানা গেল, শিঙ্গী হিসেবে অসাধারণত্বের লক্ষণ ছিল তাঁর মধ্যে। মন দিয়ে শুধু ছবি আঁকলে শিঙ্গাদের মধ্যে অগ্রগণ্য হতে পারতেন। আমি নিজে প্রথ্যাত শিঙ্গী গোপাল ঘোষের মুখে এমন কথা শুনেছি। কিন্তু কমলকুমার ছবি আঁকায় তেমন মন দিলেন না।

তবে কি সাহিত্যের জন্যই নিবেদিত ছিল তাঁর মন-প্রাণ? সেখানেও তো হেলাফেলার ভাব। দু' একটি উপন্যাস ও বেশ কয়েকটি ছোটগল্পে যখন কমলকুমার আমাদের স্মৃতি করে দিয়েছেন, আমাদের মনে হয়েছে এমন বর্ণাচা, এমন উচ্চস্তরের রস, সম্পূর্ণ নতুন বাক-বিভূতিসম্পন্ন রচনা আমাদের অভিজ্ঞতায় আর নেই, তখনই কমলকুমার যেন ইচ্ছে করে তাঁর পাঠকদের দূরে সরিয়ে দিতে চাইলেন। পুরস্কার কিংবা অর্থাগম সম্পর্কে নির্লোভ এবং মোহমুক্ত থাকতে পারেন কোনও কোনও লেখক, কিন্তু এমন লেখক কি সম্ভব, যিনি পাঠক চান না?

কলকাতার একটি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর মধ্যে কমলকুমার মজুমদার সুপরিচিত ছিলেন। অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী তাঁর কাছে ফরাসি ভাষা শিখেছেন, বিজ্ঞাপন জগতের কেউকেটোরা ছিলেন তাঁর আজ্ঞার সঙ্গী, কিন্তু তাঁরা অনেকেই কমলকুমারের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না বোধ হয়। অনেকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে পছন্দ করতেন, কিন্তু তাঁর রচনার স্বাদ পাননি। সিগনেট প্রেস ছিল এক সময়ে কলকাতার সবচেয়ে কৃতিসম্পন্ন এবং জমজমাট প্রকাশক। প্রবীণদের সঙ্গে সঙ্গে নবীনদের গ্রন্থও তাঁরা প্রকাশ করতেন। সেই সিগনেট প্রেসের কর্ণধার দিলীপকুমার গুপ্তের সঙ্গে বেশ কিছুদিন কমলকুমারের হৃদয়তা ছিল, কিন্তু দিলীপকুমার গুপ্ত নিশ্চিত কমলকুমারের লেখক পরিচিতি জানতেন না, জানলে অবশ্যই তিনি কমলকুমারের কোনও গ্রন্থ প্রকাশ করতেন। আমাদের ঠিক আগের প্রজন্মের লেখকেরা, যাঁরা কমলকুমারের মোটামুটি সমবয়েসি, তাঁর কেউ কমলকুমারকে লেখক হিসেবে গণ্য করেননি। এ এক বিচ্ছিন্ন ব্যাপার, বাংলা ভাষার একজন প্রধান লেখককে তাঁর সমসাময়িক লেখকরা চিনতেই পারলেন না।

কয়েকটি উদাহরণ দিই। বাংলা ছোটগল্পের দিকপাল জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ছিলেন আমার অতি প্রিয় লেখক। একটি ছোট পত্রিকা অফিসে এক সময় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সহকর্মী ছিলাম আমি। আমার খুব সাধ হয়েছিল, আমার দুই প্রিয় লেখককে এক জায়গায় মেলাই। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তখনও পর্যন্ত কমলকুমার সম্পর্কে জানতেন না কিছুই। প্রস্তুতির জন্য আমি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে এক্ষণ পত্রিকার একটি কপি দিলাম, যাতে কমলকুমারের ‘গোলাপ সুন্দরী’ নামে অসাধারণ গল্পটি ছাপা হয়েছিল। কয়েকদিন পর তিনি বললেন যে পত্রিকাটি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। দিলাম আর একটি কপি। আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে তিনি কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, পত্রিকাটি তিনি বাড়ি ফেরার পথে ট্রামে ফেলে গেছেন। নাছোড়বান্দা আমি, জোগাড় করলাম এক্ষণ পত্রিকার আর একটি সংখ্যা। এবার আমি কিছু জানতে চাইবার আগেই তিনি বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ পড়েছি, পড়েছি। বেশ ভাল লেগেছে। বুঝলাম, তিনি পড়েননি কিংবা পড়তে পারেননি, তাঁর কিছু অসুবিধে হয়েছে। গোলাপ সুন্দরী যে সম্পূর্ণ পড়েছে, তার পক্ষে এ রকম হালকা মন্তব্য করা সম্ভব নয়। এর পরে একদিন ওই দু'জনের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দু'জনেই অত্যন্ত ভদ্র ও বিনীতভাবে কিছু অর্থহীন বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, ভাব জমেনি একেবারেই।

সন্তোষকুমার ঘোষ, যিনি ছাপার অক্ষরে বাংলা ভাষার যাবতীয় রচনা পড়তেন,

তিনি একদিন বিরাটির সঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, কমলের লেখা আমি এক পাতার বেশি পড়তে পারি না। তোমরা যে কেন ওকে নিয়ে এত হইচই করো। কোনও এক বছর সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কারপ্রাপকের নাম ঘোষণার পর আমরা একবার কৃতিবাস পত্রিকায় উদ্ধার সঙ্গে লিখেছিলাম, কেন কমলকুমারকে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে না। সেই সংখ্যাটি পড়ে তখনকার জনপ্রিয় লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে সরল কৌতুহলভরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এই কমল মজুমদার কে?

কমলকুমারকে নিয়ে মাতামাতি শুরু করে তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠ কবি-গল্পকারেরা। মতিলাল পাত্রী ও তাহাদের কথা, মাত্র এই দুটি গল্প ছাপা হয়েছিল দেশ পত্রিকায়, তা ছাড়া কমলকুমারের সমস্ত গল্প-উপন্যাস ছাপা হয়েছে শুধু বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনগুলি তরঙ্গদেরই রণক্ষেত্র, সেই তুলনায় কমলকুমার যথেষ্ট বয়স্ক। লিটল ম্যাগাজিনের মাপে আঁটে না এমনই বিরাট লেখক তিনি। কোনও একটি স্বল্পখ্যাত ছোট পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘অন্তর্জলি যাত্রা’। সেই পত্রিকার অন্য আর সব রচনার সঙ্গে কমলকুমারের উপন্যাসটির যেন আকাশপাতাল তফাত। পত্রিকাটি থেকে শুধু নিজের উপন্যাসের অংশটি ছিঁড়ে নিয়ে কমলকুমার আলাদা সাদা মলাট দিয়ে সেলাই করেছিলেন, তারপর তার এক একটি কপি তিনি উপহার দিয়েছিলেন বিশেষ পরিচিতদের। তিনি বলেছিলেন, মাত্র একশো জন পাঠক হলেই তাঁর চলবে। জীবিত অবস্থায় খুব সম্ভবত একশো জনের বেশি আন্তরিক পাঠক তিনি দেখে যেতে পারেননি। এখন তাঁর সুমুদ্রিত একটি গল্পসমগ্র পাওয়া যায়, কিছু কিছু পাঠক সেটি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁর উপন্যাসগুলি খুবই দুর্লভ।

তাঁর চরিত্রের আর একটি স্মৈপ্রযীত্যের উদাহরণ দিয়ে তাঁর ছোটগল্পগুলির আলোচনা শুরু করা যাবে। যতদূর জানি, কমলকুমার দু'খানি স্বল্পস্থায়ী পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। একটির নাম ‘তদন্ত’। সেটা বেশ সন্তা ধরনের রহস্য রোমাঞ্চ পত্রিকা। দারোগার দফতর ও খুন-জখমের কাহিনী তাতে ছাপা হত, অধিকাংশ লেখা তিনিই লিখতেন বেনামীতে। তাঁর ধারণা ছিল, ওই কাগজ চালিয়ে তাঁর জীবিকা নির্বাহ হবে। হল না। অচিরেই সে কাগজ বন্ধ হয়ে গেল। কিছুদিন পর তাঁর অতি অনুরূপ সঙ্গী ইন্দ্রনাথ মজুমদারের সহায়তায় কমলকুমার বার করলেন আর একটি পত্রিকা, ‘অঞ্চ ভাবনা’। উচ্চাক্ষের গণিত এবং মেটাফিজিক্সের আলোচনা ছাড়া তাতে অন্য কিছু স্থান পেত না। একই ব্যক্তি একবার রগরগে গোয়েন্দা পত্রিকার সম্পাদনা করছেন, পরে আবার উচ্চাক্ষের গণিত ও মেটাফিজিক্সের পত্রিকা, এ রকম আগে কখনও শোনা গেছে।

যৌবন বয়েসে কমলকুমার গল্প লিখেছেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু মধ্য বয়েসে। ‘মলিকা বাহার’ তাঁর প্রথম দৃঃসাহসী, চমকপ্রদ গল্প। এরকম বিষয়বস্তু নিয়ে গল্প লেখার কথা বাংলায় আগে কেউ চিন্তাও করেননি। গল্পের ভাষা দেখেও বোঝা যায়, এ আমাদের পরিচিত বাংলা ভাষা নয়, বিশুদ্ধ বর্ণনারীতি এর মধ্যে নেই, এর বাক্য গঠন ভিন্ন জাতের। “এখনও মলিকার আবক্ষ, সে

আপনাকে আর এক ভবিষ্যৎ থেকে অদ্য নিরীক্ষণ করে; কেমনখারা মুখটা হয়ে আছে যে তার, অথবা পুরুষেচিত ক্লান্তি এখানে সেখানে। আয়নার সাক্ষাৎ নীচেই ব্র্যাকেটে, ওটা পাউডার এটা কাজল এটা এসেছের শিশি, তাতে শুধু স্বচ্ছতাই, তেল টস্টসে ফিতে, কিছু কাটা—এ সকলই সদ্য মৃত কোনও জনের সমারোহ বা; আর যে, এই পুরুষেচিত ক্লান্তির ক্ষেত্রে এ সকল যে, ব্রিয়াগ, নিক্রিয়।” এই গদ্য বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম মানে না। অর্থ অনাস্থাদিতপূর্ব একটা ব্যঙ্গনা যে রয়েছে তা-ও ঠিক।

‘মলিকা বাহার’-এর আগের পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দুটি গল্প, ‘লাল জুতো’ এবং ‘জল’। যতদূর জানা যায়, ‘লাল জুতো’ তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প। এটাকে একটা মধুর কৈশোর প্রেমের গল্প বলা যায়, যদিও গতানুগতিক প্রেমের গল্পের চেয়ে আলাদা। এই গল্প পাঠ করে কমলকুমারের ভবিষ্যৎ রচনাধারা কোন দিকে যাবে তা অনুমান করা যায় না। কিন্তু ‘জল’ গল্পটি এক পথিকৃৎ লেখককে চিনিয়ে দেয়। এটা বন্যাপীড়িতদের গল্প। কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ীর বন্যার গল্পের চেয়ে এর দৃষ্টিভঙ্গ একেবারে অন্যরকম। বন্যায় সব ভূবে গেছে, পেটে ভাত নেই, ঘরের ঢালা ফুটো, এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই অসহায় দুটি মানুষকে, নন্দ আর ফজল। আর কোনও উপায়ান্তর নেই দেখে এই ধর্মভীকু, দুর্বল মানুষ দুটি ডাকাতি করবে ঠিক করল। গভীর রাতে উচু বাঁধ দিয়ে হেঁটে আসছে এক বৃক্ষ ও বালক, এরাও ওই দু’জনেরই মতন দরিদ্র ও অসহায়, আজক্ষেত্রে শেই পুঁজুরী বামুনটি এক ধনীর বাড়িতে পুঁজো করে কিছু চাল-কলা-সন্দেশ পেয়েছে এবং বালকটি কুইনিন চূরি করেছে। এরা হাঁটছে ভয়ে ভয়ে, আর ডাকাত দুটিও আসলে ভৌতু, কোনও বলশালী, অস্ত্রধারী পথিককে আক্রমণ করার ক্ষমতা ভাদের নেই। পাছে ভুল করে ওরা নিজেদের নাম ধরে ডেকে ওঠে, তাই ছদ্মনাম নিয়েছে কানাই। দু’জনেই কানাই। পাপবোধ থেকে এই কানাই যেন এক তৃতীয় ব্যক্তি হয়ে যায়। সব দোষ কানাই-এর। “পরের ধন নেওয়া পাপ, খোদা রাগ করেন। আমি হই ফজল, আমি হই ভাল লোক, লোক না থাকলেও আমি তড়পা! গুনে নি, আমি পরের ক্ষেত্রে ধান কাটি না, আমি হই ভাল লোক, কেননা খোদা একদিন মুখ তুলে চাইবেন।...সে হয় কানাই, সে না হয় ফজল, তার নাম কানাই তবু ফজল থতমত থেয়ে নিয়েছিল ঠিকই।”

‘জল’ গল্পেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এই লেখকের বাংলা গদ্য অন্য চালে চলতে শুরু করেছে।

‘মলিকা বাহার’ শুধু ভাষা ব্যবহারের জন্যই নয়, বিষয়বস্তুতেও তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। পুরুষের নিঃসঙ্গতা বোধ নিয়ে অনেক কিছু লেখা হয়েছে, একজন পুরুষের সঙ্গে বিভিন্ন নারীর সম্পর্কের কথাও সাহিত্যে নতুন নয়। ‘মলিকা বাহার’ গল্পের দৃষ্টিভঙ্গ এসবের বিপরীত। হঠাৎ একদিন মলিকা নামের যুবতীটি একটি চাকরির চিঠি পায়। এবার থেকে সে স্বাধীন হবে। কিন্তু একথাও তার মনে পড়ে যে, এরপর আন্তে আন্তে তার যৌবন ফুরিয়ে যাবে। তার কোনও সঙ্গী নেই। সে নিঃসঙ্গ কিন্তু এর আগে কোনও যুবককে সে কাছে আসতেও দেয়ানি। সে তখন বাড়ি থেকে

বেরিয়ে পড়ে তার পূর্ব পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করতে গেল। সেই সব পুরুষরা কেউ সংসারী, কেউ অতি সাধারণ হয়ে গেছে। কেউ মল্লিকাকে দেখে ভয় পায়। পথে দেখা হল শোভনাদির সঙ্গে। এই শোভনাও চাকরি করে। একলা চলাফেরা করে কিন্তু পুরুষদের ধার ধারে না। শোভনা মল্লিকার হাত ধরে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে। গ্রীষ্মকাল। ছাদে গিয়ে মাদুর পেতে বসল দুঃজনে। বেলফুলের মালা জোগাড় করে আনল শোভনা। গরমের জন্য সে গায়ের জামা খুলে ফেলল। তাদের পুরুষ বন্ধু নেই, কিন্তু এই দুই রমণী তো পরম্পরের বন্ধু হতে পারে। সেই বন্ধুত্বে শরীরই বা বাদ যাবে কেন? সোহাগ করে মল্লিকার গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে তার মুখ চুম্বন করে শোভনা। মল্লিকা আবেশে বিহুল হয়ে যায়। শোভনার মুখনিঃসৃত লালা মল্লিকার গালে লেগে থাকে।

পুরুষে পুরুষে সমকামিতার কিছুটা ইঙ্গিত দিয়ে জ্যোতিরিণ্ড্র নন্দী লিখেছিলেন ‘সোনার চাঁদ’ নামে গল্প। দুই নারীর পরম্পরারের প্রতি শারীরিক আকর্ষণের গল্প বাংলায় আর কেউ লিখেছেন বলে জানি না। প্রথ্যাত উর্দু লেখিকা ইসমৎ চুঘতাই খানদানি মুসলমান পরিবারের নারীদের মধ্যে লেসবিয়ানিজ্মের কাহিনী লিখে প্রচুর শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন। কমলকুমারের ‘মল্লিকা বাহার’ নিয়ে যে এ দেশের নীতিবাগীশেরা খড়গহস্ত হননি, তার কারণ, ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকায় প্রকাশিত এই গল্প অনেকেই ধৈর্য ধরে পড়েননি, পড়ার চেষ্টা করলেও অনেকে বোঝেননি।

‘মতিলাল পাদ্মী’ এবং ‘তাহাদের কথা’ গল্প দুটিতে কমলকুমারের ক্ষমতা এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্য পূর্ণ বিকশিত। বাংলা লেখার সব বীতিনীতি ভেঙে দিচ্ছেন তিনি। এতাবৎকাল সমস্ত কাহিনী লেখা হয়েছে ন্যারোটিভ স্টাইলে, ঘটনা পরম্পরায়। কিন্তু কমলকুমারের রচনায় যখন তখন জাতীয়-বর্তমান-ভবিষ্যৎ মিলেমিশে যায়। ইদানীং বিদেশে ম্যাজিক রিয়েলিজ্যম নামে একটা কথা চালু হয়েছে, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কমলকুমারের এই সব গল্পে। চরিত্র ও পটভূমির বাস্তব নিছক চাকুর নয়, মানুষগুলির মাথার পেছনে সময়ের পরিপ্রেক্ষিত বদলে বদলে যায়। কমলকুমারের সংলাপের ব্যবহারও সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। অনেক ক্ষেত্রেই পূর্ণ বাক্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নেই। এক একটা বাক্যের অর্ধেক কিংবা কয়েকটি শব্দেই সব বুঝিয়ে দেওয়া যাচ্ছে।

‘তাহাদের কথা’ গল্পটি মর্মস্তুদ হয়েছে প্রধানত এর অঙ্গিকের জন্য। দেশের জন্য অনেক ত্যাগ ও কষ্ট সহ্য করেছিলেন শিবনাথ, জেল খেটেছিলেন। জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন, দেশ বদলে গেছে, স্বাধীনতার পর স্বাধীনতার যোদ্ধাদের আর মূল্য নেই। এসব দেখেশুনে শিবনাথ পাগল হয়ে গেলেন। উচ্চশিক্ষিত মানুষটা একেবারে বন্ধ পাগল, পথে পথে ঘোরেন, পরনের কাপড়ের ঠিক থাকে না। ছেলেরা তিল মারে, সবাই দূর দূর করে। কোনও রকম উপার্জন নেই বলে তাঁর কিশোরী মেয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে কাজ নিয়ে লালসার শিকার হয়, ছোট ছেলে জ্যোতি বাবাকে বাঁচাবার জন্য সব সময় খোঁজাখুঁজি করে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় যে শিবনাথের হাত-পা শিকলে বেঁধে রাখা হবে, জ্যোতি তা কিছুতেই মানতে চায় না। এই নির্মম কাহিনীটি বেশি মর্মস্পর্শী হয়েছে, কারণ তা দেখানো হয়েছে ওই ছেট ছেলেটির

চোখ দিয়ে। সব কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে আছে এক বালকের অভিমান। এই সব গল্প সাধারণত রুক্ষ ধরনের হয়, কিন্তু এ গল্পের কঠোর বাস্তবের পাশাপাশি রয়েছে যে কবিতা, তা আরও বেদনাবোধ জাগায়। জ্যোতির বাবাকে জন্মের মতন শিকলে বাঁধা হবে, দেশের জন্য কারাবাসের পুরস্কার হিসেবে পুনরায় বন্দীদশা, ওদিকে এক ব্যবসায়ী, আঘাতাম মারোয়াড়ি পুণ্য অর্জনের জন্য খাঁচার পাথিকে মুক্তি দিয়ে আকাশে উড়িয়ে দিচ্ছে। সেই অংশটি এ রকম: “আঘাতামবাবু এখানে উপস্থিত, ঠিক কাঁটার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, মুখে তাঁর অনর্গল শ্লোকধারা। তাঁর পায়ের কাছে বেনারসী পাখমারা। ছেঁড়া জুতোর মতন মুখটা সকল সময়েই আড়াল করে, এটা তাদের মুদ্রাদোষ। এখন সে আঁঠারু লতার ঢাউস ঝুঁড়িটার মধ্যে হাত দিয়ে উঁ উঁ শব্দ করে কিছু নিশ্চয়ই খুঁজছিল। সহসা বলে উঠলো, আকাশ পাবি গো, ডর কি রে, আর জন্মে আমায় আকাশ দিবিস গো পরাণ। এবং অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে একটি পাখি বার করে আনলো। একটি নীল স্পন্দন। মনের কিছুভাগ, বনের কিছুভাগ দিয়ে গড়া নীলকঞ্চ পাখি। অনেকেই পাখি দেখে নমস্কার করেছিল।”

এই পর্যায়ের একটি অত্যন্ত নিখুঁত, সুন্দর জোরালো গল্প ‘কয়েদখানা’। ভাষার নিখুঁত কারিগরি সৌন্দর্যে গল্পটি ঝলকল করছে। জগদীশ গুপ্ত কিংবা সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁদের চরিত্রগুলির চেহারার পুঞ্চানুপূঞ্চ বর্ণনা দেন না, দু’এক আঁচড়ে কিছুটা আন্দাজ দেন শুধু। কিন্তু কমলকুমার একজন শিল্পী, দৃশ্যঘনাকে ছবির মতন ফুটিয়ে না তুললে তাঁর তৃপ্তি নেই। এই গল্পে ঘোড়সওয়ার শুঙ্কদিকে আমরা প্রথম দেখি এই ভাবে: “জলাশয়ে মুক্তকেশী অঙ্ককার। সুন্দর ভাট্ট গাছ গড়িয়ে গড়িয়ে পড়া ডাল, সেখানে ঘোড়াটি—মাটির আধো সবুজ ঘোড়ার পিঙ্গলবর্ণ ভাট ফুলের কমলালেবু রং অটুট হয়ে উঠল। ঘোড়াটি মুখ তুলে শুঙ্কণ কানন্দুটি খাড়া করে। ল্যাজটি নড়ল। কেশের স্থানচূয়ত হয়।

“টিলার লোকটি তাকে দেখল। লোকটি ঢাঙা, পুরুষকারে দৃশ্য আড়া, কঠোর মুখের তলে অশ্ব হিসেবি তীরেলা দাঢ়ি। মাথায় ছেট গামছার ফেত্তি, তাব গায়ে নকশা করা ভারি কাঁথা ঝুলছে। সব থেকে সুন্দর তার পদময়, মনে হয় কাঠেই কোঁদা, কড়া হাঁটু—তার পাশেই আঁটলি মাংসপেশী। পা দুটি অনেক তফাতে রক্ষিত। কাঁথা গোল হয়ে উঠে গেছে কাঁধে। হাতে হাত মিলাল, লোকটি অবাক হয়ে ঘোড়াটিকে দেখল, সম্পূর্ণ ছবি।” সব দৃশ্যই এরকম ছবি। পরিবেশের ইজেলে তেলরঙে আঁকা।

কাহিনীটি উন্মোচিত হচ্ছে খুব ধীর লয়ে। রাঢ়ের রুক্ষভূমির কিছু অতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয় প্রথমে। তারপর জানা যায় কাছাকাছি বড় গ্রামে জমিদার এসেছে। নতুন জমিদার, এখনও জমিদারি হালচাল পুরো রপ্ত হয়নি। পাহে লোকে তাকে আনাড়ি মনে করে তাই সে অবিরাম মদ গিলে গিলে যখন তখন হৃষি দেয়, বাইজি ও রক্ষিতা এনেছে ঠিকঠাক, মাঝে মাঝে বন্দুক তুলে শূন্যতাকে ভয় দেখায়। সে জানে যে জমিদারকে অত্যাচারী হতে হয়, না হলে লোকে মানে না। সেই ঝোঁকে সে হৃকুম জারি করে দিল যে আমাদের পূর্ব পরিচিত শাজাদ ও অন্যান্য গরিব মানুষগুলোকেও এখন থেকে খাজনা দিতে হবে। যদিও ওই গ্রাম, রন্ধুখণ্ড, শুকনো

ডাঙা জমিতে ভরা, সেখানে কোনওদিন খাজনা লাগেনি। ঘোষণা শুনে বিশ্বিত ভয়ার্ত মানুষগুলো জমিদারের কাছে দরবার করতে আসে। জমিদার মোহনগোপাল ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিতে দিতে ভাবে যে দয়া দেখানো মানেই দুর্বলতা। রংনুঘাঁ'র সামান্য খাজনায় তার প্রয়োজন থাক বা না থাক, এইসব প্রজাদের রাখতে হবে পায়ের নীচে। প্রথমেই সে জমিদার বাড়ির সবচেয়ে দর্শনীয় স্থান কয়েদখানাটা দেখে আসতে বলে প্রজাদের। তারপর মাতলামির ঝোঁকে, নিতান্ত অকারণে শাজাদের ঘোড়াটিকে শুলি করে মারে।

নিরীহ, অসহায় প্রজাদের ওপর জমিদারের অভ্যাচারের কাহিনী আমরা অনেক পড়েছি। এককালে এই সব জমিদারদের চেহারা ছিল ফর্সা, নাদুস নুদুস। ক্রমে এদের রং কালো হতে থাকে। এক শ্রেণীর লেখক এই সব জমিদারদের গায়ে কালো রঙের পোঁচ লাগাতে লাগাতে একেবারে কুচকুচে কালো, সমস্ত দোষে ভরা একটা জড় মৃত্তি করে তোলেন। আর গরিবরা ফর্সা হতে থাকে। গরিব বা নিপীড়িত হলেই সাদা। জমিদার বা কারখানার মালিক বা শোষকশ্রেণীর সবাই কালো, আর শোষিত কৃষক-মজুর-বন্তিবাসী সবাই সাদা। লেখা হতে লাগল এই কালো আর সাদাদের লড়াইয়ের কাহিনী, ক্রত তা একঘেয়েমিতে পর্যবসিত হল। সম্পূর্ণ সাদা আর সম্পূর্ণ কালো। এই একরঙা মানুষদের নিয়ে আর যাই হোক, সাহিত্য হয় না।

এই গল্পে অবশ্য শাজাদ ও তার সঙ্গীরা মুসল্মান-হিন্দুদের একটি মিশ্রিত দল দ্বিতীয় বার সাহস সঞ্চয় করে ফিরে এসেছে পুরুৎ আঘাত হেনেছে। প্রিয় ঘোড়াটিকে মারার প্রতিশোধ নিতে শাজাদ হত্যা করেছে ওই জমিদারকে। কিন্তু তথাকথিত প্রগতিশীল গল্পের সঙ্গে এই কাহিনী বিস্মীলের কোনও মিল নেই। এখানে লেখক ওই নব্য জমিদার মোহনলালের মধ্যে প্রত্যুষাবীজ আগেই দিয়ে দিয়েছেন। তার হাবভাব সব কিছুই বেমানান। যুগ বদলাচ্ছে। এখানে এই জমিদার শ্রেণীর বিলোপ অবশ্যজ্ঞাবী। মোহনলাল নিজেও যেন জানে যে তার ধ্বংস অনিবার্য। সে যেন জমিদারের ভূমিকায় এক ব্যর্থ অভিনেতা। তার মাতলামি তার নারী সম্মতিগুলোর দেখানেপানা, তার বন্দুক নিয়ে আশ্ফালন, এ সবই যেন তার মৃত্যুর আগে হাত-পা খিচুনি। শাজাদ এসে তার মাথায় আঘাত করার সময় সে কোনওরকম প্রতিরোধের চেষ্টাও করে না। এরকম চরিত্রচিত্রণের তাৎপর্য অনেক গভীর। ‘কয়েদখানা’ কিংবা ‘নিম অম্পূর্ণ’র মতন গল্পই সত্যিকারের প্রগতিশীল রচনার আদর্শস্বরূপ হওয়া উচিত।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা দরকার। এই পর্যায় পর্যন্ত গল্পে কমলকুমার আশ্চর্যরকম অসাম্প্রদায়িক। বেশ কয়েকটি হিন্দু-মুসলমান চরিত্র এসেছে, এমন স্বাভাবিকভাবে তারা মিলেমিশে আছে যে তাদের আলাদা করে চেনাই যায় না। যারা সবাই একই ধরনের গরিব, তাদের হিন্দু-মুসলমানত্বে কী যায় আসে?

‘রংস্তুলিকুমার’ ও ‘লুপ্ত পূজাবিধি’ থেকে কমলকুমারের লেখায় হঠাৎ এক পরিবর্তন এসে গেল। যে কোনও সাহিত্যের ইতিহাসেই এ রকম অস্তুত ঘটনা কঢ়ি ঘটে।

সকলেরই জানা আছে যে বঙ্গিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র যে সাধু ক্রিয়াপদ দিয়ে

বাংলা লিখতেন, প্রমথ চৌধুরীর উদ্যোগে তার একটা মোড় ঘুরে যায়। লিখিত ভাষাকে মুখের ভাষার সঙ্গে খানিকটা সাদৃশ্য দেবার জন্য চলিত ক্রিয়াপদ এসে যায় প্রথমে গদ্যে, তারপর কবিতাতেও। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এটা গ্রহণ করায় সকলের মেনে নিয়ে সুবিধে হয়েছিল। তবু পুরোপুরি চালু হতে সময় লেগেছিল কিছু বছর। তারাশক্র-বিভূতিভূমণ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই প্রথম জীবনে সাধু বাংলায় লিখেছেন। জগদীশ গুপ্ত, সতীনাথ ভাদুড়ীও এক সময় সাধু বাংলা ত্যাগ করে চলিত বাংলা অবলম্বন করেছেন। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে কমলকুমারই একমাত্র ব্যতিক্রম, যিনি বেশ কিছু বছর চলিত বাংলায় লিখে হঠাৎ সেই বাংলা ত্যাগ করে লিখতে শুরু করলেন সাধু ভাষায়। এ রকম বিপরীত পথে যাত্রা যেন অবিশ্বাস্য।

শুধু তাই নয়, তাঁর বাক্য গঠন এমনই জটিল ও অস্তুত হতে লাগল যে সহজে বোঝে কার সাধ্য! যেন তিনি ভাষা-বন্ধনে এক কঠিন দেওয়াল তৈরি করছেন। অত্যন্ত কসরত করে পাঠক যদি সেই দেওয়াল লঙ্ঘন করতে না পারে, তা হলে তাঁর কাহিনীর মর্মে প্রবেশ করতে পারবে না। এ যেন প্রায় শারীরিক পরিশ্রম করে সাহিত্য পাঠ।

‘গোলাপ সুন্দরী’ গল্পটি যখন লেখা চলছে, তখন আমি একদিন ওয়েলিংটনের সাঙ্গুভালি চায়ের দোকানে বসে জিঞ্জেস করেছিলাম গল্পটার আর কতখানি বাকি! কমলকুমার মৃদু হেসে বলেছিলেন, আমরা এই স্টোরেজটা লিখছি, এতে খানিকটা সময় লাগছে। আমি বিশ্বিত হয়ে জিঞ্জেস করেছিলাম, ‘আমরা’ মানে? গল্প লেখায় আপনাকে কেউ সাহায্য করছে নাকি?’ তিনি গভীরভাবে বললেন, আমরা মানে শ্রীরামকৃষ্ণ আর আমি, এই দু’জনে মিলে লিখছি। আমার একার পক্ষে তো কিছু করা সম্ভব নয়।

আমি মনে করেছিলাম, এটা তাঁর নিজস্ব ধরনের একটা ঠাট্টা।

কিন্তু এরপরে তাঁর ‘খেলার প্রতিভা’ গল্পের আরম্ভ এরকম: “মাধবায় নমঃ তারা ব্ৰহ্মাময়ী মাগো, জয় রামকৃষ্ণ। ঠাকুৰ কৱল, যাহাতে আমরা অতীব গ্রাম্য—আমাদের নিজস্ব জীবনের ঘটনা সরলভাবে লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি।” ‘খেলার দৃশ্যাবলী’, ‘অনিয়ের দায় ভাগ’ গল্পগুলির আরম্ভ এরকম। তারপর থেকে এরকমই চলল।

সাঙ্গুভালি রেস্টোৱাঁয় সেই বিকেলটির কথা আমার আজও মনে পড়ে। দুর্বোধ্য মানুষটি তখন থেকে যেন আরও দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিলেন। এর আগে যিনি ঠাকুর-দেবতা, ধর্ম-ঈশ্বর নিয়ে নানারকম রঙ-রসিকতা করতেন, সেই মানুষটি এরপর থেকে মদ্যপানের আগেও স্মরণ করতেন রামকৃষ্ণের নাম।

‘গোলাপ সুন্দরী’ ও ‘অস্তর্জলি যাত্রা’ প্রকাশের পর তরুণ লেখকদের মহলে যখন হলুচুলু পড়ে গেছে, অনেকে তাঁকে কাল্ট-ফিগারে পরিণত করতে চায়, তখনই কমলকুমার সরে গেলেন এই সুন্দর রহস্যময় রচনারীতি থেকে। তিনি যেন এই পাঠকদেরও চান না। ব্যাপৃত হলেন কঠিন থেকে কঠিনতরের সাধনায়। এই সময়েই তিনি বলতে শুরু করলেন যে রবীন্দ্রনাথ কোনও লেখকই নন, ওই দাড়িওয়ালা লোকটি বাংলা ভাষার অনেক ক্ষতি করেছেন, বাংলা ভাষার আসল লেখক হলেন

বকিম। কিন্তু আমরা প্রশ্ন করতাম, বকিমের ভাষা তো জটিল নয়, বেশ সরল। বকিম অনেক আভিধানিক শব্দ প্রয়োগ করতেন বটে, কিন্তু বাক্য গঠনে অস্পষ্টতা কিছু নেই। কিন্তু কমলকুমারের দ্বিতীয় অধ্যায়ের গদ্য ভঙ্গিমার সামুজ্য কোথায়? সে গদ্য এই রকম: “বিদায় বিদায় হে অগ্নি তুমি আমা সবাকার চরিত্র নই, তুমি মৃত, তোমাকে তিনবার, আঘাত করিয়া হাসিলাম; যে বটে শোক করা ন অহিসি।”

“পাঠক কেহ যদি থাক, যদি কেহ জাগিয়া থাক, তবে আকর্ষণ কর মদীয় খেদ সকল।”

“এখন বলিব ইহা এক কুহকময় কুপাশ্রিত শরৎকাল, ইদানীং অরংশোদয়ের পূর্বে, ভোরে উচ্ছহাস্য শোনা যায়, যে এখন নৈরাশ্য নাই, বেশ্যা নাই, দুশ্মন নাই; সওদাগর নাই; হা এই মর জীবন। শস্য যাহার চেতনা দিবে, তাহা জীবন যুদ্ধ নামে অহংকার হইল...” (কালই আততায়ী)।

তবে কি কবিতার মতন এই গদ্যেরও প্রতিটি শব্দ বাজিয়ে বুঝে নিতে হবে। তাও যে কুলকিনারা পাওয়া যায় না। ভাষা বোঝার জন্য এত মল্লযুদ্ধ করতে হলে কাহিনীর মর্মে প্রবেশ করব কখন?

মাখানে কারা যেন রটিয়েছিল যে বাংলা গদ্যের ভিত্তি যেহেতু ইংরিজি সিনট্যাক্স, তাই কমলকুমার ওই গদ্য মানেন না। তিনি ফরাসি ভাষ্যবিদ, তিনি ফরাসি সিনট্যাক্সের প্রবর্তন করতে চান বাংলা গদ্যে। এই দাবি নিছক অতুল্কি ছাড়া আর কিছুই নয়। ফরাসি গদ্যে বিশেষ্য বিশেষণে কুর্বনও কখনও স্থান পরিবর্তন হয় বটে, যেমন কালো বেড়ালকে বলা যায় বেড়াল কালো। কিছু উৎপ্রেক্ষারও তফাত আছে, কিন্তু ইংরিজি ও ফরাসি গদ্যের কাঠামো মোটামুটি এক। কমলকুমারের এই গদ্যের কোনও ব্যাকরণ নেই।

আগে অন্য কেউ কমলকুমারের রচনাকে দুর্বোধ্য বললে চটে যেতাম, এখন নিজেরাই হোঁচট খাই পদে পদে। সংলাপেও সাধু ভাষা, ছিল'র বদলে আছিল, নেহারিল, আভাসিল ইত্যাদি ব্যবহারের কোনও যুক্তি খুঁজে পাই না। একদিন সাহস সঞ্চয় করে প্রশ্ন করেছিলাম, ভাষাকে এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আপনি?

কমলকুমার বলেছিলেন, দ্যাখো, ভাষা নানা রকম হয়। একই ব্যক্তি দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম ভাষা ব্যবহার করে। সকালে বাজারে গিয়ে এক রকম ভাষা, বাবা-মায়ের সঙ্গে আর এক রকম ভাষা, প্রেমিকার সঙ্গে অন্য ভাষা, তাই না? সাহিত্য হচ্ছে সরস্বতীর সঙ্গে সংলাপের ভাষা, তা আলাদা হতে বাধ্য!

কিন্তু দেবী সরস্বতীর মতন এক হাস্যমুখী, সুশ্রী যুবতী কেন খটোমটো বাক্য পছন্দ করবেন, তা আমার ঠিক বোধগম্য হয় না। ঠাকুর-দেবতাদের সঙ্গে কেউ যদি বাক্যালাপ করতেই চায়, তবে প্রেমের ভাষাই তো প্রকৃষ্ট। ভাষা বিষয়ে যারা অজ্ঞ, তারাও প্রেমের ভাষা বোঝে।

মোট পঁয়ষষ্ঠি বছর বেঁচে ছিলেন কমলকুমার। এর মধ্যে সাহিত্যে মনোনিবেশ করেছিলেন শেষ কুড়ি বছর। গল্প লিখেছেন মাত্র তিরিশটি, তাও দু'তিনটি অসমাপ্ত। এর মধ্যে অর্ধেক গল্প ভাবনার ঐশ্বর্য, পুজ্জানপুজ্জ নির্মিতিতে, কাব্য ও চিত্রশিল্পের

মেলবন্ধনে বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। আর দ্বিতীয়ার্ধের গল্পগুলি ভাষার কঠিন বৃহের জন্য ঠিক মতন বিচার করা যায় না। সেগুলি কি এক লেখকের খামখেয়াল না আরও বড় সম্পদ তা কে জানে! আমি সেই গল্পগুলির রসের সন্ধান এখনও পাইনি। মাঝে মাঝেই সেগুলি পড়ি, হয়তো সারা জীবনই পড়ে যেতে হবে!

পূর্ণিয়া জেলার উইলিয়াম ফক্সার

সতীনাথ ভাদ্রুর ‘চোঁড়াই চরিতমানস’ যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন যে এই উপন্যাসখানি সম্মত তুলসীদাসের ‘শ্রীরামচরিত মানস’-এর আদলে লেখা। তুলসীদাসের গ্রন্থখানি অস্তত চার শতাব্দী ধরে সারা ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ। বাঙালিরা অবশ্য এ বইয়ের স্বাদ তেমন করে পায়নি, বাঙালিরা রামায়ণ পেয়েছে কৃতিবাস মারফত। প্রতিভার নিরিখে তুলসীদাস অনেকটা ঝাপসা পরিচয়ের, কৃতিবাসের চেয়ে বহুগুণ বড়। তুলসীদাসের ভাষাও খুব দুর্বোধ্য নয়, অনেকটা ব্রজবুলির মতন। হিন্দু বাঙালিরা রামকেও দেবতা হিসেবে তেমন উচ্চে স্থান দেয়নি, তাদের আরাধ্য কৃষ্ণ কিংবা শিব। তুলসীদাসের প্রভাবে সমগ্র হিন্দিভাষী অঞ্চলে রামই একমাত্র ভগবান। শুধু তাই নয়, ওই অঞ্চলের অক্ষর পরিচয়হীন সাধারণ মানুষও জীবনযাপনের সর্বক্ষেত্রে রামচরিতমানসের কোনও না কোনও শ্লোক থেকে নির্দেশ খুঁজে পান।

তুলসীদাসের নায়ক রাম, সতীনাথের নায়ক চোঁড়াই। বিহারের পূর্ণিয়া অঞ্চলে ছোট শহরটির নাম জিরানিয়া, রামায়ণের জীর্ণারণ্যের সঙ্গে এর মিল কষ্ট-কল্পনা করা যায়। তার অদূরে তাঁমাটুলি। তাঁমারা কোনও এক কালে তাঁতি ছিল, এখন সে পেশা ভুলে গেছে, নিছক এটা-সেটা করে একবেলা পেট ভরাবার মতন অন্নসংস্থান করে। মধ্যে একটা পাকি, অর্থাৎ পাকা রাস্তা, তার ওপাশে মেথরদের বস্তি। এই দুই অন্ত্যজদের প্রায়ই উপন্যাসটির মূল পটভূমি। তাঁমাটুলির ছেলে চোঁড়াই অতি অল্প বয়েসে বাবাকে হারায়। তার মা দ্বিতীয় বিয়ে করার সময়, ছেলেকে সঙ্গে রাখা সম্ভব নয় বলে তিন বছরের চোঁড়াইকে এক সাধুর পায়ের কাছে রেখে আসে। মহাকাব্যের নায়ক রামের সমান্তরালভাবে বেড়ে উঠতে থাকে এই অনাথ চোঁড়াই।

উপন্যাসের এই পরিকল্পনাটাই বিস্ময়কর।

বাঙালিদের কাছে বিহার খুবই পরিচিত। বহু বাঙালি এককালে ছড়িয়ে ছিল বিহারের সর্বত্র, যাতায়াতও অনবরত। বাংলা সাহিত্যে বিহারের কিছু কিছু ছবি পাওয়া গেছে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়। সে সবই আংশিক। বিহারের দরিদ্র, সাধারণ মানুষের কথা আছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যকে। খুবই উচ্চাসের বই নিঃসন্দেহে, কিন্তু বিভূতিভূষণ অতি রোমান্টিক, মানুষের চেয়েও প্রকৃতি তাঁর কাছে অনেক সময় প্রধান হয়ে ওঠে, তাঁর চক্ষু সব সময় সৌন্দর্যসম্পন্ন। আরণ্যক-এর সঙ্গে চোঁড়াই চরিতমানসের কোনও তুলনাই চলে না।

অন্যান্য লেখকরা লেখেন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, সতীনাথের যেন কোনও দৃষ্টিভঙ্গিই নেই। এমনকী তিনি যে বাঙালি লেখক, তাও কোথাও বোঝা যাবে না। অত্যন্ত কুশলতায় তিনি জিরানিয়া-তাঁমাটুলি-ধাঙ্ডটুলির যে জনজীবনের কথা লিখেছেন, তা যেন আপনা আপনি ফুটে উঠছে, লেখকের কোনও ভূমিকাই নেই এখানে। ভাষাটা বাংলা বটে, কিন্তু চরিত্রগুলির সংলাপে, এমনকী বর্ণনাতেও অনর্গল দেহাতি হিন্দি শব্দ, তুলসীদাসের দোহার টুকরো ছড়ানো যে মনে হয়, সমগ্র উপন্যাসটি ওখানকার নিজস্ব ভাষাতেই রচিত। এই দক্ষতা তুলনাইন, নিজেদের পরিচিত গণ্ডির বাইরের কথা যারা কিছুই জানে না, দেশ সম্পর্কে যাদের কোনও ধারণাই নেই, সেই রকম একটা তুচ্ছ অঞ্চলের মানুষের ওপর গাঁথীজী ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব কীভাবে পড়তে পারে, তা সতীনাথের আগে আমাদের কেউ দেখাননি। এই মানুষগুলির অন্ন নেই, তবু একটা বিশেষ জীবনবোধ আছে, এমনকী সংস্কৃতিও আছে। সেই জন্যই উপন্যাসটি পূর্খানপূর্খভাবে আঞ্চলিক হয়েও সর্বজনীনতায় উন্মীর্ণ হতে পেরেছে।

চৌড়াই ছেলেটি দোষে-গুণে ভরা। একটি জীবন্ত চরিত্রকেই মডেল হিসেবে নিয়েছিলেন সতীনাথ। বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সে ছাপিয়ে যাচ্ছে নিজস্ব পরিবেশ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র অঞ্চলটি একটু একটু বদলাচ্ছে। অতি ধীর ও সূক্ষ্ম সেই পরিবর্তন, সম্পূর্ণ নাটকীয়তা বর্জিত। এখানে ক্ষেত্রে উচ্চ আদর্শ চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। ইচ্ছাপূরণেরও কোনও স্থান নেই, সেইজন্যই এই বর্ণনা অসাধারণ। লকলক করছে প্রথর বাস্তব, কিন্তু আদিখ্যেতা কঁজা হয়নি দারিদ্র্য নিয়ে।

অনাথ চৌড়াই এক সময় গোরুগাড়ির চালক হল। প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছে তরুণ চৌড়াইয়ের সঙ্গে তার পছিমে জ্ঞান বিবাহবিচ্ছেদে। তুলসীদাস বলেছেন, যদিবা আরশির ওপর নিজের ছায়া ধরে রাখা সম্ভব, কিন্তু মেয়েদের মনের গতি জানা সম্ভব নয়। অত ভালবেসেও স্ত্রীর কেন মন পাওয়া গেল না, তা বুঝল না চৌড়াই, রাগে-দৃঢ়বে সে বিবাগী হয়ে গেল।

দ্বিতীয় খণ্ডে চৌড়াই-এর অভিজ্ঞতার জগৎ আরও বিস্তৃত হয়। বিপ্লবী বা ক্রান্তিদলের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তার। রামায়ণ ছাড়াও অন্যান্য কেতাবের কথা সে শোনে। নতুন রামায়ণ আর পুরনো রামায়ণে জট পাকিয়ে যায় তার মনে।

এই উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ড বা পরপর আরও অনেক খণ্ড লেখার ইচ্ছে ছিল সতীনাথের। লিখলেন না, মধ্যপথে ছেড়ে দিলেন। প্রথম কারণ তাঁর অপূর্ণতাবোধ। তিনি ভেবেছিলেন, চৌড়াইদের মতন মানুষদের চরিত্র মানস সরোবরের মতন বিশাল ও গভীর, সেটা তিনি ঠিক ফোটাতে পারছেন না। শিল্পী মাত্রেরই এ রকম অতৃপ্তি থাকে, আমাদের আফশোস, কেন তিনি আরও লিখলেন না।

না লেখার আরও একটি কারণ তিনি কৌতুকছলে জানিয়েছেন। ঠিক করেছিলেন, তৃতীয় খণ্ডে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে চৌড়াইদের মনের ক্রপরেখার পরিবর্তনও ধরে রাখবেন। সে খণ্ডের নাম দেবেন ‘উন্নত চৌড়াই চরিত’। সে

পরিকল্পনা শিকেয় তুলে রাখলেন, তার কারণ, এই উপন্যাস বাংলার পাঠকরা ঠিক মতন গ্রহণ করেনি। বইটি বিক্রি হয়নি, প্রকাশক বেজার হয়েছিলেন। সতীনাথ ডায়েরিতে লিখেছেন, “বইখানা যদি খুব বিক্রি হত, তা হলেও কি নায়কের চরিত্রের অপর্যাপ্ততার কথা তোমার মনে আসত? তা হলে কি তুমি, শুধু উন্নত ঢোঁডাই চরিত কেন, উন্নতরোভূত ঢোঁডাই চরিত পর্যন্ত লিখে চলতে না?”

আমাদের অধীত বিদ্যার মধ্যে উইলিয়াম ফক্নারের কথা বিশেষ মনে পড়ে এই উপন্যাস প্রসঙ্গে। সতীনাথ ভাদুড়ী আজীবন পূর্ণিয়াতেই কাটিয়ে গেলেন। সেখানকার পারিপার্শ্বকের যে-সমস্ত মানুষজন তিনি দেখেছেন, তাঁদের কথাই বেশি লিখে গেছেন। ফক্নারেরও একটা নিজস্ব অঞ্চল ছিল। নিজের বাসস্থানের কুড়ি মাইল গন্তির মানুষজন, সাদা, কালো বা লাল, তাদের কথাই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন একের পর এক উপন্যাসে। ফক্নারের সেই অঞ্চলটির নাম ‘ইয়োকনাপাটাওফা কাউন্টি’, (Yoknapatawpha County), যার ভিত্তিতে ‘স্যারকুচয়ারি’, ‘লাইট ইন অগাস্ট’, ‘দা আনভ্যাকুইশ্ড’, ‘দা হ্যামলেট’, ‘গোডাউন মোজেজ’ প্রভৃতি উপন্যাস লেখেন। আঞ্চলিক হয়েও সেগুলি সর্বজনীন।

ফক্নার নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। যে-সব উপন্যাসের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, তার অনেকগুলি তো আমরা পড়ে দেখি। সেই মানদণ্ডে নির্বিধায় বলা যায়, বাংলার একাধিক লেখকের নোবেল পুরস্কার অনেক আগেই পেতে পারতেন। ‘ঢোঁডাই চরিতমানস’ অবশ্যই সেই রকম পুরস্কারের যোগ্য। নোবেল কমিটির দুর্ভাগ্য, তাঁরা এরকম রচনার সংজ্ঞান পান না।

ফক্নারের সঙ্গে তুলনাটা আবশ্যিক কিছুদূর টানা যায়। ফক্নার বুদ্ধিজীবীদের কাছে বাহবা পেলেও জনপ্রিয় হননি। জীবনের একটা সময় তাঁর বই বিক্রি খুবই কমে যায়, প্রকাশকরাও বিমুখ হন, চালিশের দশকের গোড়ায় ফক্নার প্রায় বিশ্বৃত, একটিমাত্র বই ছাড়া আর কোনও বইই পাওয়া যেত না। ফক্নারের সৌভাগ্য, জীবদ্দশাতেই তিনি পুনরাবিস্থৃত হন, রবার্ট পেন ওয়ারেন-এর মতন তরুণ লেখকরা তাঁর বিষয়ে লেখালেখি শুরু করেন, যার ফলে র্যান্ডম হাউজের মতন বড় প্রকাশক আকস্ত হয়ে পুরনো বইগুলি ছাপতে শুরু করে আবার, পুরস্কারও আসতে থাকে একে একে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রথম উপন্যাস, ‘জাগরী’র জন্যই রবীন্দ্র পুরস্কার পান, অনেক মান্য সমালোচকের প্রশংসিত পেয়েছেন, কিন্তু সে রকম জনপ্রিয়তা কখনও পাননি, বেঁচে থাকতে থাকতেই তা আরও কমতে থাকে। মৃত্যুর কিছুদিন পরেই তিনি যেন বিশ্বৃত লেখকের পর্যায়ে চলে যান, তাঁর বইগুলিও দুর্লভ হয়ে পড়ে। ‘ঢোঁডাই চরিতমানস’ আর ছাপা হয়নি। তাঁর মৃত্যু ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে।

১৯৭২ সালে সনাতন পাঠক নামে এক তরুণ কলমনবীশ সতীনাথ ভাদুড়ীর বইগুলির অপ্রাপ্যতা বিষয়ে আক্ষেপ করে একাধিকবার লিখেছেন এই ‘দেশ’ পত্রিকায়। তিনি এই পত্রিকায় তখন নিয়মিত সাহিত্য সংবাদ লিখতেন। তখন সতীনাথের দাদা ভূতনাথ ভাদুড়ী উক্ত সনাতন পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ করে

বইগুলি পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করতে চান। কোনও বড় প্রকাশক আগ্রহী হননি, তবে সন্তান পাঠকের প্রয়োচনায় আকৃষ্ট হন অঙ্গু প্রকাশনী। অটিরকালের মধ্যেই শৰ্ষে ঘোষ ও নির্মাণ্য আচার্যের অতি সবচেয়ে সুবোগ্য সম্পাদনায় এবং সুনির্দিষ্টভাবে সতীনাথ ভাদুড়ীর সমগ্র রচনাবলী প্রকাশিত হয় চার খণ্ডে। সেই রচনাবলীই এখনও সুলভ।

ଦୈତ୍ୟକାହିନୀ

୧.

ହୋଯାଇଟ ଓଯେ ଲେଡ ଲ ନାମେ ଏକଟି ସୁବିଖ୍ୟାତ ଦୋକାନ ଛିଲ କଲକାତାଯାର । ଅତ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଏଥିନ ଆର କଲକାତା ଶହରେ ଏକଟାଓ ନେଇ । ସେଥାନେ ସୁଚ ସୁତୋ ଥେକେ ଆଲମାରି କିଂବା ଚଟିଜୁତୋ ଥେକେ ବାଇବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବହି ପାଓୟା ଯେତ । ସେଇ ଦୋକାନ ବାଡ଼ିଟିଇ ଏଥିନ ସଙ୍ଗିଓୟାଲା ମେଟ୍ରୋପଲିଟନ ବିଲ୍ଡିଂ । ନିଚେ ଇଉ ଏସ ଆଇ ଏସ, କଟେଜ ଇନ୍ଡାସ୍ଟ୍ରିଆଟି ଇତ୍ୟାଦି ।

ସେଇ ବାଡ଼ିର ସବଚେଯେ ଉଚ୍ଚ ତଳାୟ ଏକଟି ଫ୍ଲ୍ୟାଟେ ଏକ ବିକେଲବେଳା, ସଦ୍ୟ କୈଶୋର-ଛାଡ଼ାନୋ ଆମରା କଯେକଜନ ସମବେତ ହେଯେଛିଲାମ । ସେଟା ଉନିଶ ଶୋ ତିଥାମ ସାଲ, ଆମି ତଥନ ସିଟି କଲେଜେ ଥାର୍ଡ ଇଯାରେ ପଡ଼ି, ଦୀପକ ମଞ୍ଜୁମଦାର ସ୍କଟିଶାର୍ଟ କଲେଜେ ଫାର୍ସଟ ଇଯାରେ ; ଆମାର ସହପାଠୀ ମୋହିତ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ, ଶିବଶତ୍ରୁ ପାଲ । ଦୀପକେର ସହପାଠୀ ଆନନ୍ଦ ବାଗଚୀ । ଶଷ୍ଟ ଘୋଷ, ଅଲୋକରଙ୍ଗନ ଦାଶଗୁଣ୍ଠ ଆମାର ଚେଯେ ଦୁ'ଏକ ବଛରେର ସିନିଯାର, ଦେବେଶ ରାଯ়, ଦୀପେନ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ ଆମାର ସମସାମ୍ୟିକ, ଶକ୍ତି ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କେ ତଥନ ଚିନି ନା । ସେଇ ବଛର କୃତ୍ସିଦ୍ଧିତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ।

ସେଇ ବଛରରେ ଆମରା 'ହରବୋଲା' ନାମେର ଏକଟି ନାଟୁକେ ଦଲ ଗଡ଼େଛିଲାମ । ପ୍ରାତିନ୍ଦିନ ହୋଯାଇଟ ଓଯେ ଲେଡ ଲ ବାଡ଼ିର ଓପରତଳାଟି ଫ୍ଲ୍ୟାଟେ ସେଦିନ ଆମାଦେର ହରବୋଲାର ପ୍ରଥମ ଦିନେର ଅଧିବେଶନ ; ଅବିକଳ ତାରିଖଟା ମନେ ନେଇ । ଆମାଦେର ପ୍ରଧାନ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ବା ଉଂସାହଦାତା, ବା ନାଟକର ଭାବାୟ ଆମାଦେର କାହେ ତଥନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚାତ ଛିଲ, ଶୁଦ୍ଧ ତାଁକେ ଜ୍ଞାନତାମ ସିଗନେଟ ପ୍ରେସେର ପରିଚାଳକ ହିସେବେ । ଓଇ ଫ୍ଲ୍ୟାଟଟିଇ ଡି. କେ.-ର ବୋନ କଲ୍ୟାଣୀ ମଞ୍ଜୁମଦାର ଓ ତାଁର ସ୍ଵାମୀର, ଯାଁର ପୁରୋ ନାମ ଭୁଲେ ଗେଛି, ଶୁଦ୍ଧ ମିଃ ମଞ୍ଜୁମଦାର ବଲେଇ ଜ୍ଞାନତାମ ।

ଆମାର ସଂଗଠନ-ପ୍ରତିଭା ନେଇ । କୃତ୍ସିବାସ ପତ୍ରିକା ବା ହରବୋଲାର ଜନ୍ୟ, ଆମାଦେର ପକ୍ଷ ଥେକେ ମୂଳ ଉଦ୍ୟୋଗ ନିଯୋଛିଲ ଦୀପକ, ଆମି ଛିଲାମ ତାର ସହଚର ମାତ୍ର । ଆରା କଯେକଜନ ଛିଲ, ଯେମନ ଭାସ୍କର ଦସ୍ତ, ଆଶ୍ରତୋଷ ଘୋଷ, ଉଂପଲ ରାଯଚୌଧୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି । ...ଏରା ଆମାର ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ, ସାହିତ୍ୟର ପାଠକରା ଏଂଦେର ସଙ୍ଗେ ପରିଚିତ ନନ ।

ସେଇ ଦିନଇ ପ୍ରଥମ ବୋଧହୟ ଆମି ଲିଫ୍ଟ୍‌ଟେ ଆରୋହଣ କରି । ପୁରନୋ ଆମଲେର ପେଣ୍ଟାୟ ଲିଫ୍ଟ୍ ଆମାଦେର ପୌଛେ ଦିଯୋଛିଲ ଫ୍ଲ୍ୟାଟେର ଦରଜାୟ, ସେଥାନେ ସାଦା ଉର୍ଦ୍ଦି ପରା ଏବଂ ମାଥାୟ ମୁରେଠା ବାଁଧା ବେଯାରା ଆମାଦେର ସେଲାମ କରେ ବସବାର ଜାଯଗା ଦେଖିଯେ ଦିଯୋଛିଲ । ଏକଥାନି ସରେର ଆୟତନ ଟେନିସ କୋର୍ଟେର ମତନ ଏବଂ ଏମନଇ ଚାକଚିକ୍ୟଭାବେ ସାଜାନୋ ଯେ, ଆମରା କେଣ୍ଟ ଆଡିଷ୍ଟ ହେଁ ଗିଯୋଛିଲାମ । ଆମାଦେର ପାଯେ ଧୁଲୋ, ପ୍ଯାନ୍ଟେର ବୋତାମ ।

সব কটা ঠিকঠাক আছে কিনা এ সম্পর্কে সব সময় সজাগ থাকতে হয়। সরু থেকে মোটা হয়ে যাওয়া সূক্ষ্ম কাচের গেলাসে অবিলম্বে আমাদের হিমেল শরবত পরিবেশন করা হল, ডি. কে. আমাদের প্রত্যেককে একটি করে নতুন খাতা ও একটি আন্ত পেঙ্গিল দিলেন এবং জানালেন যে আমাদের নাট্য পরিচালক এখনি এসে পড়বেন।

তিনি যখন এলেন, প্রথম দর্শনে আমরা খানিকটা হতাশই হলাম। যে-রকম পরিবেশ ও যে-ধরনের আদর-আপ্যায়ন, তাতে মনে হয়েছিল, নাট্য পরিচালক নিশ্চিত হবেন প্রমথেশ বড়ুয়ার মতন ঝুপবান ও সাহেবি ব্যক্তিত্বময় কেউ। যিনি এলেন তিনি একজন কুচকুচে কালো চেহারার বলিষ্ঠকায় পুরুষ, ধৃতি ও পাঞ্চাবি পরা, খুব পরিষ্কার নয়, হাতে একটি চট্টের তৈরি রেশন ব্যাগ। তাঁকে অনেকটা আমাদেরই মতন মানুষ দেখে স্বস্তি পাওয়া উচিত ছিল, তবু যে খানিকটা নিরাশ হয়েছিলাম, তার কারণ আমাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে বোধহয় খানিকটা সুস্পষ্ট স্ববারি থাকে।

তিনি কমলকুমার মজুমদার। সেই প্রথম দেখা। এর আগে শুধু নাট্যজগৎ কেন, কোনও জগতেই তাঁর নাম আমরা শুনিনি। ডি. কে. এবং অন্যান্যদের খাতির তিনি গ্রহণ করলেন অত্যন্ত বিনীত ভাবে। কার্পেটের শুপর আসল নিয়ে তিনি আমাদের সকলের পরিচয় জানতে চাইলেন। তাঁর ভাষা এই রকম, বাবুটির নাম কী? বাবুটির কী করা হয়? বাবুটির পিতার নাম? ধাকা হয় ক্ষোধ্যায়? এই ধরনের ভাষা আমরা উলিবিশ শতাব্দীর বইতে পড়েছি, হঠাৎ কাঙ্ক্ষ মুখ থেকে শুলে হকচকিয়ে যেতে হয়েই। কমলকুমারের বয়েস তখন চালিশেন বেশি নয়।

সেদিন দু'-চারটি বই থেকে কিছু পাঠ করে আমাদের কষ্টস্বর পরীক্ষা করা হয়েছিল, আর কিছু না। সেইদিনই, কিংবা আর দু'-চারটি অধিবেশনের পর, কমলকুমার ঘোষণা করেছিলেন, এমন কেতাদুরস্ত ফ্ল্যাটে থিয়েটারের রিহার্সাল চলবে না। বোধহয় তিনি বলেছিলেন, ‘এরকম বাঁধানো জায়গায়’।

ডি. কে. ওই জায়গাটি ঠিক করেছিলেন শহরের কেন্দ্রস্থলে বলে। সেখান থেকে হরবোলা সরে গেল কিছু দক্ষিণে। এলগিন রোডে, সুভাষচন্দ্র বসুর বাড়ির প্রায় উলটো দিকেই, আর. সেনের বিশাল জাহাজ মার্কা প্রাসাদ। সেই বাড়ির ধার বেঁধে বড় বড় পাথ ও দেবদাক ও রেন্টি শোভিত খানিকটা মোরাম বিছানো টানা পথ। তার শেষ প্রান্তের গৃহটি সিগনেট প্রেসের। বাড়িটি ইংরেজ-পছন্দ, সামনে পোর্টিকো ও সবুজ ঘাসে ভরা চতুর, দোতলা।

প্রথম ডানদিকের মন্ত বড় কক্ষটি সিগনেট প্রেসের অফিস এবং ডি. কে.-র নিজস্ব কাজের ঘর। অসংখ্য দেশি বিদেশি বইতে ঠাসা, এমনকী সংলগ্ন বাখরুমটিতে পর্যন্ত দুটি বইয়ের র্যাক। পর পর অনেকগুলি টেবিল পাতা, প্রতি শনি-রবিবার, সেইসব টেবিল ও সোফা-কোচ সরিয়ে দিয়ে পাতা হয় বিরাট শতরঞ্জি। ডি. কে. নিজে গাড়ি করে ঘুরে ঘুরে কোনওদিন বহুবাজারের ভীম নাগের দোকান, কোনওদিন বালিগঞ্জের গঙ্গুরাম থেকে নিয়ে আসেন বাছাই করা সন্দেশ ও শিঙাড়া, সেগুলি অফুরন্ত। এ ছাড়া মাঝে মাঝেই হাঁক পাড়লে দোতলা থেকে নেমে আসে সুদৃশ্য কাপে তিরিশ বক্রিশ

কাপ চা। অস্তত চাব পাঁচবার। আর শতরঞ্জির ওপর এদিক ওদিক ছড়ানো থাকত কয়েকটি গোল্ড ফ্লেকের টিন। আমার বয়েস তখন ছিল উনিশ, কলেজ জীবনে আমি ছিলাম একটি আদর্শবাদী ছোকরা, সিগারেট খাওয়াকেও অন্যায় মনে করতাম। (পরে অবশ্য সব পুষিয়ে নিয়েছি!) কিন্তু আমার বস্তুবান্ধব কেউ কেউ সেই সিগারেটের টিন কাত করে একসঙ্গে দশ-বারোটা নিয়ে পকেটে ভরতো।

ডি. কে. ছিলেন সব দিক থেকেই একজন বড় সাইজের মানুষ। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ছিলেন বিশাল, তাঁর হৃদয়খানা ছিল তাঁর শরীরের চেয়েও বড়। তিনি জমিদারপুত্র ছিলেন না, এক-এক সময় উপার্জন করেছেন প্রভৃতি, এবং ব্যয়ও করেছেন জলের মতন। শেষ জীবনেও তিনি একটি বাড়ি বানাননি বা অঠেল বিষয়সম্পত্তি রেখে যাননি, যতদূর জানি। আমাদের প্রত্যেক দিনের রিহার্সালে তিনি খরচ করতেন অস্তত দুশো টাকা, সেই চকিষ বছর আগে! —একটু রাত হলে আমাদের মতন কয়েকজনকে তিনি নিজে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি পৌছে দিতেন এলগিন রোড থেকে শ্যামবাজার। যারা হাওড়া বা বেহালা থেকে আসত, তাদের পকেটে জোর করে দশ-পনেরো টাকা গুঁজে দিয়ে খুব মনুভাবে বলতেন, ট্যাঙ্ক নিও। হরবোলার কোনও সদস্য কখনও চাঁদা দেয়নি, কোনও অভিনয় অনুষ্ঠানে টিকিট বিক্রি করা হয়নি, সমস্ত ব্যয় বহন করেছেন ডি. কে. একলা। সবই শব্দের ছন্দন। এসব শৌখিন মানুষ এখন আর একজনও আছে কিনা জানি না। যদিও ডি. কে.-র চেয়ে হাজার গুণ ধনী অস্তত এক হাজার বাঙালি এখনও আছে কলকাতায়। ডি. কে. সামন্তত্বকে ঘৃণা করতেন, কিন্তু মনে মনে তিনি ছিলেন যেন জোড়ামুকোর ঠাকুরবাড়ির শৌখিন পুত্র।

তিনি তখন একটি সাহেবি কোম্পানির বাঙালি কর্তৃধার। তা ছাড়া সিগনেট প্রেসের কাণ্ডকারখানায় বাংলা সাহিত্য ও প্রকাশক জগতে ঘটিয়ে দিয়েছেন তলুঁতুল। তিনি উদ্যমী পুরুষ হিসেবে পরিচিত। আসলে, তিনি মানুষটি ছিলেন লাজুক। তিনি বাইরের সভা-সমিতিতে বা সামাজিক অনুষ্ঠানে যাওয়া-আসা করতেন না বিশেষ। নিজের বাড়ির পরিবেশে এক এক সময় মন ও মুখ খুলতেন। এর মতন বিখ্যাত আড্ডাবাজ কদাচিৎ মেলে। ডি. কে.-র সঙ্গে আড্ডায় বসলে মন্ত্রমুক্তের মতন আটকে যেতে হত। তাঁর সঙ্গে প্রথমদিন সাক্ষাৎকারে আমরা গিয়েছিলাম সকাল নটায়, উঠেছিলাম দুপুর প্রায় তিনিটোয়—তাও আমরাই আগে থেকে। অথচ উনি ছিলেন খুবই ব্যস্ত লোক।

সবচেয়ে বিশ্বাস্যকর ছিল, আমাদের প্রতি তাঁর সম্মানবোধ। তখন তাঁর বয়েস আমাদের অস্তত দ্বিগুণ। অথচ, তিনি বহুদিন পর্যন্ত আমাদের সকলকে ‘আপনি’ বলে সম্মোধন করতেন। সাধারণত ওর মতন বয়েসিদের কাছে আমার বয়েসিদের সিগারেট লুকোবার কথা, অথচ তিনি নিজে সরবরাহ করতেন মূল্যবান সিগারেট, আমাদের যুক্তি ও মন্তব্য তিনি শুনতেন মন দিয়ে এবং ব্যবহার ছিল যেন তিনি ও আমরা সমান সমান। অথচ তা হতেই পারে না। আমাদের তুলনায় ডি. কে.-র সাহিত্যপাঠ ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। ডস্টয়েভস্কি ও ফ্রান্স কাফকার রচনার বিষয়ে তিনি প্রথম আমাদের আকৃষ্ট করেন। এবং তিনিই ছিলেন অত্যন্ত বেশি রকমের

বাংলি, বাংলা সাহিত্যকে তিনি এমন ভালবাসতেন যেন এর গায়ে সামান্য আঁচড় লাগলে তাঁর নিজের শরীরে রক্ষপাত হবে।

হরবোলাকে নিছক নাটুকে দল করার ইচ্ছে তাঁর একদম ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন, সেখানে সমবেত হয়ে আমরা সকলে সংগীত-সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কে অনুরূপ হব। কোনও কোনও সঙ্গে শুধু আধুনিক শিল্পীদের ছবি বিষয়ে আলোচনায় কেটে যেত। কথনও গান। নাটকের অভিনয়ের জন্য প্রত্যেকের গান গেয়ে গলা সাধা দরকার এই বিষ্঵াসে তিনি ডেকে এনেছিলেন ওস্তাদ ফেয়াজ খাঁর এক শিশ্য সঙ্গোষ রায়কে, কিছুদিন পর এসেছিলেন প্রখ্যাত কবি ও গায়ক জ্যোতিরিণ্ড্র মৈত্র, আমাদের বটুকদা। আমার গলায় একদম সুর নেই তবু আমাকে দিয়ে গান গাওয়াবার জন্য ওই দু'জন কত পণ্ডিত্যম করেছেন। শেষ পর্যন্ত আমি কোরাস দলে কোনওক্রমে পেছনের দিকে স্থান পেয়েছিলাম। বটুকদার কাছ থেকে শেখা গান, ‘জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমস্ত্রণ’—পরবর্তীকালে আমরা পঞ্চাশের কবিরা নিজস্ব ন্যাশনাল অ্যানথেম করে ফেলেছিলাম।

নিজে গান গাইতেন না ডি. কে., কিন্তু গান সম্পর্কে গভীর আগ্রহ ছিল তাঁর। তাঁর রেকর্ড সংগ্রহ ছিল দেখবার মতন। তাঁর স্বভাবের অনেক কিছুই বিচ্ছিন্ন। শুনেছি, তিনি রোজ রাত দুটো পর্যন্ত কাজ করতেন, তারপর স্নান করে খেতে বসতেন রাত তিনটোর সময়। যায়াবরের দৃষ্টিপাতের পাণ্ডুলিপি তিনি প্রকাশ না করে প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ ভূমিকায় লেখককে মৃত বলে মিথ্যে রাঁচিয়ে দেওয়া তিনি অরুচিকর মনে করেছিলেন। এবং তিনিই অতি তরুণ কুন্তিমরেশ শুহ ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন অতি সুস্থানের সঙ্গে।

জীবনানন্দ দাশের কোনও কৃতিত্বের বই-ই যখন পাওয়া যেত না, তখন ডি. কে. প্রকাশ করলেন ‘বনলতা সেন’ এবং পরপর কাব্যগ্রন্থগুলি। সেই আমরা প্রথম জীবনানন্দ দাশকে চিনলাম। ছাতা হাতে নিয়ে জীবনানন্দকে দু'-একবার আসতে দেখেছি ডি. কে.-র কাছে। ‘বনলতা সেন’-এর চমৎকার প্রচ্ছদ একেছিলেন সত্যজিৎ রায়। যদিও কবি সেই মজাট সম্পর্কে নাকি পরে বলেছিলেন, মুখখানা অনেকটা রাজকুমারী অযুক্ত কাউরের মতন কি? এ গল্পও ডি. কে.-র কাছে শোনা।

কমলকুমার মজুমদারও গায়ক নন। কিন্তু তিনি সবসময় গুণ্ডুন করে সুর ভাঁজতেন। এতে কঠস্বর ভাল থাকে, তিনি বলতেন। ওই গুণ্ডুনানি ও লবঙ্গ প্রতিনিয়ত তাঁর মুখে। একটি পিরিচ ভর্তি লবঙ্গ প্রতিদিন রাখা হত তাঁর সামনে, ফুরিয়ে গেলেই আবার লবঙ্গের জন্য হাঁক। একসঙ্গে অতি লবঙ্গ খেতে আগে কারুকে দেখিনি।

কমলকুমার মজুমদার, জ্যোতিরিণ্ড্র মৈত্র ও ডি. কে.—এই তিনজন এক একদিন এমন সব প্রসঙ্গ তুলতেন যে আমরা থ হয়ে শুনতাম। আই পি টি এ-র স্বর্ণযুগে আমরা ছিলাম বালকমাত্র, বটুকদা বলতেন সেই সময়ের কথা। বটুকদার মুখে সব সময় একটা কৌতুকের হাসি মাথানো থাকত। তিনি বলতেন ছোট ছোট বাক্য, হঠাৎ হঠাৎ করতেন অন্যের কঠস্বর নকল কিংবা শুরু করে দিতেন প্রাসঙ্গিক গান। কমলদা

ভালবাসতেন তাঁর বয়েসের চেয়েও বেশি আগেকার গল্প বলতে। উনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্ম-হিন্দু ঝগড়ার কাহিনী উনি এমনভাবে বলতেন, যেন ওসব তাঁর নিজের ঢোকে দেখা। যাঁরা শুধু কমলকুমারের রচনা পড়েছেন, তাঁরা কল্পনাই করতে পারবেন না কমলকুমারের মুখের ভাষা কত সরাসরি ও জীবন্ত। তাঁর মুখের ভাষাকে বলা যায়, কাঁচা বাংলা। হৃতোম প্র্যাচার নকশায় কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের মুখের ভাষা যেমন জীবন্ত কাঁচা বাংলা। এর মধ্যে খুব সাবলীল ভাবে এসে পড়ত আদিরসাঞ্চক প্রসঙ্গ। বটুকদা গলাখাঁকারি দিয়ে তখন বলতেন, হাঁ হাঁ, আঠারো বছর বয়েস হলে সবাই বন্ধু। কমলদা এসব কিছু গ্রাহ্যই করেননি কখনও। সেই সময় আমাদের এক বন্ধুর উপর্যুপরি বাবা ও মা মারা যান। তাঁরা রেখে যান কিছু বিষয়সম্পত্তি। সে বার্তা শুনে কমলদা সহাস্যে বলেছিলেন, এসো, এবার ওকে একটু বখানো যাক! তারপরই ‘সধবার একাদশী’ কোট করে বলতেন, একজন বড়মানুষের ছেলে বখলে দশজন মাতালের প্রতিপালন হয়! (অথবা, এই মর্মে কিছু!) অবশ্য, খালাসিটোলা নামে এক অলীক প্রমোদস্থানে কমলদার সঙ্গে আমরা যাতায়াত শুরু করেছিলাম এর বেশ কয়েক বছর পরে।

কমলদার সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব ছিল বিখ্যাত ব্যক্তিদের চরিত্রহননে। একবার তিনি একটি খরগোশের কথা বলেছিলেন ওর গোঁফ অবিকল আশু মুখুজ্জের মতন। তারপর সেই খরগোশটার কঠা বাচ্চা হল, ত্রুটি মধ্যে একটার গোঁফ আবার শ্যামাপ্রসাদের মতন হবছ। তখনকার একজন সাড়া-জাগানো তরুণ গদ্যলেখক, আমাদের প্রিয়, তাঁর সম্পর্কে কমলদা বলেছিলেন, ও তো টিপসই দিয়ে মাইনে নেয়। আর একজন জনপ্রিয় উপন্যাসিক সম্পর্কে বলেছিলেন, হ্যাঁ ওমুক তো, ঠিক বুঝতোর মতন মুখখানা।

ডি. কে. শুধু গল্প উসকে দিতেন। হঠাৎ হয়তো বললেন, মনে আছে, বিচিত্রা ভবনের সেই মিটিং-এ রবীন্দ্রনাথ...। অমনি কমলদা বা বটুকদা সেই প্রসঙ্গে নানা ঘটনা বলতে লাগলেন। ডি. কে. উপভোগ করতে করতে বারবার চিবুক ছোঁয়াতে লাগলেন নিজের বুকে। একেবারে শেষে এমন একটা মন্তব্য করতেন, যাতে হাসিতে ফেটে পড়তাম সবাই। রসিকতা ও বুদ্ধির সমন্বয়ে সব কথাবাত্তি বাঁধা থাকত খুব উচ্চ পরদায়। এলেবেলে কথা বা স্মল টক কোনও পাস্তাই পেত না। তখনও অবশ্য আমরা কমলদার লেখক পরিচয় জানতাম না বিশেষ কিছু। জানতাম, উনি ছবি আঁকেন। আমাদের সামনেই অনেক সময় ক্ষেচ করতেন, এবং সে সময় কিছু উড়-কাট নিয়ে মগ্ন ছিলেন। কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে কমলদা একদিন এক ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে হালকা ভাবে বলেছিলেন, এ গোপাল ঘোষ, ছবি এঁকে খায়। জলরঙের ছবি ও ক্ষেচের জন্য তখন গোপাল ঘোষের খুব নাম। তিনিও হালকা ভাবে উন্তর দিয়েছিলেন, আপনি তো আর মন দিয়ে ছবি আঁকলেন না কমলবাবু! তা হলে আঁকদের ভাত মারতেন!

কিছুদিন পর অরুণকুমার সরকার ও নরেশ গুহর মুখে শুনেছিলাম, কমলদা একসময় সাহিত্যপত্র ও চতুরঙ্গে গল্প লিখতেন। বরাবরই দেখেছি, কবিরাই কমলদার

রচনার বেশি অনুরাগী। পরবর্তীকালেও একদল কবিই কমলদাকে নিয়ে খুব হইচই করেছে। হরবোলায় আমাদের সঙ্গে চেনাশুনো হবার কিছুকাল পরেই প্রকাশিত হয় কমলদার প্রথম উপন্যাস ‘অস্তর্জলী যাত্রা’। তারপর তাঁর একটি গল্প ‘ফৌজ-ই-বন্দুক’ এবং একটি উপন্যাস ‘সুহাসিনী পমেটম’ ছাপা হয় কৃতিবাসে।

হরবোলা নাট্য সংস্থায় থাকতে থাকতেই আমরা কয়েকজন প্রকাশ করি কবিতার পত্রিকা কৃতিবাস, ডি. কে. র প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায়। ডি. কে.-ই আমাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ওই পত্রিকায় শুধু তরুণতম কবিদেরই রচনা থাকা উচিত। কিন্তু কৃতিবাসের কথা নয়। এখানে শুধু বলি হরবোলার কথা।

আমাদের প্রথম পালা ছিল সুকুমার রায়ের ‘লক্ষ্মণের শক্তিশেল’। এই নাট্কিকার গানগুলি সুকুমার রায়ই সুর দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই স্বরলিপি উদ্ধার করে প্রতিটি গান শেখানো হল আমাদের। ‘আমাদের’ কথাটা প্রকৃত সামগ্রিক অর্থেই ব্যবহার করা হল। তখনও গ্রন্থ থিয়েটার আন্দোলন প্রবলভাবে দানা বাঁধেনি, বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবাগ্র’ সকলকে চমকিত করেছে এবং ‘বহুকুপী’ দল ধারাবাহিক ভাবে আমাদের ঝটি বদলের কাজ করে যাচ্ছে। ভাঙা মধ্যে শিশির ভাদুড়ী করে যাচ্ছেন তাঁর শেষ অভিনয়গুলি। কমলদার নির্দেশনা আমাদের কাছে সব অর্থে নতুন। মেঝেতে খড়ির দাগ কেটে প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করা তো ছিলই। এ ছাড়া তিনি আমাদের প্রত্যেককে পুরো নাটকটি সব গান সমেত মুক্ত্যন্তরিয়ে ছেড়েছিলেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকে একা একা নাটক বলতে পারতাম।

রিহার্সাল চলেছিল ন’ মাস। নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে। এই নাটকের মধ্যে ছিল অনেক ছেট ছেট নাটক। বাড়ির সামগ্র্যে মুক্তাঙ্গনে বাঁধা হল মঞ্চ। মডার্ন ডেকরেটার্স কৃত। সেই মঞ্চে রইল দেড় মাস। এত দীর্ঘ সময় মঞ্চ বেঁধে রাখা যে কী বিপুল খরচের ব্যাপার, আমরা তখন বুঝিনি। প্রতিদিন স্টেজ রিহার্সাল হয়। একেবারে ক্রটিহীন না হলে পালা অভিনয়ের তারিখ ঘোষণা করা হবে না। কিন্তু ক্রটিহীন কার কাছে?

প্রথম দিনই, মঞ্চ বাঁধা সম্পূর্ণ হবার পর কমলদা সেটি পর্যবেক্ষণ করে বললেন, কাটতে হবে!

তক্ষুনি মানে বুঝিনি। পরে বোৰা গেল, কমলদার মতে মঞ্চটি চার ইঞ্চি বেশি উচু হয়ে গেছে। ফলে দর্শকদের চোখের সীমারেখা ঠিক থাকবে না। মঞ্চ তো কাটা যায় না, পুরোটা খুলে আবার বানাতে হয়। পাঁচ না দশ হাজার কত টাকা ব্যয়ে যেন গঠিত সেই মঞ্চ ভাঙার প্রস্তাবে আমরা নির্বাক। ডি. কে. কিন্তু কিছুতেই দমে যান না। একটুক্ষণ চিন্তা করেই বললেন, আর এক কাজ করলে হয়। লরি করে মাটি এনে পুরো চতুরটাই যদি উচু করে দেওয়া যায় চার ইঞ্চি? থিয়েটারের কারণে মাঠ উচু করে ফেলার প্রস্তাব এর আগে কেউ কখনও দিয়েছেন কিনা ইতিহাসে লেখা নেই। এটা প্রায় কাজে পরিণত হতে যাচ্ছিল, এমন সময় নীলিমা দেবী, যিনি সিগনেট প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা, আমাদের বন্ধু সুনন্দ গুহ্ঠাকুরতার মা এবং ডি. কে.-র ষষ্ঠ্যমাতা, তিনি ডি. কে. এবং কমলদাকে সহায় ধর্মক দিয়ে বললেন, এসব কী হচ্ছে পাগলামি।

মণ্ড চার ইঞ্জি ছোট-বড় হলে কী আসে যায়। পৃথিবী উলটে যাবে? আপনারা কি অমর-নাটক করতে যাচ্ছেন? হোয়াট কলসিট!

ডি. কে. একবার পরিকল্পনা করেছিলেন রাবণ মঞ্চে নামবে হেলিকপ্টার থেকে। কী একটা সামান্য কারণে সেটা বাতিল হয়। তারপর তিনি বললেন, রাবণের কুড়ি হাত হবে কোলাপসিবল। এমনিতে দুটো হাত, হঠাৎ সে দুটি উচু করলেই ঘট ঘট করে আরও আঠারোখানা হাত বেরিয়ে পড়বে! কিন্তু তা হলে ন' খানা কোলাপসিবল মুখেরও ব্যবহৃত রাখতে হয়। এ ভূমিকার অভিনেতা সুনন্দ ওরফে বুজ্জা নিজের একাধিক মুখ বিষয়ে আপন্তি তুলে ওটা বানচাল করে দেয়।

কমলদা তাঁর প্রতিভা দেখান পোশাকের ব্যাপারে। পোশাক ভাড়া করার প্রশ্নই ওঠে না। চরিত্র অনুযায়ী পোশাকের তিনি ছবি এঁকে দিলেন। ডি. কে. বললেন, এইসব পোশাক তৈরি হবে আমাদের চোখের সামনে। চলে এল দু'-তিনজন ওস্তাগর, সেলাইকল সমেত। ঘর্ঘর শব্দে সেলাই হতে লাগল পোশাক। হঠাৎ মাঝপথে তাদের একজনকে থামিয়ে কমলদা বললেন, সুগ্রীবের পোশাকের জন্য ডামাসেন্ট ক্লথ চাই। সেটা কী বস্তু কে জানে? ডি. কে. লোক সাগালেন সারা কলকাতায়। বড়বাজার থেকে অতি কষ্টে জোগাড় করা গেল, সেটা একটা মাঝে মাঝে উচু উচু কাপড়, তাতে তৈরি হল পোশাক, তা দেখেই কমলদা বললেন, হবে না চলবে না, বেশি চকচক করবে— বারো আনা গজের লং ক্লথ আনো।

বলাই বাহুল্য, বারো আনা গজে গামছা ক্লাপড়ও পাওয়া যায় না।

লক্ষণের শত্রুশেল-এর অভিনয় হয়েছিল পরপর দু' দিন। তাতে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার সুধীসমাজের বেশ বড় একটি অংশ। দর্শকরা সবাই নির্বাচিত আমন্ত্রিত। ফ্রি পাশ বন্ধ।

পরের নাটক 'মুকুধারা'। কমলদা রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গোধন করতেন দাঢ়িবাবু। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ধারার মানুষ, ব্রাহ্মদের সম্পর্কে তাঁর জাত-বিরাগ আছে। বক্ষিমচন্দ্রের পর তিনি অনেকখানি ডিঙিয়ে এসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বেচ্ছ হিসেবে মানেন। কিন্তু 'মুকুধারা' নির্বাচিত হবার পর তিনি বললেন, এর থেকে একটি লাইনও কাটা হবে না। প্রত্যেকের চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখা হবে। মুকুধারা নাটক সম্পূর্ণভাবে আগে কখনও অভিনীত হয়নি, রবীন্দ্রনাথও করেননি। প্রায় পঞ্চাশ ছাপ্পামঞ্জ অভিনেতা-অভিনেত্রীর দরকার। ডি. কে. ঠিক করলেন, এই 'মুকুধারা' নাটকের সম্পূর্ণসং অভিনয় হবে।

সামনের জাহাজ মার্ক বাড়িটি আর. সেন নামে এক ব্যবসায়ীর। সে বাড়ির মেয়ে দীপাঞ্চিতাকে বিয়ে করেছেন তরুণ রায়। তিনিও দলবল নিয়ে সেই বাড়িতে 'মুকুধারা' রিহার্সাল দিচ্ছিলেন, আমরা আওয়াজ শুনতে পেতাম। তরুণ রায় প্রস্তাব দিলেন দুটো দল মিলিয়ে অভিনয় করার—একই নাটক যখন। কমলদা রাজি হলেন না। এ ছাড়াও, কখনও কালী ব্যানার্জি, কখনও অরুণ গুহষ্টাকুরতার মতন খ্যাতিমান কয়েকজন এসেছেন, কমলদা নিতে রাজি হননি। তিনি সম্পূর্ণ নতুনদের গড়েপিটে নিতে চাইতেন। আমাদের মধ্যে দীপক মজুমদারের অভিনয় ও গানে যথেষ্ট দক্ষতা

ছিল, বাকি সবাই আনাড়ি, কিন্তু সবাই মিলে দারুণ মেতেছিলাম। মুক্তধারার একটি ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন এক ছিপছিপে চেহারার সুন্দরী তরুণী, তিনি পরে গৌরী আইয়ুব।

হরবোলা চলাকালীনই ডি. কে. আর একটি বিরাট কাণ্ড করেছিলেন। সিনেট হলে কবি সম্মেলন। তার আগে কবি সম্মেলন জিনিসটার অতটা চল ছিল না। হঠাৎ ওই কবি সম্মেলনের চিঞ্চা ডি. কে.-র মাথায় কেন এসেছিল, তা বলতে পারব না আমি, তখনকার কালের প্রতিষ্ঠিত কবিরাই ছিলেন এ ব্যাপারে ডি. কে.-র সহায়তাকারী। অত বড় কবি সম্মেলন, তার আগে তো কখনওই নয়, পরেও এ পর্যন্ত আর একটাও হয়নি। সিনেট হল ছিল বোধহয় কলকাতার পেশায়তম হল, সেখানে দু' দিন ধরে কবি সম্মেলন, দলমত নির্বিশেষে সমস্ত কবির। জীবনানন্দ, সুধীপুন্নাথ সবাই বেঁচে। যতদূর মনে পড়ে, বুদ্ধিদেব বসু তাঁর চরৎকার কর্তৃত্বের নিজের অনেকগুলি এবং তাঁর বক্তু প্রবাসী অমিয় চক্ৰবৰ্তীর কয়েকটি কবিতা শুনিয়েছিলেন। জীবনানন্দ দাশ ঘড়ের বেগে পাগলাটে গলায় পর পর অনেকগুলো কবিতা পড়ে গেলেন। কী দারুণ সিরিয়াস মুখ করে তিনি পড়েছিলেন ‘সেই সব শিয়ালেরা—’। আর কোনও প্রকাশ্য সভায় তাঁকে আর দেখা যায়নি। দু'দিনের অনুষ্ঠানের প্রায় শতাধিক কবিদের নামের তালিকায় সবচেয়ে শেষের নামটি ছিল আমার।

সেই কবি সম্মেলনের আহায়ক হিসেবে মুদ্দিও নাম ছিল আরও দু'জনের, নীহারণজ্ঞ রায় ও আবু সয়ীদ আইয়ুব—কিন্তু ব্যবস্থাপনা সব ডি. কে.-রই। ডি. কে. কোনওদিনই ছোট আকারের কিছু ভাবতে পারতেন না। খরচপত্রও নিশ্চয়ই সব তাঁর পকেটেরই। এবং তিনি প্রত্যেককে বঙ্গে দিতেন, মাইক থেকে কতটা দূরে মুখ রাখতে হবে, শব্দের শেষ অক্ষরটির ওপর কেমনভাবে জোর দিতে হবে। এমনকী, তিনি হরবোলার ঘণ্টে এই কবি সম্মেলনের একটি প্রাক রিহার্সালেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। কোনওমতে একটা কবিতা পড়ে দিলেই হল না। প্রতিটি বাক্য ও শব্দ যেন শ্রোতাদের কাছে ঠিকঠাক পৌঁছয়, সেজন্য প্রস্তুতি দরকার। ডি. কে.-র এই উদ্যোগের জন্যই সিনেট হলের অন্তত হাজার পাঁচেক শ্রোতা পিন ফেলার শব্দ না করে সব কবিতা শুনেছিল।

যে কোনও কারণেই হোক, কমলদা এই কবি সম্মেলনের ব্যাপারটা খুব একটা পছন্দ করেননি। আমাদের নাটকের রিহার্সালের ব্যাঘাত ঘটিয়ে কিছুদিনের জন্য এই কবি সম্মেলন নিয়ে মাতামাতি করাটা তিনি খুব সুনজরে দেখতেন না। পরে এই জন্য তিনি আমাদের একই পার্ট অন্তত পঞ্চাশবার পুনরুক্তি করিয়ে খুব শাস্তি দিয়েছিলেন।

ডি. কে. ও কমলদার বক্তৃত্ব ছিল খুবই প্রগাঢ়। কিন্তু বাইরে তার কোনও প্রকাশ ছিল না। দু'জনেই পরস্পরকে বুঝতেন খুব সঠিকভাবে। কমলদা মাঝে মাঝে ডি. কে.-কে খোঁচা মারতেন বড়লোক বলে। ডি. কে. মুচকি মুচকি হাসতেন। কারণ কমলদাও কলকাতার এক বিশিষ্ট বনেদি বাড়ির মানুষ। মাঝে মাঝে একখানা জামেয়ার গায়ে জড়িয়ে আসতেন, যার দাম অন্তত আট-দশ হাজার টাকা। ওঁদের সেই বক্তৃত্বের মধ্যে হঠাৎ একদিন বজ্জপাত হল।

কতদিন ধরে মুক্তধারার রিহার্সাল চলেছিল মনে নেই, এক বছর তো হবেই। এর মধ্যে সকলেই এক আধ দিন অনুপস্থিত থেকেছে। একমাত্র ডি. কে. ছাড়া। প্রত্যেকদিন পাঁচ ছ’ ঘণ্টা ধরে তিনি বসে থাকতেন একটানা। তিনি নিজে অভিনয় করেন না। তিনি নাট্য-পরিচালক নন। অথচ ওই নাটকই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। কী তীব্র শখ। রিহার্সালের সময় কারুর উচ্চারণ বা ডেলিভারি পছন্দ না হলে তিনি প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলতেন, কমলবাবু।

কমলদা মাঝে মাঝে কিছু দৃষ্টিমূলক করতেন। জিনিসটাকে মজা বলেই ধরতাম। এক-একদিন এসেই বলতেন, আজ আধঘণ্টা পরেই কিন্তু চলে যাব। কিন্তু থাকতেন পাঁচ ঘণ্টা। আবার কোনওদিন তিনটের সময় আসব বলে আসতেন সাতটায়। কিন্তু যে কোনও ব্যবহারই কমলদাকে মানায়। দেরিতে আসা বা তাড়াতাড়ি ফেরার জন্য তিনি চমকপ্রদ সব কারণ দেখাতেন। যেমন, আজ মশারি কাচতে হল বাড়িতে। আজ ঠাকুরের শয়ান দিতে হবে, ইত্যাদি। কোনওদিন কমলদা এসে হয়তো ঘোষণা করলেন, সেদিন তিনি এক ঘণ্টার বেশি কিছুতেই থাকতে পারবেন না। এক ঘণ্টা পরে আমরা বললাম, কই কমলদা, যাবেন না? কমলদা এক ধরক দিয়ে বলতেন, থামো তো! বেশি বাঙালপনা কোরো না।

মুক্তধারা অভিনয়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে। মধ্য বাঁধা হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন আগে, পরিপূর্ণ রিহার্সাল চলছে। ডি. কে. অত্যন্ত পারফেকশনিস্ট। কারুর সামান্য পদক্ষেপের ত্রুটিও তিনি পছন্দ করেন না। তাঁছাড়া কমলদা একেবারে শেষ মুহূর্তে দু’ একটা মন্ত্রগুপ্তি শিখিয়ে দেন, তাতে এক-একটা চরিত্রের ব্যাখ্যা একেবারে বদলে যায়। আমরা তার অপেক্ষায় আছি, অভিনয়ের দিন যত ঘনিয়ে আসে, ততই ডি. কে.-র মুখ-চোখ খুব সিরিয়াস হয়ে আসে। যেন সমস্ত পরীক্ষাটা তাঁরই।

অন্য কেউ এতটা নির্বাচিতভাবে করতে পারলে ডি. কে.-র মতন খুশি হতে আর কোনও মানুষকে দেখিনি। সেই জন্য, ডি. কে.-কে খুশি করবার জন্য, তাঁর মুখের হাসি দেখবার জন্যই আমরা প্রাণপনে থাটতাম।

সেদিন এক বুধবার, তার ঠিক দু’দিন বা তিনদিন পরেই আমাদের প্রকাশ্য অভিনয়। কার্ড বিলি করা হয়ে গেছে। সেদিন পূর্ণ রিহার্সাল হবে। কমলদা সেদিন কেন যেন গোড়া থেকেই চঞ্চল। মাঝে মাঝেই বলছেন, তোমরা যা ভাল বোরো করো। আমি যাচ্ছি। একথা শুনে ডি. কে. চওড়াভাবে হেসে কমলদার দিকে তাকিয়ে থাকেন নিঃশব্দে। আমরা সবাই কমলদার এই খেলাটা জেনে গেছি। কিন্তু কমলদা সেদিন বারবারই ওই কথাটা বলতে লাগলেন এবং দু’ একবার যেতে উদ্যত হলেন পর্যন্ত। এক সময় ডি. কে. জিঞ্জেস করলেন, কেন, আজ পালাবার কারণটা কী?

কমলদা বললেন, আজ পৌষ সংক্রান্তি, আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে পিঠে খেতে হবে।

ডি. কে. সেইরকমভাবে হেসে হাঁক দিলেন, গোবিন্দ!

গোবিন্দ ও বাড়ির ভৃত্য। সে অবিলম্বে বহু প্লেট সাজিয়ে নিয়ে এল। নানারকমের

পিঠে। ডি. কে.-র সব কিছু খেয়াল থাকে, সেদিন আর সন্দেশ শিঙড়া নয়, আমাদের জন্য পিঠে এসেছে।

কমলদা তার কিছুই স্পর্শ করলেন না। কমলদা একেবারেই ভোজনবিলাসী নন। কোনওদিনই উনি খাবার-টাবার খান না। সুতরাং আমরা ভেবেছিলাম পিঠের ব্যাপারটা ছুতো। যথারীতি কমলদা শেষ পর্যন্ত থেকেই যাবেন।

কিন্তু সেদিন তিনি মন দিতে পারছিলেন না। রিহার্সালের মাঝে মাঝেই বলছিলেন, আমি এবার যাই।

ডি. কে. জিঞ্জেস করলেন, এবার কেন যাবেন কমলবাবু? পিঠে তো এসেছে।

কমলদা বললেন, ও পিঠে নয়। আমার স্ত্রী পিঠে করেছেন, সেটা খেতে হবে।

—সে তো যখন বাড়ি ফিরবেন, তখনই খেতে পারবেন।

—না, সে একটা ব্যাপার আছে।

কমলদার মুড় ছিল না বলেই হয়তো আমরাও সেদিন অভিনয়ে নানারকম ভুল করছিলাম। ডি. কে. ক্রমশ বেশি সিরিয়াস হয়ে উঠছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকে কোনও ঝটি থাকুক, তিনি চান না।

হঠাতে রিহার্সালের মাঝপথে কমলদা আবার বললেন, তোমরা করো, আমি চলি।

ডি. কে. বললেন, আর একটু থাকুন, আর এক মন্টার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

কমলদা বললেন, না, না, আমার আর থাক্কা উপায় নেই। বুঝলেন না, পিঠে খেতে হবে বাড়িতে গিয়ে—

হঠাতে যেন মাঠের মধ্যে একটা ঘোঁষ বিস্ফোরণ হল। ডি. কে. গঙ্গীর গর্জনে বললেন, আই হ্যাভ এনাফ অব দিস... মন্টারপর পেছন ফিরে দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে চাপা গলায় বললেন, ননসেল।

আমরা স্তুক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কয়েক মিনিট সত্যিই কোথাও কোনও শব্দ ছিল না। পুরো ব্যাপারটাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবার মতন। তলায় তলায় কোথায় কতখানি টেনশান তৈরি হয়েছিল, ঠিক বুঝিনি। সত্যিই, ডি. কে.-কে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল ধৈর্যের শেষ সীমায়। আবার একথাও ঠিক, কমলদার গলায় সেদিন আন্তরিকতাও ছিল, তিনি প্রকৃতপক্ষেই চলে যাবার জন্য বাস্তু হয়েছিলেন। সোজাসুজি মাঠটা পার হয়ে এসে কমলদা আমাকে বললেন, বইটা দাও তো, সুনীল।

কমলদার হাতে রোজই একটা করে ফরাসি বই থাকে, যার মধ্যে তিনি টাকা রাখেন। বইটা আমার কাছে ছিল সেদিন। সেটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে তিনি হনহন করে বেরিয়ে গেলেন।

দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর এই ঝগড়ার দৃশ্যে আমরা বাক্যহীন স্থাগুবৎ হয়ে রইলাম। ডি. কে. ওপরে উঠে গেলেন, কমলদাকে বাধা দেবার কথাও মনে এল না।

প্রত্যেকদিনই আমরা কমলদার সঙ্গে ফিরি। আমরা সবাই তখন থাকি শ্যামবাজারের দিকে। কমলদা শ্যামবাজার পর্যন্ত এসে তারপর হঠাতে কোথায় হারিয়ে যান। কিংবা কোনওদিন হঠাতে তিনি দৌড়ে উঠে পড়েন একটা চলন্ত বাসে। ডি. কে. যেসব দিন আমাদের গাড়িতে পৌঁছে দিতে আসতেন, সেদিনও কমলদা কিছুতেই

শ্যামবাজার ছাড়িয়ে আর যেতে চাইতেন না কারুর সঙ্গে। অর্থাৎ কমলদা কারুকে তাঁর বাড়ি চেনাতে চাইতেন না। শুনেছিলাম তিনি অজ্ঞাতবাস করতেন। কোন রহস্যময় কারণে তিনি সেটা করতেন, তা এখনও জানি না। কলকাতা শহরে কেউ তাঁর ঠিকানা জানত না। সে সময় কমলদার কোনও নির্দিষ্ট জীবিকাও ছিল না। খুব সম্ভবত তিনি সে সময় সিগনেট বুকশপের শিল্পসজ্জার পরামর্শদাতা ছিলেন এবং ‘তদন্ত’ নামে একটি গোয়েন্দা কাগজ বার করেছিলেন কিছুদিন। সেই পত্রিকায় ‘দারোগার দপ্তর’ নামে দুর্লভ বইটির পুনর্মুদ্রণ হচ্ছিল মনে আছে, আর কমলদার সম্পাদকীয়গুলি হত অনবদ্য।

ডি. কে. আর সে রাত্রে ওপর থেকে নামলেন না। বুড়া ওপর থেকে ঘুরে এসে জানাল, এখন ডি. কে.-কে ঘাঁটাতে গেলে আরও গোলমাল হবে। এদিকে কমলদাও অদৃশ্য হয়ে গেছেন। আমাদের নাটক বন্ধ হয়ে গেল কিনা বুঝতে না পেরে আমরা বাকরুদ্ধ অবস্থায় বাড়ি ফিরে এলাম। একটিমাত্র বাক্যের এমন মহান বিবাদের দৃশ্য কবে কে দেখেছে আর!

পরদিন ডি. কে.-র ছোটভাই মানিক গুপ্ত এসে শ্যামবাজারে দেখা করলেন আমাদের সঙ্গে। মানিকদা বললেন, কীসব ছেলেমানুষি কাণ বলো তো। এখন অভিনয় বন্ধ হয়ে যাবে। সবাইকে নেমস্তুর করা হয়ে গেছে। ডি. কে. সেই থেকে নিজের ঘরে বসে আছে। দরজা খুলছে না, কান্তের সঙ্গে কথা বলছে না। কোথায় কমলবাবু?

আমরাও কম ত্যাঁদোড় ছেলে ছিলাম না। কমলদা অজ্ঞাতবাস করতে চাইলেও আমাদের ফাঁকি দিতে পারেননি। অঙ্গৈক গোয়েন্দাগিরি করে কমলদার বাড়ি খুঁজে বার করা হল। কমলদা প্রায়ই শিল্প সুনীল পালের নাম করতেন। তাঁর গড়া মৃত্তি একটু একটু করে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠা দেখতেন, যেমন যাওয়া-আসার পথে ওঁকে দেখেন, এই রকম। আমার কলেজের বন্ধু শিবশঙ্কুকে ধরে গেলাম সুনীল পালের বাড়ি। সেটা যশোর রোডের ধারে পাতিপুরুরে। তিনি বললেন, কমলবাবুর বাড়ি, এই তো পাশেই।

একটি ছোট নতুন একতলা বাড়ি। সংক্ষিপ্ত বাগানের সামনে কঞ্চির গেট। সেই গেট খুলে চুক্ষি অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে। দু'বার তাঁর নাম ধরে ডাকতেই তিনি গেঞ্জি পরে বেরিয়ে এসে সহাস্য সুরে বললেন, এসো, এসো।

আমরা এসে, জাদুঘরের মতন অসংখ্য জিনিসে সাজানো কমলদার বাইরের ঘরে বসলাম গুটি গুটি। কমলদা পাশের ঘরের দরজার দিকে মুখ খুঁকিয়ে দরাজ গলায় বললেন, বড়বড়, এইসব ছেলেরা এসেছে, ওদের একটু মিষ্টিমুখ করাও।

ডি. কে.-র ভাই মানিক গুপ্ত একজন ডাকাবুকো লোক। তিনি বললেন, আরে কমলবাবু, আপনার বাড়ি যদি খুঁজে না পেতাম, তা হলে কী হত বলুন তো! আপনি আর যেতেন না? হাজারখানেক লোককে কার্ড দিয়ে নেমস্তুর করা হয়ে গেছে—

কমলদা সরাসরি কোনও উত্তর না দিয়ে হেসে উঠলেন হা হা করে। তারপর অন্য পাঁচরকম রঙ্গরসিকতা শুরু করলেন এমন ভাবে যে আমাদের ভয় হল, উনি বোধহয়

আসল ব্যাপারটা এড়িয়ে যাবেন। উনি রাগারাগি করলে বরং আমরা নিশ্চিন্ত হতাম।

এক সময় আমরা বললাম, কমলদা আপনাকে আমরা ধরে নিয়ে যাব।

কমলদা বিনা বাক্যব্যয়ে জামা পরে এলেন। সদলবলে আমরা এলাম হরবোলায়। বাইরে সিডির কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ডি. কে। যেন কিছুই হয়নি, এই ভাবে সহায়ে ‘কী কমলবাবু’ বলে এগিয়ে এলেন তিনি। তারপর দুই বঙ্গ আলিঙ্গনাবন্ধ হলেন।

এরপর চার শনি রবিবার ধরে হয়েছিল মুক্তধারার অভিনয়। কোথাও কোনও কিছুর অভাব ছিল না। খালি চোখে দেখা যায় না, এমন সূক্ষ্ম চিড় কি রয়ে গিয়েছিল? আমরা ঠিক টের পাইনি। মুক্তধারা নাটকে আমার ছিল যন্ত্ররাজ বিভূতির ভূমিকা। অর্থাৎ ভিলেন। গলায় একটা মন্ত্র গাঁদা ফুলের মালা, নাটকের শেষ দৃশ্যে, কমলদা বলে দিয়েছিলেন, বাঁধ কে ভাঙলে কে ভাঙলে—এই টিক্কার করতে করতে আমি মালাটাকে ছিঁড়ে ফেলব। আমি ঘোঁকের মাথায় এমন জোরে হাত চালালাম যে, সেই ছিন্নমালা উড়তে উড়তে গিয়ে পড়ল দর্শকদের মাঝখানে চিত্রতারকা অরুণ্ধতী মুখার্জির কোলে। হাসির ধূম পড়ে গেল তাই নিয়ে।

এর পরও অবনীপ্রনাথের লম্বকর্ণ পালার রিহার্সাল চলেছিল কিছুদিন। তারপর একসময় নিজস্ব নিয়মে হরবোলা স্বাভাবিকভাবে মরে যায়।

২.

শ্যামবাজার পাঁচমাথার কাছে ইউনাইটেড কফি হাউস নামে অধুনালুপ্ত একটি সরাইখানাতে একদা আমাদের আজড়া ছিল। সেখানে কোনও এক রবিবার সকালে কমলকুমার মজুমদার তাঁর প্রথম উপন্যাস আমাদের কয়েকজনকে উপহার দেন। উপন্যাসটি বেরিয়েছিল একটি স্কুল সাহিত্য পত্রিকায় ক্রোড়পত্র হিসেবে, পত্রিকাটির নাম আমরা জানতে পারিনি, কেননা, কমলকুমার পত্রিকাটি থেকে তাঁর রচনাখণ্ড ছিঁড়ে আলাদা কাগজে নিজে মলাট সেলাই করে একটি সম্পূর্ণ পুস্তক হিসেবেই দিয়েছিলেন আমাদের। উপন্যাসটির নাম অন্তর্জলী যাত্রা, যার শুরুতেই ভোরবেলার বর্ণনা এইরকম : আলো ক্রমে আসিতেছে। আকাশ মুক্ত ফলের ন্যায় হিম নীলাভ।

কমলকুমার মজুমদারের রচনার সঙ্গে সেই আমাদের প্রথম পরিচয়। মানুষটিকে এর বছর কয়েক আগে থেকেই ছিনি, ১৯৫৩ সালে সিগনেট প্রেসের পরিচালক দিলীপকুমার গুপ্ত (ডি. কে. নামে পরিচিত ছিলেন ছোটবড় সকলের কাছে) আমাদের মতন সদ্য কলেজে পড়া ছোকরাদের নিয়ে হরবোলা নামে গড়েছিলেন একটি নাটকের দল, তার পরিচালক হিসেবে আসেন কমলকুমার, সেই সূত্রে তাঁকে আমরা কমলদা বলে ডাকি। কুচকুচে কালো রঙের একজন বলিষ্ঠকায় পুরুষ, ধূতি ও লক্ষ্মীয়ের কলিদার পাঞ্জাবি পরা, কঠস্বর গমগমে। তিনি সর্বক্ষণ এলাচ ও লবঙ্গ খেতেন, অত এলাচ-লবঙ্গ মানুষের সহ্য হবার কথা নয়, পরে জেনেছিলাম, আমাদের কাছ থেকে ওঁর মুখের দেশি মদের গন্ধ লুকোবার জন্যই ওই প্রকার চেষ্টা। হাস্য পরিহাসে, বুদ্ধির প্রার্থ্যে ও বাকবৈদ্যম্যে অতুলনীয়, কিন্তু কোনও এক রহস্যময় কারণে তিনি একটি সাধারণ চটের থলে (কাঁধে ঝোলান শাস্তিনিকেতনী ঝোলা নয়,

যাকে বলা হয় রেশন ব্যাগ) বহন করতেন সব সময়, যার মধ্যে থাকত তাঁর সর্বক্ষণ পাঠ্য বইপত্র ও টাকাপয়সা। চট্টের থলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে টাকা তুলে এনে ট্রাম বাসের টিকিট কাটতে আমরা আগে কখনও কারুকে দেখিনি। হিসেব অনুযায়ী তখন তাঁর বয়েস আটত্রিশ, কিন্তু তিনি এমন ভাব করতেন যেন জন্মেছেন উনবিংশ শতাব্দীতে, শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরদের স্বচক্ষে দেখেছেন। স্কার্রো নামে এক ঝড়যুগীয় ফরাসি কবির রচনা এখন অনেক ফরাসিই পড়েন না, কিন্তু কমলদা যখন তখন স্কার্রো কিংবা ডিয়োর মতন কবিদের মূল রচনা উদ্ধৃত করতেন, আবার বাংলায় কাঙ্গাল হরিনাথ রচিত ‘হারামণি’ থেকেও স্তবক উদ্ধার করতেন সাবলীলভাবে।

আমরা ‘হরবোলা’ প্রতিষ্ঠানের চ্যাংড়ারা আমাদের মোশান মাস্টার কমলদার অঙ্ক ভঙ্গ হয়ে গিয়েছিলাম প্রথম দিন থেকেই, কিন্তু তাঁর রচনা সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না আমাদের। ক্রমে লোকপরম্পরায় শুনেছিলাম যে একদা উনি লেখক ছিলেন। নরেশ শুহ সিগনেট প্রেসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তখন, তিনি একদিন বলছিলেন, তোমরা জানো না, কমলবাবু এক সময় চমৎকার কয়েকটি ছোটগল্প লিখেছেন ‘চতুরঙ্গ’ ও ‘সাহিত্য পত্রে’। ডি. কে.-ও বলতেন, কমলবাবু, আপনি আর লেখেন না কেন? কমলদা সে কথা হেসে উড়িয়ে দিতেন। মনে হত যেন, লেখার ব্যাপারে ওর কোনও অভিমান বা বিরাগ জন্মে গেছে। আমরা তখন কবিতা রচনার ব্যাপারে খুব মাতামাতি করছি এবং সদ্য দাঁত ওঠা কুকুরছানা মতন কামড়ে বেড়াচ্ছি একে তাকে, কমলদা পরিহাস করতেন আমাদের।

‘হরবোলা’ কয়েক বছরের মধ্যেই উচ্চ যায় কিন্তু আমরা তখনও কমলদার সঙ্গে ছায়ার মতন লেগে থাকতাম। এই সময় তিনি হঠাতে আবার লিখতে শুরু করলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস দেখেই আমরা স্তুতি। এরকম বাংলা গদ্য আমাদের কিংবা বাংলা গদ্যের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক দূরে। শুরু-চতুর্থাংশের এমন অবাধ মিশ্রণ আগে কখনো দেখিনি, কিছু কিছু শব্দ যেন সদ্য আবিষ্কৃত। উপন্যাসের প্রধান দুই চরিত্রও এক চণ্ডাল ও এক ব্রাজণী, এবং বাক্যবক্ষও অতি জটিল, বাংলা ব্যাকরণের কোনও নিয়মের ধার ধারে না। কেউ কেউ বলতে শুরু করলেন, বাংলা গদ্যভঙ্গি ইংরেজি সিনট্যাক্স অনুযায়ী চলে, ফরাসি ভাষায় পশ্চিত কমলকুমার ফরাসি সিনট্যাক্সে বাংলা চালু করছেন। এ কথাও পুরোপুরি সত্যি নয়, ফরাসিতে বিশেষণগুলি কর্তার পরে বসে, লাল ফুলের বদলে ফুল লাল যেরকম, তা ছাড়া ফরাসি ধাতুরূপ ইংরিজির চেয়ে বেশি, কিন্তু সংস্কৃতের মতন। এর চেয়েও বড় কথা, যতদূর জেনেছি, ফরাসি গদ্য ফরাসিদের মুখের ভাষারই অনুসারী, পৃথিবীতে সব ভাষাতেই গদ্য ও মৌখিক ভাষা কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে, কৃত্রিম অলংকারবহুল ভাষা সূক্ষ্ম চিন্তার বাহক না হয়ে বাধা হয়, কিন্তু কমলকুমারের মুখের ভাষার সঙ্গে তাঁর লিখিত বাক্যের হাজার যোজন ব্যবধান। তাঁর মুখের ভাষা ছিল খাঁটি মধ্য কলকাতার, অনেক সময় যাকে আমরা বলি কাঁচা বাংলা, (অর্থাৎ অতিশয় পরিপক্ষ) এবং সব সময় রঙরস মিশ্রিত। অথচ তাঁর লিখিত গদ্যের একটি বাক্য বারবার না পড়লে অর্থ উদ্ধার করা যায় না। তৎক্ষণাত্ম অর্থ বুঝতে না পারলেও তাঁর লেখা,

অনেকটা কবিতার মতন বারবার পড়তে ইচ্ছে হয়, প্রতিটি শব্দের প্রতি এমনই মনোযোগ এবং ভিতরে এমনই জানু।

এর পর প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর অন্য রচনাগুলি, বছরে একটি বা দুটি, কখনও বা দু' বছরে একটি, দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর দুটি গল্প, 'মতিলাল পাত্রী' এবং 'তাহাদের কথা', তাঁর উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয় বেশিরভাগই ছোট পত্রিকায়, এক্ষণেই বেশিরভাগ, আমরা কৃতিবাসের গোটা একটি সংখ্যায় প্রকাশ করেছিলাম তাঁর বড় উপন্যাস 'সুহাসিনীর পমেটম'। এ ছাড়া তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের নাম 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক', 'শ্যাম নৌকো', 'খেলার প্রতিভা', 'কয়েদখানা', 'কুঞ্জগীকুমার'—এর মধ্যে পৃষ্ঠাকারে পাওয়া যায় দু' একটি মাত্র এবং তাঁর 'গল্প সংগ্রহ' এবং 'নিম অন্ধপূর্ণ' নামে গৃহ্ণ। তবু কমলকুমার মজুমদার বরাবরই রয়ে গেলেন সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য জগৎ থেকে দূরে, বাইরে। কোনও সংকলনে তাঁর গল্প নেওয়া হয়নি, কোনও সাহিত্য সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়নি তাঁকে (তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন কিনা, সেটা আলাদা কথা), বেশিরভাগ পাঠকের কাছেই তিনি রয়ে গেলেন অস্ত্রাত, সমসাময়িক অনেক লেখক তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে চেনেন কিন্তু তাঁর রচনা পড়েননি এক লাইনও। নিজের রচনার দুরহতা বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন তিনি, 'নিম অন্ধপূর্ণ' প্রকাশিত হবার পর তিনি রসিকতা করে বলেছিলেন, আমার বই উন্নতিরিশখানা বিক্রি হয়েছিল, তারপর উন্নতিরিশ জনই দোকানে বই ফেরত দিয়ে গেছে। তবু, দিন দিন যেন আরও বেশি দুরহতার সাধনায় ব্রতী হলেন।

খুব দুর্মুখ ছিলেন, বস্তু বিচ্ছেদ ঘটানোর আশ্চর্য প্রতিভা ছিল তাঁর, সমসাময়িকদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল হয়ে গেছে। কিন্তু পরবর্তী বয়ঃকনিষ্ঠদের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। একটি ছোট দল, পরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট দল তাঁর লেখা পুস্তকানুপূর্খভাবে পড়েছে, বিশেষত কবিরা। ওয়েলিংটনের কাছে একটি বাংলা মদের দোকানে কমলকুমার মজুমদারের সামিখ্যে কেটেছে আমাদের যৌবনের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি বছর। পুরো এক প্লাস নীট বাংলা মদ (৩৫ শক্তি, আজকাল পাওয়া যায় না) এক চুমুকে খেয়ে ফেলে অবিচলিত থাকার মতন দ্বিতীয় মানুষ আমি সারা পৃথিবীতে দেখিনি। এবং ঘন্টার পর ঘন্টাব্যাপী প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে কথাবার্তায় চুম্বকাকৃষ্ট করে রাখার ক্ষমতাই বা ক'জনের থাকে। বাংলা থিয়েটার সম্পর্কে ছিল তাঁর অগাধ জ্ঞান ও নতুন চিন্তা, নিজে ছবি আঁকতেন ও খ্যাতনামা চিত্র সমালোচক ছিলেন, গ্রামের জীবন, বিভিন্ন অঞ্চলের লোকশিল্প ও কথা ভাষায় কুপাস্তর—এমন কতদিকে ছিল তাঁর আগ্রহ। সাহিত্য তো ছিল তাঁর আঁচ্ছেপৃষ্ঠে জড়িত, এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত তিনি, শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বাক্যকে তিনি সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতেন, আমায় রসেবশে রাখিস মা, শুকনো সম্যাসী করিস নে। ওয়েলিংটনের সেই সান্ধ্য আসর থেকেই তাঁর পরিকল্পনা ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল স্বল্পজীবী পত্রিকা, একটি নাম 'তদন্ত', যেটি গোয়েন্দা ও অপরাধ কাহিনী বিষয়ক ও আর একটির নাম 'অক্ষ ভাবনা', যেটির বিষয় গাণিতিক দর্শন। হ্যাঁ, একই ব্যক্তি এই দুটি পত্রিকার কথা চিন্তা করেছিলেন।

তিনি এই পৃথিবীতে ৬৪ বৎসর থেকে গেলেন। শেষ জীবনে তিনি শিক্ষকতা করতেন সাউথ পয়েন্ট স্কুলে, যদিও শুনেছি, তাঁর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্রি ছিল না। কয়েক বছর খুব কষ্ট পেলেন হাঁপানি রোগে, তাতেও তাঁর তীক্ষ্ণতা ও রসবোধ এক বিন্দু কমেনি, নবীনতর কিছু লেখকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থেকে গেছে বরাবর।

কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাস ও গল্পগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই বিষয়ের গভীরতায় অসাধারণ, ঠিক এমন চোখ দিয়ে মানুষের জীবন আর কেউ দেখেননি। ভাষার কঠিন আবরণের জন্য তা পাঠকদের কাছে পৌছয়নি, রচনাগুলি রইল ভবিষ্যৎ কালের জন্য, ভবিষ্যতের উদ্যমশীল রসভোক্তাদের জন্য।

আমি কমলকুমার মজুমদারকে আমার একটি বই উৎসর্গ করেছি। সেই বইয়ের এক কপি তাঁকে দিতে গিয়ে বলেছিলাম, কমলদা, এ বইটা আপনার বাঢ়ির কোনও খাট বা টেবিলের পায়া যদি ঠক্কঠক করে তখন সেই পায়ার নীচে গুঁজে দেবার জন্য বইটা রেখে গোলাম।

বিশ্বৃত লেখক

পূর্ণিয়া শহরের ভাট্টাচার্জারে বাস থেকে নেমেই মনে পড়ল সতীনাথ ভাদুড়ীর কথা। আমার কাছে পূর্ণিয়া শহরের সঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ীর নামের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। একটি পেট্রোল পাম্প ও বেশ বড় আকারের মনোহারি দোকান। দোকানের পরিচালকরা বঙ্গভাষী। সেখানে তুকে একজনকে জিঞ্জেস করলাম, সতীনাথ ভাদুড়ীর বাড়িটা কোথায় ছিল বলতে পারেন?

ভদ্রলোক আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, কাকে খুঁজছেন?

আমি পুনর্ক্ষ সতীনাথ ভাদুড়ীর নাম বললাম। তিনি ঠিক চিনতে পারলেন না, কিংবা ওই নামটা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। দোকানের অপর একজন পরিচালককে উদ্দেশ্য করে বললেন, এই দ্যাখো তো এই ভদ্রলোক কাকে খুঁজছেন?

দ্বিতীয় ব্যক্তিটির কাছে গিয়ে আমার প্রশ্নটির প্রুণকরণ করলাম। তিনি দু' এক পলক আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আপনি কার বাড়ি খুঁজছেন? ঠিকানা জানেন?

আমি বললাম, সতীনাথ ভাদুড়ীর বাড়ি, যিনি লেখক ছিলেন।

সাধারণত কোনও সত্যিকারের লেখকের নামের আগে বা পরে, লেখক শব্দ ব্যবহার করতে ইচ্ছে করে না। তিনি অবস্থা বিপাকে করতেই হয়। সাহিত্য অনেকেই পড়ে না, অনেকেই সাহিত্যিকদের উন্মেষ্যযোগ্য মানুষ মনে করে না। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, পূর্ণিয়া শহরেও বাঙালিদের কাছে সতীনাথ ভাদুড়ীর নাম নিশ্চয়ই পরিচিত হবে, শুধু লেখক হিসেবে নয়, সমাজ সেবক হিসেবেও।

দোকানের সেই পরিচালকদের কাছেও সতীনাথ ভাদুড়ীর নামটা পরিচিত ঠিকই। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর এত বছর বাদে হঠাৎ তাঁর বাড়ির ঠিকানা সম্পর্কে প্রশ্ন শোনার কথাটা খুবই অপ্রত্যাশিত বলেই ধরতে পারছিলেন না।

বুঝতে পেরে বললেন, তিনি তো মারা গেছেন অনেকদিন।

আমি রীপ ভ্যান উইঙ্কল নই যে, এ খবর জানব না। বললাম, আমি ওঁর বাড়িটা কোথায় ছিল, তাই জানতে চাইছি।

কেন, সে বাড়িতে গিয়ে কী করবেন। সেখানে তো কেউ থাকে না।

এবার আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম। সত্যিই তো, সতীনাথ ভাদুড়ীর বাড়ি খোঁজ করছি কেন? কী হবে সেখানে গিয়ে? আমরা নিজেদের অনেক গতিবিধির মানে জানি না। সতীনাথ ভাদুড়ীকে আমি কোনওদিন চর্মচক্ষে দেখিনি, তাঁর জীবিতকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করার কোনও ইচ্ছে আমার হয়নি। এখন তাঁর বাড়িতে কেন যেতে চাই?

একটা ছুতো খুঁজে পেয়ে গেলাম। সতীনাথ ভাদুড়ীর নানা লেখায় তাঁর বাড়ির বাগানের উল্লেখ আছে। বাগান করা তাঁর প্রিয় ব্যসন ছিল। সহকারের সঙ্গে মাধবীলতা মেলাবার সেই বিখ্যাত কৌতুক। বললাম, তঁর বাগানটা দেখতে চাই, খুব নাকি ভাল বাগান—

সে বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। সেসব বাগান টাগান আর...। উদ্বলোকের গলায় আফশোসের সূর ছিল। স্থানীয় লোকদের উদ্যোগে কীসব চেষ্টা হয়েছিল, সে কথাও বললেন। তা সঙ্গেও আমি বাড়িটা দেখতে গিয়েছিলাম। বছর কয়েক আগের কথা, তখন বাড়িটার সদর ছিল তালাবন্ধ, গেটের সামনে আগাছা। এখন কী অবস্থা জানি না।

লেখকদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করা কিংবা মৃত লেখকের বাড়ির বাগান দেখতে যাওয়া আমার স্বভাবের অন্তর্গত নয়। কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ী সম্পর্কে আমার দুর্বলতা অত্যধিক। বিশেষত যত দিন যাচ্ছে ততই বাংলা ভাষার পাঠকদের মধ্যে সতীনাথ ভাদুড়ী সম্পর্কে বিস্মরণ এসে যাচ্ছে বলে আরও বেদনা বোধ করি। ইদানীংকালের অনেক নবীন পাঠক এর নামও শোনেননি, এর অনেক বই এখন ছাপা নেই। এই লেখকের স্মৃতিরক্ষার কোনও ব্যবস্থা হবে না। সতীনাথ ভাদুড়ী জীবিতকালে কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় ঘোরাঘুরি করেননি কখনও, কাগজের সম্পাদকদের সঙ্গে দেখাশুনা করেননি বিশেষ, প্রায় সমস্ত লেখাই ডাকে পাঠান্তর। কোনওদিন সেরকম কোনও সভা সমিতিতে যাননি। তিনি শুধু লিখতেন। এবং তাঁর লেখার সঙ্গে অর্থেপার্জনের সম্পর্কটাও ছিল অপ্রত্যক্ষ। এবং এরকম লেখক বাংলা ভাষায় খুব বেশি জন্মায়নি। প্রথম বইটিতেই তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর পরের বইগুলিও তারতবর্ষের সব কঠি পুরস্কার পেয়েয়ার যোগ্য। যদি পুরস্কার অর্থে স্বীকৃতি ও সম্মান বোঝায়। সতীনাথ প্রত্যেকটি বই লিখতেন নতুন পরিকল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। এবং এই একজন বিরলজাতের লেখক, যিনি নিজেকে সম্পূর্ণ গোপন করে রাখতে পেরেছেন নিজের রচনা থেকে।

তাঁর যে-কোনও বই পড়লেই বোঝা যায়, কী অসম্ভব শক্ত এই ধরনের বই লেখা। তাঁর রচনার গতি কোথাও দুর্বার নয়, বিন্দু বিন্দু রস চয়ন করে মৌচাক সৃষ্টির মতন। জাগরী ছাড়া তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই আমার কাছে ‘চৌড়াই চরিত মানস’ দুই খণ্ড, ‘অচিন রাগিণী’, ‘সত্য ব্রহ্ম কাহিনী’, ‘জলপ্রমি’ এবং ‘সক্ষট’। চৌড়াই চরিত মানসের কথা আমি বারবার নানা জায়গায় উল্লেখ করেছি। এরকম বিস্ময়কর বই যে-কোনও দেশের সাহিত্যে দুর্লভ। এই বইখানি বাংলার আধুনিক ক্লাসিক হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য। রিক্ত সর্বহারাদের নিয়ে বাংলায় কিছুই লেখা হয়নি এই অভিযোগ যাঁরা করেন তাঁরা অনেকেই অবশ্য চৌড়াই চরিত মানস পড়েননি। পড়লেও বোধহয় পছন্দ হবে না। কারণ বইখানি শেষ পর্যন্ত শান্ত রসের। বস্তিবাসীর জোলো প্রেমকাহিনী যেমন এটা নয়, তেমনি এতে দাঙা-হাঙ্গামার দিকটাও বড় করে দেখানো হয়নি। নিদারণ অর্থনৈতিক নিষ্পেষণের কথা আছে— কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে অধ্যাত্মরসে এখনও ভারতের লক্ষ লক্ষ সরল নিম্নবিত্ত মানুষ

আশ্রয় ও সাক্ষনা পেতে চায়, সতীনাথ ভাদুড়ী সেই জীবন-সত্ত্বের কথাই বলেছেন। সাহিত্যের বিচারে বইটি আশ্চর্য সার্ধক। বইটি সতীনাথ ভাদুড়ীর নিজেরও খুব প্রিয় ছিল; কারণ অন্য একটি লেখায় তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, এই বইটি পাঠকদের সমাদর লাভ পায়নি। যদি পেত তিনি বইটার আবার পরিমার্জন করতেন, আরও এক খণ্ড লিখতেন। বাংলা সাহিত্য সেই লেখা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর লেখার কথা ভাবলে বাংলাদেশের এই দৃঢ়সময়ের কথাও মনে পড়ে। মনে হয় সত্যিকারের সৎ ও অকৃত্রিম সাহিত্যের আজ সমাদর নেই। এক একজন লেখকের মৃত্যুর পরই পাঠকরা তাঁদের ভুলে যায়—হঠাৎ কোনও ছজুগে তাঁদের পুনর্জীবিত করার ব্যবস্থা হলে তা হলে জীবিতকালে কে আর অমরত্বের সাধনায় সাহিত্য রচনা করতে চাইবে? তাঁক্ষণিক হাতে-গরম লেখার মুগই বুঝি কায়েম হয়ে গেল।

জ্যোতিরিণ্ড্র নন্দী

জ্যোতিরিণ্ড্র নন্দীর চেহারা ও ব্যবহার ছিল অবিকল একজন খাঁটি লেখকের মতন। অর্থাৎ আমাদের মনের মধ্যে যে-রকম লেখকের ছবি থাকে। তিনি কোনও গল্পের নায়কের মতন রূপবান ও সুপুরুষ নন, তিনি বীর বা যোদ্ধাদের মতন প্রবল ব্যক্তিসম্পন্ন নন, রাজনীতিবিদ বা অধ্যাপকদের মতন তুঁখোড় বাক্যবাচীশ নন, জাদুকরের মতন মোহিত করে দিতে পারেন না। তাঁর শ্যামবর্ণ ছিপছিপে চেহারা, ভিড়ের মধ্যে মিশে যাবার মতন, মানুষটি লাঞ্ছুক স্বভাবের। তিনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে অন্য কেউ তাঁর দিকে তাকাবে না, কিন্তু তিনি পুস্তানুপুস্তভাবে দেখবেন সকলকে। এই সব মানুষই অষ্টা। কোঁকড়ানো চুল ও পুরু লেন্সের চশমা সমন্বিত মুখটি দেখলে মনে হতে পারে একটি অতি সাধারণ মানুষের মুখ, এই মানুষটি সাধারণ নন।

জ্যোতিরিণ্ড্র নন্দী পুরোপুরি সাহিত্য জগতে ভূবে থাকা মানুষ। অর্থাৎ নারী, পুরুষ, শিশু, গাছপালা, শিরগিটি, শালিক, চুম্বক, পিপড়ে ইত্যাদি যা কিছুই দেখছেন, এই সব কিছুকেই ভাষার বক্ষনে বাঁধবার জন্য তাঁর মন সারাক্ষণ নিযুক্ত। সাহিত্য তাঁর জীবনে অতি তীব্র নেশার মতন। তিনি পাঠকদের মনোরঞ্জনের কথা চিন্তা করে লেখেননি, এমনকী অমরত্বও তাঁর ক্ষয় ছিল না, সারা জীবন দৃঢ়-কষ্ট ও পাঠকদের অবজ্ঞা সহ্য করেও লিখে যাবেন এই আশায় যে মৃত্যুর পরে তাঁর রচনার যোগ্য সমাদর হবে, এরকম রোমান্টিক ধারণাও তাঁর ছিল না। তিনি লিখতেন, তার কারণ লেখা ছাড়া অন্য কোনও ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল না, এবং সমস্ত প্রকৃত লেখকেরই যেমন লেখাটাই জীবিকা হয়, তাঁরও শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছিল, অর্থাৎ তাঁর শরীর ও মন এই দুটিরই সমান টান ছিল সাহিত্যের জন্য। জীবনের অন্য কোনও দিকে তিনি কীর্তি স্থাপন করেননি, মনোযোগ দিয়ে সুষ্ঠুভাবে একটানা কোনও চাকরিও করতে পারেননি, তিনি শুধু সাহিত্য রচনা করে গেছেন। তাঁর রক্ষক্ষরণ ও আযুক্ষরণে তাঁর রচনাগুলি এক একটি উজ্জ্বল মণি হয়ে উঠেছে।

তিনি প্রায়ই বলতেন, আমার যেমন খেয়াল হয় সেই রকম লিখি। আমার যা মাথায় আসে, আমার যা ইচ্ছে হয়, যে-রকম খেয়াল হয়, সেই রকম লিখে যাই। খেয়াল কথাটার উপর একটু জোর দিয়ে বলতেন। কোনও উপন্যাসই আগে থেকে ছক কেটে কিংবা প্লট ভেবে লেখেননি। একটা কোনও মুড় বা বিশেষ একটা কোনও চরিত্র কিংবা ‘খেয়াল’ নিয়ে লিখতে শুরু করেছেন। এই রকম পরিকল্পনাহীন একজন লেখকই কিন্তু প্রায় প্রথম থেকেই নিজস্ব একটা স্টাইল তৈরি করতে পেরেছিলেন; এটা বড় কম কথা নয়। তাঁর নিজস্ব ভাষা ব্যবহার এবং বিশেষ রকমের পর্যবেক্ষণ

শক্তির জন্য তিনি বরাবরই আলাদা ধরনের লেখক। তাঁর প্রথম উপন্যাস সূর্যমুখী থেকেই তাঁর এই নিজস্বতা টের পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যস্ত জীবন নিয়ে তাঁর এই উপন্যাস রীতিমত দৃঃসাহসী।

কুমিল্লা থেকে কলকাতায় এসেছিলেন তিনি। গ্রাম্য প্রকৃতি তাঁকে সারা জীবন ছাড়েনি, কিন্তু জীবন বিশ্লেষণের ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আশ্চর্য রকমের নাগরিক। একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে প্রথম আলাপের দিন প্রেমেন্দ্র মিত্রও তাঁকে এই কথা বলেছিলেন। কুমিল্লা থেকেই লেখা শুরু করেন তিনি; ডাকে লেখা পাঠাতেন, ছাপা হয়েছিল ঢাকার ‘সোনার বাংলা’ ও অন্য দু’ একটি কাগজে, দেশ পত্রিকাতেও ছাপা হয় এই রকম ডাকে-পাঠানো গঞ্জ। ওঁর নিজের ভাষায়, “পাঠকদের স্বীকৃতি পাবার আগেই সম্পাদক ও অন্যান্য লেখকদের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।” কলকাতায় এসে উনি বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে কেরানিগিরি করতেন, সেখানকার প্রচার সচিব ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, তিনি ওই নবীন লেখককে ডেকে আলাপ করে বলেছিলেন, তোমার লেখা পড়েছি। তুমি গ্রাম থেকে এসেছো। আগে কখনও কলকাতা দেখোনি? অথচ শহর সম্পর্কে তোমার কল্পনশান তো খুব পরিষ্কার।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষকে মিশিয়ে সৌন্দর্য-সন্ধানটি ছিল তাঁর লেখার মূল সূর। তাঁর প্রকৃতি কিন্তু বিশাল কোনও পাহাড়, নিবিড় দুর্গম অঞ্চল বা দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র নয়। যেমন তাঁর রচনার মানুষরাও অতি সাধারণ, কিন্তু মধ্যবিত্ত, সেই রকম তাঁর প্রকৃতিও ছোটখাটো ব্যাপার। একটা পুরুর, কিছু স্কুনো ঝোপ বা আগাছায় জঙ্গলে পরিণত হওয়া বাগান। তিনি অনেকদিন থাকতেসহ শিয়ালদার ওপারে, তখনও ওই সব অঞ্চলে কিছু কিছু সবুজের অস্তিত্ব ছিল, পুরুর, ডোবা, ঝোপবাড় দেখা যেত। কলকাতা থেকে তিনি ফেরার সময়ে ট্রামে-বাসে না চড়ে পায়ে হেঁটে যাওয়াই পছন্দ করতেন। কলকাতায় ব্যস্ত মানুষ, যন্ত্রের শব্দময় জীবন দেখতে দেখতে তিনি চলে যেতেন অন্যদিকের নিরালায়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্পগুলিতে এই সব ব্যাপার মিলেমিশে আছে।

তাঁর সমস্ত গল্প উপন্যাসেই নারীর রূপ বর্ণনার সময় সূর মিলিয়ে এসে গেছে প্রকৃতির কথা। যেমন তাঁর চোখে নারী ও প্রকৃতি সমান। এ কিন্তু বৈকল্পিক সাহিত্যের নারী ও প্রকৃতি নয়, এর মধ্যে কোনও তত্ত্বকথা নেই, এর মধ্যে আছে রূপদর্শন। তিনি প্রকৃতির বন্দনাকারী নন। তাঁর লেখা পড়লেই বোঝা যায়, সৌন্দর্য কোনও বস্তুবিশেষে নেই, তা শুধু আছে দেখার চোখে।

যেমন উদাহরণ হিসেবে গিরগিটি গল্পটি বলা যায়। এই গল্পের বৃন্দাটি দেখে ভাঙ্গাটে বাড়ির বউটির স্নানের দৃশ্য। বুড়োটির মনে ঘোন-বাসনা নেই। সে দেখে এক উজ্জ্বাসিত রূপের প্রকাশ। এক নব-যুবতী অনেকখানি নিরাবরণ হয়ে স্নান করছে কুয়োর ঠাণ্ডা জলে, তার একাকিন্তা ও তার রূপ যেন সাবানের ফেনা ও গায়ের চামড়ার মতন মিলেমিশে আছে। মেয়েটি প্রকৃতপক্ষে কতটা সুন্দরী তা আমরা জানি না, কিন্তু সেই বৃন্দাটির চোখ তাকে সুন্দরীতমা করে তোলে। মেয়েটিও দেখে, সে

দেখে নির্জনতার মধ্যে কুয়োতলার শ্যাওলায় পড়েছে রোদ, কচু গাছে উড়ে এসে বসে প্রজাপতি, জলের চিকিৎসা ধারা, একটি গিরগিটি, সব মিলিয়ে একটা নির্মাণ। বস্তুত বৃক্ষ ও মেয়েটি একই রূপ দেখছে, যাকে গাল-ভরা কথায় বলা যায়, নিখিল বিশ্বের রূপ, বুঝো ও নগ মেয়েটিও শতপ্রোতভাবে যার অঙ্গর্গত।

বিশুদ্ধ সৌন্দর্য দর্শনের এমন দৃঃসাহসী গল্প বাংলা কেন, যে-কোনও ভাষাতেই কঢ়ি লেখা হয়।

এক সময় জ্যোতিরিণ্ড্র নন্দীর রচনা সম্পর্কে অল্লীলতার অপবাদ উঠেছিল। তাঁর প্রথম উপন্যাস সূর্যমুখী থেকে শুরু করে প্রায় সব উপন্যাসই, এবং ছোট গল্পের মধ্যে ছিন্ন, সোনার চাঁদ, এমনকী গিরগিটিটি সম্পর্কেও অনেকে এই অভিযোগ এনেছে। এ বড় আশ্চর্য কথা। তাঁর গল্পের তথাকথিত অল্লীলতা একেবারেই নেই, কারণ তিনি কখনও সম্ভোগ কিংবা যৌন উল্লাসের কথা লেখেন না, তাঁর সমস্ত বর্ণনাই সৌন্দর্য চেতনার। এবং সামগ্রিক বর্ণনা না হলে সৌন্দর্য মূল্যায়ন। তিনি একটা কাঁটা গাছ বা কাঠ পিপড়ের ঝাঁক বা একটা ল্যাম্পপোস্টের কথা লিখতে গিয়েও পুষ্টানুপূর্ণ বর্ণনায় তাদের সম্পূর্ণতা ফুটিয়ে তোলেন, যে-কোনও গল্পে তাদের ভূমিকা শুরুত্বপূর্ণ। এবং তারা পৃথক থেকেও মানুষের মনের ভেতরকার কাঁটা গাছ বা কাঠ পিপড়ের ঝাঁক বা ল্যাম্পপোস্টের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। সুতরাং তিনি নারী-পুরুষের শরীরকেও কখনও অসম্পূর্ণ রাখেন না। শরীরের রূপকে তিনি সীমাহীন জ্ঞানগায় নিয়ে যেতে চান, সেই রকম লেখকের বর্ণনার মাঝখানে কোনও সীমারেখা টানার কথা কল্পনাও করা যায় না।

ছোটগল্পের জন্যই জ্যোতিরিণ্ড্র নন্দী বেশি প্রসিদ্ধ। চলিশ-পঞ্চাশ-ষাটের দশকে বাংলা ছোটগল্পে একটা স্বর্ণযুগ চূলাইল। সেই সময় জ্যোতিরিণ্ড্র নন্দী তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি ছোটগল্পে পাঠকদের বিশ্বয়বোধ বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর ‘শালিক কি চড়ই’-এর মতন গল্প-গল্প বাংলা ভাষায় চিরকালের মতন স্থান পাওয়ার যোগ্য।

তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে ‘বারো ঘর এক উঠোন’ সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ। নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের এরকম ছবি গড়তে বোধ করি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউ পারেননি। আমার সবচেয়ে প্রিয় তাঁর ‘মীরার দুপুর’। এতে অবশ্য কোনও বাস্তববাদী ছবি নেই, বস্তুত উপন্যাসটিতে কাহিনীর অংশ অতি সামান্য কিন্তু যে তীব্র আবেগ ফুটে উঠেছে এর মধ্যে, ভাষা ব্যবহারের যে অপূর্ব কৃতিত্ব, তা কিছুতেই ভুলতে পারি না। ‘প্রেমের চেয়ে বড়’ এবং ‘এই তার পুরস্কার’ বাঙালি পাঠকদের, যারা শুধু মর্য-সন্ধানী, তাদের জন্য গভীর উপলক্ষ্মির উপহার। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, জ্যোতিরিণ্ড্র নন্দী আনন্দ পুরস্কার ছাড়া কোনও পুরস্কারই পাননি।

এবাবে দু’ একটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উৎপাদন করি। তাঁর রচনা ও সাহিত্যকীর্তি নিয়ে নিশ্চয়ই উপযুক্ত বিদ্যু ব্যক্তিগণ যথাসময়ে আলোচনা করবেন। তাঁর বিচ্ছেদ সময়ে কিছু শূতিচারণের ইচ্ছে হয়।

জ্যোতিরিণ্ড্র নন্দীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের সোভাগ্য হয়েছিল অনেকদিন আগে। একটি ছোট দৈনিক সংবাদপত্র অফিসে সে সময় তিনি চাকরি

করতেন, আমিও তখন সেখানে রবিবাসীয় সম্পাদক হিসেবে পার্টটাইম কাজ নিয়েছিলুম। তখন আমি শুধু কবিতা লিখি, কফি হাউসের আজড়ার বাইরে আমাকে কেউ লেখক বলে চেনেই না। একই অফিসে জ্যোতিরিণ্ড্র নন্দীর সঙ্গে কাজ করব জেনে আমার মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা ছিল। তাঁর প্রতি আমার অগাধ অঙ্গা, তাঁর প্রতিটি রচনার আমি শুধু পাঠক, কিন্তু আমার মতন একজন অকিঞ্চিতকর ছোকরাকে তিনি হয়তো পাস্তাই দেবেন না। তাঁকে আমি জানাতেও পারব না যে আমি তাঁর কথানি অনুরাগী।

একদিন নিজেই তিনি বিড়ি ধরাবার জন্য দেশলাই চাইতে এসে আলাপ করলেন আমার সঙ্গে। মজলিশি বা আজড়াবাজ মানুষ না হলেও অন্তরঙ্গ পরিবেশে বেশ কথা বলতে পারতেন। তবে কিছুক্ষণ কথা বললেই বোঝা যায়, ইনি আর পাঁচজন মানুষের মতন নন। আগাগোড়া পারম্পর্য রেখে সাজিয়ে শুভ্রিয়ে কথা বলা তাঁর ধাতে নেই, তাঁর বাক্যগুলো ছেঁড়া ছেঁড়া, এক একটা শব্দের ওপর অত্যন্ত বেশি জোর দেন মাঝে মাঝে, যখন তখন হেসে ওঠেন। সত্যিকারের ইনট্রোভার্ট ধরনের মানুষ। চশমার পাওয়ার খুব বেশি বলেই হয়তো তাঁর দৃষ্টি খুব গাঢ় ও মর্মভেদী বলে মনে হয়। এবং অবাস্তুর বা ছেঁদো কথা বলার দিকে তাঁর ঝৌক ছিল না, তবে এক হিসেবে প্রায় সাহেবদের মতন তিনি আবহাওয়ার প্রসঙ্গ একবার না একবার তুলতেনই। অর্থাৎ আজকের রোদ বেশি তেজী না নরম, আকশ্মাজ মেঘলা না নীল, এটা তিনি দেখতেন। সাহিত্য ঘটিত এবং জীবনযাপনের যে-সব ব্যাপার সাহিত্যের সঙ্গেই জড়িয়ে যায়, সেই সম্পর্কেই কথা বলতে ভালবাসতেন।

তবে তাঁর মুখে অপর কোনও লেখকের নিন্দা শুনিনি কখনও, সাহিত্যের বাজারের ওঠা-পড়া নিয়ে লোকের সঙ্গে কথা বলতেন না, পুরস্কার-টুরস্কার নিয়ে কক্ষনো মাথা দ্বাঘাননি। শুধু তাঁর লেখা কখনও সে রকম জনপ্রিয় হল না বলে তাঁর মনে একটু ক্ষোভ ছিল, যদিও এ ব্যাপারটাও তিনি উল্লেখ করতেন হাসতে হাসতে। এরকম সময়ে তিনি নিজেকে শালা বলে সঙ্ঘোধন করতেন, বলতেন, আমার শালা কিছু হল না! তার একটু পরেই কিন্তু তিনি নিজের নতুন কোনও লেখার কথা সবিস্তারে বলতেন, অর্থাৎ লেখার আনন্দেই মশুশ হয়ে থাকতেন।

একবার তিনি হঠাৎ তাঁর ক্ষোভের কথা প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। এত লিখেও তিনি কখনও আর্থিক সাচ্ছল্যের মুখ দেখেননি। কলেজ স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে সবেদে বলেছিলেন, এবার থেকে আমি বিমল মিত্রের মতন লিখবো! তোমরা আমার যে-সব গল্পের প্রশংসা করো, তা লিখে কী হলো? দূর শালা, এখন থেকে শুধু গঞ্জে লিখব.গঞ্জে!

আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম, জ্যোতিদা, আপনি শত চেষ্টা করলেও বিমল মিত্রের মতন লিখতে পারবেন না। বিমল মিত্রের মতন লেখাও সহজ নয়, তা হলে তো অনেকেই শুঁকে অনুসরণ করত। আপনি আপনার মতনই লিখতে বাধ্য। অন্য কিছু লেখা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমার কথা অস্বীকার করে তিনি বারবার অসম্মোধের সঙ্গে মাথা নেড়েছিলেন।

আমাদের সৌভাগ্য, মুখে শুরকম বললেও, দারিদ্র্য মেনে নিয়ে, জ্যোতিরিণ্ড্র নন্দী
কখনও স্বধর্মচ্যুত হন নি।

তাঁর সঙ্গে কিছু অস্তরণতা হবার পরও একটা বিশ্বায়বোধ আমার ছিলই। মানুষ
হিসেবে তাঁকে মনে হত খুবই সরল ও অনেকটা শিশুর মতন, অথচ ইনিই মানুষের
অতি জটিল কামনা-বাসনা হিসার কথা লেখেন কী করে, ভেবে অবাক হয়ে যেতুম।

আরও দুটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। সাধারণত একটা বয়েসের পর লেখকদের মধ্যে
একটা আত্মস্তুর ভাব আসে! যা লিখেছি যথেষ্ট লিখেছি কিংবা আমি যা লিখি তার
কোনওটাই খারাপ হতে পারে না, এরকম আত্মপ্রাপ্তার ভাব প্রতিষ্ঠিত লেখকদের
মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। আমার সঙ্গে যখন প্রথম আলাপ, তখন জ্যোতিরিণ্ড্র নন্দী
পরিণত বয়স্ক এবং অনেকগুলি দারুণ লেখা লিখেছেন। অথচ সে সময়েও তাঁর
অনবরত চিন্তা ছিল কী করে লেখা আরও ভাল করা যায়। এজন্য তাঁর কৌতুহল ছিল
সদাজ্ঞাপ্রত, নতুন ছেলেমেয়েরা কী ভাবে, তা জানার চেষ্টা করতেন এবং পৃথিবীর
অন্যান্য দেশের আধুনিক সাহিত্য কী রকম হচ্ছে তা জানার জন্য নিয়মিত বিদেশি বই
পড়তেন। এমনকী আমার মতন মূর্খকেও তিনি মাঝে মাঝে জিঞ্জেস করতেন,
ইংরিজিতে নতুন কোন্ কোন্ লেখকের বই পড়া যায় বলো তো?

বাংলা ভাষাতেও তিনি তাঁর বয়়স্কনিষ্ঠদের লেখা পড়তেন মন দিয়ে, সাহিত্য যে
একটা সচল ব্যাপার, নতুন কালের লেখকরা যে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যায়, এই ধারণা
তাঁর খুব পরিষ্কার ছিল এবং সেই গতির স্পন্দন তিনি বোঝবার চেষ্টা করতেন খুব
মনোযোগ দিয়ে।

সেই ছোট সংবাদপত্রের চাকরিতে আমরা দু'জনেই বেশিদিন থাকিনি। কিন্তু তাঁর
পরেও তাঁর সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল এবং দেখা হলেই তাঁকে আমার
ঘনিষ্ঠ আঙীয়ের মতন মনে হতো। সাগরময় ঘোষ ওঁর ঘোবন-সুহৃদ, ওঁদের দু'জনের
একটা স্থায়ী অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, প্রত্যেক বছর অষ্টমী পুজোর সক্ষেবেলা দু'জনের
দেখা হবেই। সেদিন জ্যোতিরিণ্ড্র নন্দী নিজের শরীরকে ও মনকে কিছুটা অতিরিক্ত
পান-ভোজনে প্রশ্রয় দিতেন। শেষের দিকে কয়েকবার আমরাও জুটে যেতুম সেই
আজ্ঞায়।

১৩৭৬ সালের দেশ-এর সাহিত্য সংখ্যায় আমি জ্যোতিরিণ্ড্র নন্দী সম্পর্কে একটি
প্রবন্ধ লিখেছিলাম, তাতে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ ছিল, এখানে তার কিছু কিছু
আবার বলতে চাই। তাঁর মুখে তাঁর কোনও ভবিষৎ-গল্পের বর্ণনা শোনা ছিল একটা
অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতা। অনেকটা এই রকম....তারপর বুঝলে, দু' বঙ্কু গেল,
পুরীতে...একটা বাসা ভাড়া করে রইলো, বুঝলে, রাত্রে মেয়েটা বুঝলে, তারপর
মেয়েটা তো খুন হয়ে গেল, বুঝলে, তখন পাশের ঘাউবনে সাঁ সাঁ করে হাওয়া দিচ্ছে,
সাঁ সাঁ করে হাওয়া দিচ্ছে, বালির মধ্যে ঝাউগাছগুলোর পাতায়...।

মেয়েটার খুন হওয়ার ব্যাপারে তিনি সামান্য গুরুত্বও দিলেন না, কিন্তু পাশের
ঘাউবনের সাঁ সাঁ ঝড়ের বর্ণনায় তাঁর অস্তুত উদ্দেশ্যনা দেখা গেল, উঠে দাঁড়িয়ে হাত
নেড়ে নেড়ে তিনি ঝড়ের আন্দোলন বোঝাতে লাগলেন। তাঁর চোখ মুখ তখন

একেবারে পালটে গেছে, যেন তিনিই সেই ঝড়ের মধ্যে পড়েছেন।

আর একদিন তিনি খুব চিন্তিত মুখে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, “আমার একটা গল্পের বই বেরংবে, কী নাম দেওয়া যায় বলো তো? ‘সমুদ্র’ না ‘পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা’?” এ-রকম অঙ্গুত অলটারনেটিভ আমি আগে কখনও শুনিনি।

সেই ছোট সংবাদপত্র অফিসে কমলকুমার মাঝে মাঝে আসতেন আমার কাছে। হয়তো আমার মাধ্যমেই জ্যোতিরিণ্ড্র নন্দীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। দু'জনের লেখা দু'রকমের হলেও কোথাও যেন আমি একটা মিল খুঁজে পেতুম। কিন্তু এক পালকের পাথিরা একই জায়গায় বসবাস করলেও এক জাতের লেখকরা পরম্পরারের থেকে যথাসভ্য দূরে থাকেন। ওঁদের কথাবার্তা শুনে আমার মনে হয়েছিল, ওঁরা কেউই কারূর কোনও লেখা পড়েননি। এবং খুব আঙ্গরিকভাবে স্বভাব-বিরোধী কথা বলে যাচ্ছেন। যেমন, জ্যোতিরিণ্ড্র নন্দী বললেন, বুঝলেন কমলবাবু, লেখার জন্য অনেক অভিজ্ঞতা দরকার, বুঝলেন কিনা, অনেক ঘোরা দরকার, অনেক দেশ ও মানুষ দেখা দরকার, বুঝলেন, অনেক জায়গায় যাওয়া দরকার, বুঝলেন, এমনি এমনি কি হয়? কমলকুমার মজুমদার গাঢ়ীরভাবে বললেন, আমার কিন্তু তা মনে হয় না, জ্যোতিরিণ্ড্রবাবু, অভিজ্ঞতার জন্য তো ঘোরাঘুরির কোনও দরকার নেই। সমস্ত অভিজ্ঞতাই পাওয়া যায় প্রশ্নের মধ্যে, মানুষের মনীষার যা কিছু সবই তো প্রশ্নের মধ্যে আছে, অভিজ্ঞতার জন্য বাইরে তাকাবার কোনও আনন্দ নেই না।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কমলকুমার সেই সময় ছিলেন ডাকাবুকো ধাতের আডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষ, আর জ্যোতিরিণ্ড্র নন্দী ঘর-কুনো, একা-চোরা ধরনের।

আমাদের সেই কার্যালয়ের উলটোদিকে একটি নতুন চায়ের দোকান খুলল, সেখানে পরিবেশনকারিণী তিন-চারটি মেয়ে। কলকাতায় তখন এই রকম একটি ভজ্জগ উঠেছিল। অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে আমার এই ঘটনাটা মনে পড়ল। জ্যোতিরিণ্ড্র নন্দী আমায় একদিন বললেন, তোমায় একটা টাকা দিছি, তুমি ওই দোকানে গিয়ে চা আর কাটলেট খেয়ে একটু দেখে এসো তো, মেয়েগুলো কী করে? আমি সরলভাবে বললুম, আপনিও চলুন না। উনি প্রায় কুঁকড়ে গিয়ে বললেন, না, না, আমার চা সহ্য হয় না। বাইরের খাবার খাই না। তা ছাড়া ওই সব মেয়ে-টেয়ে, বুঝলে, তোমার কম বয়েস, তুমি বরং, বুঝলে...।

সেই চায়ের দোকানে শেষ পর্যন্ত জ্যোতিদা বা আমি কেউই যাইনি, দোকানটিও অবিলম্বে উঠে যায়। কিন্তু চায়ের দোকান নিয়ে জ্যোতিরিণ্ড্র নন্দী অবিস্মরণীয় গল্প লিখেছেন তার কিছু পরেই।

বিদায়, জ্যোতিদা। আবার দেখা হবে।

বৈঠকী মেজাজের এক উপেক্ষিত সাহিত্যিক

পত্রান্তরে অনুজপ্রতিম লেখক শ্রী শৈবাল মিত্র কিছুদিন আগে বাঙালি লেখক-বুদ্ধিজীবীদের খুব একচোট বকুনি দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ এই যে, যখনই এই সব ব্যক্তিদের প্রশ্ন করা হয়, আপনারা গত এক বছরে উল্লেখযোগ্য কী কী বই পড়েছেন, তখন অবধারিতভাবে প্রায় সকলেই কিছু ইংরিজি বই বা বিদেশি সাহিত্যের সুস্থাপিত শুরু করেন। তাঁরা কি বাংলা বই পড়েন না? নিজেরা বাংলা ভাষার লেখক হয়েও অপর কোনও বাঙালি লেখকের রচনাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না? না কি বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য কিছু লেখাই হয় না।

এই অভিযোগে সত্যতা আছে। পাণ্ডিত্য প্রমাণ করার জন্য অনেকেই বিদেশি সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান জাহির করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন; পাণ্ডিত্য কিংবা স্ববারিয়াই হোক, বাংলা বই-টই এর মধ্যে আসে না। কম্ফি হাউসের বুদ্ধিজীবীদের হাতে বাংলা বই রাখার রেওয়াজ নেই। টেক্নোলজি মতন কখনও মার্কেজ, কখনও দেরিদা-গ্রামসি, কখনও টনি মরিসন বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ওষ্ঠের ওপর খেলা করে যান।

বিদেশি সাহিত্য ও তত্ত্বগ্রন্থ পাঠ করা অবশ্যই জরুরি, কিন্তু বাংলা ভাষায় আলোচনাযোগ্য কোনও গ্রন্থ লেখা হয় না, এমন যদি মনে করা হয় তা হলে বাংলা ভাষা নিয়ে এত গর্ব করারই বা কী আছে? বিদেশি সাহিত্য পাঠ করলেই বরং বোঝা যায়, সম্প্রতি অন্যান্য ভাষায় রচিত গল্প-উপন্যাস-কবিতা বাংলার তুলনায় এমন কিছু আহামরি উচ্চাস্ত্রের নয়। সৈয়দ মৃত্তাকা সিরাজের ‘অলীক মানুষ’-এর মতন উপন্যাস কিংবা জয় গোস্বামীর ‘পাগলী, তোমার সঙ্গে’-র তুল্য কাব্যগ্রন্থ ইদানীং কোন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে?

যাই হোক, আমার পক্ষে এরকম পাণ্ডিতিপনা কিংবা স্ববারি দেখাবার কোনও সুযোগই নেই; কারণ গত এক বৎসরে আমি বিদেশি সাহিত্য কিছুই পড়িনি। এমনকী ইংরিজি অক্ষরে লেখা নিতান্ত কয়েকখানা পুরনো ইতিহাস-জীবনীগ্রন্থ ছাড়া কোনও গল্প-উপন্যাস ঢোকেও দেখিনি! বঙ্গ-বাঙ্গবরা কেউ যখন সাম্প্রতিক কোনও সাড়া-জাগানো বইয়ের প্রসঙ্গ তুলে জিজ্ঞেস করে, তুমি পড়েছ নিশ্চয়ই? আমাকে সসংকোচে স্বীকার করতেই হয়, না ভাই, পড়িনি। কিংবা বিদেশ থেকে ফিরে এলে যখন কেউ জিজ্ঞেস করে, ও দেশের হালফিল সাহিত্যের ধারা কী দেখলে, আমি মাথা চুলকোই। জানি না, খবর নেবার সময় পাইনি! লন্ডনে গিয়ে ইতিয়া অফিস লাইব্রেরিতে আমি পুরনো পুঁথিপত্র ঘেঁটেছি, একটাও নতুন ইংরিজি কবিতার বই কিনিনি, এটা স্বীকার করতে আমার লজ্জা হয়। এটা আমার একটা অধঃপতনের চিহ-

হিসেবে গণ্য হতে পারে। একসময়ে আমি ‘অন্য দেশের কবিতা’ অনুবাদ করেছি, বিভিন্ন ভাষার সাম্প্রতিকতম কবিতা পড়া ও কবিদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া আমার শখ ছিল!

কিছুদিন আগে দিল্লি থেকে বিমানে ফিরছি, হাতে একখানা বই। ট্রেনে বা বিমানযাত্রায় বই পড়ার প্রকৃষ্ট সময়, বেশ মনসংযোগ হয়। দূর থেকে এক সহযাত্রী উঠে এল আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য। সে আমার বহুদিন-পরিচিত, অতি ব্যস্ত বুরোক্টাট, প্রতি সপ্তাহে একবার-দু'বার বিমানে হিল্পি-দিল্লি যাতায়াত করে, আমার সঙ্গে এরকম যাত্রাপথেই মাঝে মাঝে দেখা হয়। কিছুক্ষণ কথা বলতে বলতে সে আমার হাতের বইখানা দেখে আতঙ্কে উঠল। আমার হাতে ‘নিবেদিতা লোকমাতা’। বিমানযাত্রীরা কেউই বাংলা বই পড়ে না। আমার পাঠ্য শুধু বাংলা বই নয়, ‘ধর্মের বই’? এর আগে সে আমার হাতে দেখেছে আর্থর সি. ক্লার্কের ‘স্পেস অডিসি ২০৬১’, কিংবা টনি মরিসনের ‘বিলাভেড’, কিংবা অমিতাভ ঘোষের ‘ইন অ্যান অ্যাস্টিক ল্যান্ড’। চোখ বড় বড় করে সে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। সে নিশ্চয়ই ভাবল, সুনীলকে তো জানতাম ধর্ম-টর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না, হঠাৎ এত পরিবর্তন হয়ে গেল কবে, রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষা নিয়েছে নাকি!

না, আমি এখনও ধর্ম-আশ্রিত হইনি, কোনও মিশনে দীক্ষা নেবার প্রয়োগ উঠে না। এই সব বই আমি পড়েছি প্রাণের দায়ে। কী কুকুলে আমি গত শতাব্দী শেষ এই শতাব্দীর সম্মিলিত ইতিহাসের পটভূমিকায় এক উপচায়াস ফেঁদে বসেছি, এখন তার জন্য উপাদান-সংগ্রহ ও তথ্য-যাচাই করতে করতে আমার সমস্ত সময় হরণ হয়ে যাচ্ছে। এখন হলদেটে রঙের, পোকায় কালী, জীৰ্ণ পত্রপত্রিকা ও বইয়ের পৃষ্ঠায় আমাকে দিনের পর দিন দৃষ্টিক্ষয় করতে ইয়ে। কোনও বইয়ের ফুটনোটে আর তিনটি অজ্ঞানা বইয়ের নাম দেখলে সেগুলিও সংগ্রহ করার বোঁক চাপে। শুধু একবার নয়, কোনও বই বারবার পড়তে হয়, ইংরিজিতে যাকে বলে ‘ইন বিটুইন দ্য লাইন্স’, তা খোঁজার জন্য। এত মন দিয়ে ছাত্র বয়েসে পড়াশুনো করলে আমি ফার্স্ট-সেকেন্ড হতে পারতাম।

কত কবিতার বই-ই তো হাতে আসে, সব কি আর পড়া হয়? তবু আমি অনঙ্গমোহিনী দেবী নান্মী এক কবির ‘শোক-গাথা’ কাব্যগ্রন্থটি পড়ছি কেন? কাব্যরসের সঙ্গান্তে নয়, প্রাণের টানেও নয়, শুধুমাত্র এই কারণে যে, এই অনঙ্গমোহিনী ছিলেন ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্র মানিক্যের কন্যা এবং সেই রাজ্যের উজির গোপীকৃষ্ণ দেববর্মার পত্নী। কাব্য নয়, নিছক ইতিহাসের উপাদান। এরকম প্রচুর নীরস গ্রন্থ ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে দু-একটি এমন বইও পাওয়া যায়, যা পাঠ করে আমি বিমল আনন্দ পেয়েছি। সেইরকমই, অধিকাংশ বাঙালি পাঠকের কাছে প্রায় অস্ত্রাত এক লেখকের কিছু রচনার কথা এখানে জানাতে চাই।

স্বামী বিবেকানন্দের দুই ভাইয়ের নাম মহেন্দ্রনাথ দত্ত ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। কনিষ্ঠ ভূপেন্দ্রনাথ প্রখ্যাত বিপ্লবী, এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন, তারপর দীর্ঘকাল বিদেশে থেকে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে বিপ্লবী প্রচেষ্টা চালিয়ে যান,

পরবর্তীকালে তিনি মার্কসবাদে দীক্ষা নিয়ে সমাজতন্ত্রবাদের প্রবক্তা হন। মধ্যম ভাতা মহেন্দ্রনাথই আমাদের আলোচ্য। মহেন্দ্রনাথ মধ্যপদ্ধা অবলম্বন করেছিলেন। অনুজ্ঞের তুলনায় তিনি বিবেকানন্দের সাম্মিধ্য পেয়েছিলেন অনেক বেশি, কিন্তু তিনি মিশন বা মঠে যোগদান করেননি। তিনি দেশ-বিদেশে প্রচুর ভ্রমণ করেছেন, বহু বিষয়ে পাণ্ডিত্য ছিল, অধ্যাত্মবাদের প্রতি আকর্ষণ থাকা সম্মেও গেরয়া ধারণ করেননি।

মহেন্দ্রনাথের বাংলা, ইংরিজি ও হিন্দি ভাষায় গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় একশোর কাছাকাছি। বিস্ময়কর তাঁর বিষয়বৈচিত্র্য। তাঁর অনেক বইই এখন খুবই দুর্লভ। ‘কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা’ নামে বইটিই এখনও পর্যন্ত কিছুটা পরিচিত, যাঁরা পুরনো কলকাতা নিয়ে প্রবন্ধ বা গল্প-উপন্যাস লেখেন, তাঁদের কাজে লাগে।

মহেন্দ্রনাথ বাল্যকালে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর যখন তাঁর শুটিকয়েক শিষ্য সংসার ত্যাগ করে নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বরানগরে শু আলমবাজারে আখড়া বাড়িতে থাকতে শুরু করলেন, মহেন্দ্রনাথ সে সব জায়গায় নিয়মিত যাতায়াত করতেন। অর্থাৎ পরবর্তীকালের রামকৃষ্ণ মিশনের প্রখ্যাত মহারাজদের তিনি অন্তরঙ্গভাবে দেখেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন দ্বিতীয়বার লন্ডনে বস্তুতা দিতে আসেন, তখন মহেন্দ্রনাথও প্রাতঃশুনোর জন্য সেখানে ছিলেন, বেশ কিছুদিন তিনি অগ্রজের সাম্মিধ্য পেয়েছিলেন। অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সারির শিষ্যদের জীবনের অনেক ঘটনারই প্রত্যক্ষদর্শী এই মহেন্দ্রনাথ। এই সব বিষয়ে তিনি অনেকগুলি স্মৃতিকথা লিখেছেন। ‘লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ’ নামে লিখেছেন তিনটি বই, ‘শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী’ও লিখেছেন তিন খণ্ড। ভক্তিরসের কথা বাদ দিয়ে যারা বাংলা ভাষায় রস-সাহিত্য পাঠে আগ্রহী, তাদের এই বইগুলি অবশ্যপাঠ্য।

মহেন্দ্রনাথকে অনায়াসেই বলা যায় সৈয়দ মুজতব আলীর পূর্বসূরি। বাংলা ভাষায় বৈঠকী মেজাজের রচনার আদিপুরুষ হিসেবে যদি ধরা হয় হতোম প্রাচা ওরফে কালীপ্রসন্ন সিংহকে, তা হলে সেই ধারারই আর একজন প্রধান লেখক এই মহেন্দ্রনাথ। তাঁর বইগুলির গুরুগত্ত্বের বা সাধু-সম্ম্যাসী জড়িত নাম দেখে হয়তো অনেকে বিমুখ হয়েছেন, কিন্তু তাঁর রচনায় রয়েছে প্রকৃত রসের ধারা এবং বাংলা ভাষাকে নিয়ে ইচ্ছেমতন খেলা করার দক্ষতা ছিল তাঁর। সাধু ও কথ্য ভাষার এমন সাবলীল সংমিশ্রণ খুব কম লেখকই ঘটাতে পেরেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের গদ্যরচনাও এই ধরনেরই, তাঁর গদ্যরীতি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, অথচ মহেন্দ্রনাথ একেবারেই উপেক্ষিত, এটা একটা দুঃখের কথা। ‘সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান’ (প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৬) নামে আকরণগ্রহণিতে কত বিস্মিত, অকিঞ্চিত্বকর লেখকের নাম আছে, কিন্তু মহেন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য নেই!

সাধারণ মানুষ যাঁদের মহাপুরুষ হিসেবে গণ্য করে, তাঁদের জীবনীগুলি বায়োগ্রাফি হয় না, হয়ে যায় হোজিওগ্রাফি। অর্থাৎ জন্মকাল থেকেই তাঁরা অসাধারণভোগী, কোনওরকম মানবিক দুর্বলতা যেন তাঁদের থাকতে পারে না, শ্রদ্ধা ও ফুলচন্দনে

চেকে দেওয়া হয় তাঁদের ধূলো-মাখা পা। এর ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে জীবন বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কচুর্য হয়। এর চেয়ে সাধারণ অবস্থা থেকে অসাধারণত্বের স্তরে ক্রমিক উভয়ন্মের কাহিনী অনেক বেশি চিভাকর্ষক, সাধারণ মানুষ তার থেকে সত্যিকারের প্রেরণা পেতে পারে। প্রকৃত লেখক কখনও বাস্তব-বিমুখ হতে পারেন না। তিনি মানুষের সর্বাঙ্গীণ রূপ ফোটাতে চান। কুমোরটুলির শিল্পীরা যখন দুর্গাঠাকুরের প্রতিমা গড়েন, তখন সামনের দিকটা হয় অপূর্ব সুন্দর, নিখুঁত বলা যেতে পারে, কত রকম তার সাজসজ্জা; কিন্তু পেছনে দিকটা থাকে উদোম, অসম্পূর্ণ, এমনকী খড়-বাঁশও বেরিয়ে থাকে। অর্থাৎ সামনের দিকটা সর্বাঙ্গসুন্দররূপে জনসাধারণকে দেখান হয়। পেছনের দিকটা রাখা হয় চোখের আড়ালে। কিন্তু খাঁটি কোনও শিল্পী বা ভাস্তুর যখন মৃত্তি গড়েন, তখন তিনি কোনও দিকটারই প্রতি অবহেলা করেন না। সন্ত-জীবনীকাররা ওই কুমোরটুলির শিল্পী, মহেন্দ্রনাথ দস্ত সাহিত্যিক।

মহেন্দ্রনাথের রচনায় ধারাবাহিকতা নেই। যখন যে ঘটনা মনে পড়েছে, সেই ভাবে লিখেছেন, ছোট ছোট এক একটি পরিচ্ছেদ, তাতে রচনাগুলি আরও চিভাকর্ষক হয়েছে। নিছক ঘটনা বর্ণনার বদলে তিনি মানুষগুলির চেহারা, পোশাক, মুখের ভাষার বৈচিত্র্য ও পরিবেশের নিখুঁত বিবরণ দিতে চান। শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর দশ-বারোটি যুক্ত ভবিষ্যতের কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই নিছক জেদের বশে বরানগরের একটি ভাড়া-বাড়িতে দিন কাটাচ্ছিলেন, সেই বাড়িটির বর্ণনা এই রকম: “মঠের বাড়িটা অতি প্রাচীন, ডগ, নীচেকালী ঘরগুলি মাটিতে ঢুবিয়া বসিয়া গিয়াছে; শৃঙ্গাল ও সর্পের আবাসস্থান। উপরে উঠিবার সিঁড়ির ধাপগুলি খানিকটা আছে, অনেকটা পড়িয়া গিয়াছে। বিতরের দালানের মেঝের খোয়া দুই হাত আছে তো দুই হাত উঠিয়া গিয়াছে। দরজা-জনালাগুলির তল্লা খানিকটা আছে, খানিকটা নাই; ছাতের বরগা পড়িয়া গিয়াছে, বাঁশ চিরিয়া ইটগুলি রাখা হইয়াছে। চতুর্দিকে জঙ্গল। ভূতের বাড়ি তো সত্যিই ভূতের বাড়ি। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া উভয় দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণ হাতে যাইতে প্রথম একটি নাতিবৃহৎ গৃহ—যেটিকে কালী বেদাঞ্জী বা ‘কালী তপস্থীর ঘর’ বলা হইত। তাহার পর দুই ধাপ উঠিয়া একটি ছোট দরজা এবং ভিতরে যাইবার পথ।...মেঝের উপর শয্যা স্থাপন করা হইয়াছিল, পালক তখন একটাও ছিল না। দানাদের ঘরে (কালী তপস্থীর ঘরটি ব্যতীত অপর যে একটি বড় গৃহ তাহার নাম ‘দানাদের ঘর’) বালন্দা পটপটীর খান দুই তিন মাদুর সংযুক্ত করিয়া মেঝেতে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে; অপর এক জায়গায় সতরঞ্জি রহিয়াছে—‘চোরের বিশ্বাসী’, কোনও জায়গায় টানাটা রহিয়াছে, অপর জায়গায় পড়েনটা রহিয়াছে—জেলের জালবৎ। মাথার বালিশ-বালন্দার চ্যাটাইয়ের নীচে নরম নরম ইট দেওয়া। শীত করিলে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া শয়ন, বা তাহাতে শীত না ভাঙিলে রাত্রিতে উঠিয়া একবার কুস্তি লড়িয়া লওয়া; শরীর গরম হইলে শীত পলাইয়া যাইত।”

মঠের সেই আদিপর্বের এমন নিখুঁত বর্ণনা আর কেউ দেননি। মেঝেতে যে মাদুর পাতা হত, সেটা এমনই জরাজীর্ণ যে চোরেও ছোঁবে না, তাই ‘চোরের বিশ্বাসী’। এই

বর্ণনার সবচেয়ে কৌতুহলজনক শব্দ হচ্ছে মাথার বালিশ হিসেবে নরম নরম ইট। ‘নরম নরম ইট’ কী বস্তু?

সেই মঠে খাবার-দাবারের ব্যবস্থা ছিল কীরকম? “কাহারও প্রদত্ত কিছু গ্রহণ করিবেন না ইহা স্থির করিয়া সকলেই মুষ্টিভিক্ষা করিতে লাগিলেন। ভিক্ষার যে চাউল আসিত তাহা সিদ্ধ করা হইত। তৎপরে এক বস্ত্রখণ্ডের উপর তৎসমূদয় ঢালিয়া তাহার চতুর্দিকে সকলে মিলিয়ে বসিতেন এবং লবণ ও লক্ষ্মার ঘোল করিয়া তাহাই দিয়া ভোজন সমাপ্ত করিতেন, কখনও বা তেলাকুচাপত্রের ঘোল হইত। জলপানের জন্য একটি মাত্র ঘটি ছিল। একটি বাটিতে নুন-লক্ষ্মার ঘোল থাকিত; সকলেই এক গ্রাস করিয়া একবার ভাত মুখে লইতেন ও একবার ওই ঘোল হাতে করিয়া মুখে দিতেন, জিহ্বায় অত্যন্ত ঝাল ঝাল লাগিত। গুরুসেবা ও গুরুভাইকে সেবা করা একই, এই ভাবটি তখন অত্যন্ত প্রবল ছিল।”

কিন্তু ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। কারণ এঁদের কাউকেই ভিখিরির মতন দেখতে নয়। স্বাস্থ্যবান জোয়ান ছেলেরা যখন ভিক্ষে করে, তখন তাদের প্রতি মানুষের করুণার বদলে অবজ্ঞা ও সন্দেহই বেশি জাগে। এক সম্মাসীর এক দিনের ভিক্ষে অভিযানের অভিজ্ঞতা এই রকম: “যোগানন্দ স্বামী বলিতেন, ‘একদিন আলমবাজারের একটি খোড়ো বাড়িতে ভিক্ষা করতে গেলুম। সকালে একটি স্তীলোক মেটে দাওয়ার সম্মুখে উঠান ঝাঁটি দিচ্ছিল। উঠানের সম্মুখে একটি গুঁড়কেল গাছ। গুঁড়য়াধারী যুবা পুরুষ ভিক্ষে করতে এসেছে, মাথা নেড়া, শিখাও নেই—কঠিও নেই, কস্তাল বাজিয়ে হরিনাম করছেনা, এ তো বৈরাগী ববাজী নয়, তবে এ লোকটা কে? স্তীলোকটি দেখে তো রেণে অগ্রিমা; বললে—যা মিলে, যা, এখানে ভিক্ষা পাবিনি; খেটে খেতে পারিস নি? দিনের বেলা ভিক্ষের ছলে সব ঘরদোরের সঙ্গান নিয়ে যাবি, আর রাত্তিরে সিদ কেটে চুরি করতে আসবি।’ এই বলে স্তীলোকটি রাগে গরগর হয়ে নারকেল গাছটার গোড়ায় শপ শপ করে ঝাঁটা মারতে লাগল।’ যোগেন মহারাজ যদিও জমিদার-সন্তান এবং মহা কৌতুকপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে ভিক্ষুক, হাসিবার উপায় নাই। অগত্যা স্থির চিন্তে তথা হইতে চলিয়া আসিলেন এবং মঠে পদার্পণপূর্বক ননাপ্রকার ব্যঙ্গছলে স্তীলোকটির অভিনয় করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, ‘মাগীটার আছেটা কী? একখানা খোড়ো ঘর, দুঁখানা ছারপোকাওয়ালা ছেঁড়া কাঁথা, আর শতেক তাপ্তি মারা একটি তামার ঘটি।’”

‘কাহারও প্রদত্ত কিছু গ্রহণ করিবেন না’, এই শপথ অবশ্য বেশিদিন রাখা যায়নি, ভিক্ষান্নেও খিদে মেটাতে হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্য কয়েকজন চাঁদা দিতেন, সেই টাকায় মঠের কাজ চলত। সংসারীদের মধ্যে অনেকেই যদিও এই হল্লোড়বাজ সম্মাসীদের পছন্দ করতেন না। সেইসব সাধারণ মানুষের মনোভাব মহেন্দ্রনাথ এইভাবে বর্ণনা করেছেন, “সাধারণ লোকের ভিতরে কথা উঠিল, ‘নরেন্টা পাগল হয়ে গেছে, তার মাথাটা বিগড়ে গেছে। কী বকে যে তার মাথামুণ্ড নাই, আবার বলে বেদান্ত, অবৈতবাদ...আমরা তো কোনও কালে এসব কথা শুনি নাই বাপু। আর শিখেছেন কতকগুলি বচনের ঝুঁড়ি। কাজকর্ম করিবার নাম নেই, চাকরি-বাকরি করার নামগন্ধ মুখে নেই। এর বাড়ি, ওর বাড়ি পেট ঠিসে আসে, আর কাজের মধ্যে

কতকগুলি ছোঁড়াকে বকিয়েছে। সেগুলোকে নিয়ে কীরকম করছে সব—একটা কর্মনাশার দল করেছে।”

মঠের জীবনে কৃত্তুতার মধ্যেও আনন্দের শ্রোত বয়ে যেত। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং রসে-বশে সম্মাসী। বিবেকানন্দও পরিহাসপ্রবণ, অন্য শিষ্যরাও কেউ সব সময়ে গুরুগন্তীর মুখ করে থাকতেন না, কেই চাইলেও অন্যরা থাকতে দিতেন না। এঁরা বিদ্যার্চার্চ করতেন, বিভিন্ন ধর্মের মূল তত্ত্ব ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করতেন, কথনও কথনও ধ্যান ও আরাধনায় মগ্ন হয়ে থাকতেন, আবার এরই মধ্যে মধ্যে চলত নানারকম হাস্যকৌতুক। সেইরকম অনেক টুকরো টুকরো ঘটনার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ অনবদ্য ভাষায়। অধ্যাত্ম বিষয় ছাড়াও তাঁরা যে সাহিত্য ও ভাষা নিয়েও আলোচনা করতেন, তার একটি উদাহরণ:

“শিবানন্দ স্বামী কঠোর জপ-ধ্যান করিতেন, চক্ষু চূলচূলু বিভোর, মাঝে মাঝে হাসিতেন। তিনি তখন বড় কৌতুকপিয় লোক ছিলেন। মাইকেল (বিষয়ে) কথাবার্তা শুনিয়া একদিন তাঁহার মনে খেয়াল হইল, বাংলা ভাষার সংস্কার করিতে হইবে। তিনি আরম্ভ করিলেন, ‘দ্যাখ, বাংলা ভাষায় একটি ক্রিয়াপদের সহিত দুই-তিনটা শব্দ যোগ না করিলে ক্রিয়া হয় না। ওরূপ চলিবে না। অন্য শব্দ সংযোগ না করিয়া একটি মাত্র ক্রিয়াপদেতেই ভাব প্রকাশ পাইবে।’ তিনি দাঁড়াইয়া কোমর কিঞ্চিৎ সামনের দিকে বক্র করিয়া ডান হাতের তর্জনী সম্মুখে চালিত করিয়া ত্রিসিতে লাগিলেন, ‘কেন, ইংরাজিতে হয়, বাংলায় হবে না কেন? এক কথায় জিয়াপদ করিতে হইবে।’ একজন কৌতুক করিয়া বলিল, ‘মহাপুরুষ আলুর দম করতে হইবে। এটা এক কথায় কী করে হবে?’ তিনি মন্দু হাসিয়া বলিলেন, ‘কেন, বলবে, আলুটা দমিয়ে দাও। দাঁড়াও দাঁড়াও, লুচি ভাজিবে কথাটা এক কথায় করতে হকে আচ্ছা, লুচিটা লুচাইয়া দাও।’ এই বলে নিজে উচ্চেঁস্বরে হাসিতে লাগিলেন, আরে ছি ছি, এ যে বেখাঙ্গা হয়ে গেল, এক আধটা চলবে না।’ আর সকলেই বিঙ্গপ করিয়া আরম্ভ করিল—‘মহাপুরুষ তামাকটা তমকাইয়া দিবেন।’ সম্মুখে শুণ্ঠ বসিয়া ছিল, ‘ওরে শুণ্ঠ, তামাকটা তমকাইয়া দে না!’”

লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ নিয়মিত বক্তৃতাসভায় কীভাবে ইংরেজ শ্রোতাদের মন জয় করেছিলেন এবং ভক্ত ও শিষ্য সংগ্রহ করেছিলেন, তার বর্ণনা ও বক্তৃতার বিষয়বস্তুর বিবরণ দিয়েছেন স্বামী গন্তীরানন্দ, শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং আরও কেউ কেউ। কিন্তু স্বামীজীর প্রতিদিনের জীবনযাপনের খুঁটিনাটি ঘটনার কথা লিখে গেছেন মহেন্দ্রনাথ। তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন ও অনেকগুলি বক্তৃতাসভায় হাজির থাকতেন। সেইজন্য মহেন্দ্রনাথের বিবরণের ওপর কিছুটা নির্ভর করতে হয়েছে পরবর্তী কালের জীবনীকারদের। স্বামীজীর ব্যক্তিগত জীবনের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে সম্পূর্ণ মানুষটি।

মহেন্দ্রনাথ যখন লন্ডনে যান, তখন তিনি সদ্য যুবা। তাঁর দাদার বয়েস তখন তেক্রিশ। সেই বয়েসেই বিবেকানন্দ বেশ বিখ্যাত এবং তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বে বহু মানুষ মুক্ত। মহেন্দ্রনাথ যেমন সেই রূপটি দেখেছেন, তেমনি দেখেছেন ঘরোয়া পরিবেশের মানুষটিকেও। বক্তৃতাসভায় যাঁর সিংহ-বিক্রম, বাড়ির মধ্যে তিনিই একজন স্নেহপ্রবণ

মানুষ, কখনও কিছুটা খামখেয়ালি, কখনও অস্ত্রির, কখনও ঝাস্ত। ছেট ভাইকে দেখেই তিনি নিজের সোনার কলম উপহার দেন, তার খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে হচ্ছে কিনা সেই খবর নেন। নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বেশ সচেতন, ভাল জাতের পাইপের তামাক না পেলে তাঁর মন ওঠে না, তাঁর ঝাল-প্রীতির জন্য সারা লভন খুঁজে খুঁজে তিনটি কাঁচালঙ্ঘা সংগ্রহ করে আনতে হয়।

লভনে এসেও মহেন্দ্রনাথের ঢোখ ধাঁধিয়ে যায়নি। সেখানকার জীবনযাত্রা অন্যরকম, রীতিমৌলি কিছুটা আলাদা, কিন্তু তাতে গদগদ হবার কিছু নেই। তিনি লক্ষ করেছেন, বিলেতের অনেক বাড়িতে যেসব মাদুর ও কার্পেট পাতা থাকে সেগুলি বাংলা দেশের মাদুর এবং মির্জাপুরী গালচে। এখানকার লোকেরা ঝিনুক ও শুগলি খায়। ঝিনুক বা অয়েস্টার অন্য জাতীয় হলেও শুগলি আমাদেরই মতন। ‘যদি শুগলির কোনও লোক লভনে গিয়া শুগলির ব্যবসা করে তা হলে বেশ ব্যবসা চলিবে।’

মহেন্দ্রনাথ পারতপক্ষে ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করেন না। অনেক বিলিতি দ্রব্যের তিনি চমৎকার বাংলা প্রতিশব্দ তৈরি করে নিয়েছেন। যেমন ইঞ্জিচেয়ার হচ্ছে সুখাসন এবং ফায়ার প্রেস হচ্ছে আতশীখানা।

লভনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শ্রীমতী হেনরিয়েটা মূলার এবং স্টার্ডি দম্পতি। শ্রীমতী মূলারের বাড়িতেই থাকতে হয়েছে বেশিদিন। এই শ্রীমতী মূলার ছিলেন ধনবতী মহিলা এবং ভারতের প্রতি অনুরক্ত, বেলুড় মঠ নির্মাণের সময়ে এবং জমি কেনার জন্য তিনি অনেক টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। জীবনীগ্রন্থগুলিতে এই কারণেই শ্রীমতী মূলারের নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু তিনি মানুষটি কীরকম ছিলেন, তা জানতে পারি শুধু মহেন্দ্রনাথের জীবনীর সুনিপুণ বর্ণনায়।

এই প্রোটা মহিলাটির চেহারা পুরুষালি, ঠাঁটে স্পষ্ট গৌঁফের রেখা এবং পুতনিতেও সামান্য চুল ছিল, গালে অবশ্য দাঢ়ি ছিল না। স্বতাবটা বদ মেজাজি, কখন যে কী মূর্তি ধরবেন তার ঠিক নেই। স্বামীজীকে তিনি নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন, খাওয়াচ্ছেল-পরাচ্ছেল। বক্ষতাসভার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, এ সবই তাঁর উদারতার পরিচয়, তথনকার দিনের লভনের পক্ষে খুবই ব্যক্তিক্রমী ঘটনা বলতে হবে। কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গীদের ওপর মাঝেই খাপ্পা হতেন। তখন স্বামীজী কলকাতা থেকে সারদানন্দকে আনিয়েছেন, মহেন্দ্রও পড়াশুনোর জন্য সেখানে জুটেছে, শুডউইন নামে একটি ইংরেজ ছোকরাও সর্বক্ষণ দুরব্যূর করে, এরা মিস মূলারকে বেশ ভয় পায়।

শ্রীমতী মূলারের মুখের ভাষা কীরকম ছিল তার একটি বর্ণনা আছে। শ্রীমতী মূলারের চেহারা তো ওইরকম, পোশাকও পরতেন উল্লেখ ধরনের। মাঝে মাঝে সাইকেল চড়ার শব্দ ছিল। একদিন স্টার্ডি ও তাঁর পঞ্জীকে নিয়ে সাইকেল চালাতে গেলেন গ্রামের রাস্তায়। শ্রীমতী স্টার্ডি ভাল সাইকেল চালাতে জানে না, উলটে পড়ে গেল আছাড় থেয়ে। একদল ছেলেমেয়ে জড়ো হয়ে হাততালি ও টিটকিরি দিতে লাগল। এর পরে মহেন্দ্রনাথের ভাষায়: “ঘণ্টাখানেক পরে মিস মূলার ফিরিয়া আসিয়া স্টার্ডির পঞ্জীকে বকিতে শুরু করিলেন, ‘অলবড়ে মাগী, বাইসাইকেল চড়তে

জানে না, পথে খানিকটা গিয়ে ধপ করে পড়ে গেল, কাপড়-চোপড়ে সব ধুলো লাগলো, পাড়ার হতভাগা ছেলেরা সব হোঃ হোঃ করে হাসতে লাগলো।...গাঁয়ের ছেঁড়াগুলি কী পাঞ্জি। আমাকে হাততালি দিতে লাগলো, কেউ বা ঢেলা ছুঁড়তে লাগলো, সব ছেলেমেয়েগুলো দল বেঁধে আমার বাইসাইকেলের পথ আটকে দিয়ে বলতে লাগলো, দ্যাখ দ্যাখ, একটা বুড়ো মাগী মদ্দোর পোশাক পরেছে'..."

মহেন্দ্রনাথের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃতি দিতে শেলে পুরো বইগুলিই তুলে দিতে হয়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির একটা বিশেষত্ব আছে। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাসভার বর্ণনা সবাই দেয়, মহেন্দ্রনাথও দিয়েছেন, কিন্তু বক্তৃতা শুরু করার ঠিক আগে স্বামীজী ঠিক কী অবস্থায় থাকতেন, কী কথা বলতেন, সে বর্ণনা শুধু মহেন্দ্রনাথের লেখাতেই পাওয়া যায়। মানুষ সম্পর্কে তাঁর ছিল অসীম আগ্রহ। তাঁর রচনায় যত চরিত্র এসেছে, প্রত্যেককেই যেন তিনি প্রথমে একটু দূর থেকে পুস্তানপুস্তভাবে লক্ষ করেছেন, তাদের অবয়ব, হাবভাব।

শ্রীমতী মূলারের কথা দিয়েই এই প্রসঙ্গ শেষ করা যাক। স্বামী বিবেকানন্দের শেষ জীবন পর্যন্ত অনেক বিদেশিনী মহিলার সঙ্গে স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। শ্রীমতী ওলি বুল, শ্রীমতী জোসেফিন ম্যাকলাউড, আর নিবেদিতার কথা তো বলাই বাহ্যে। কিন্তু শ্রীমতী মূলার, যিনি ইংল্যান্ডে স্বামীজীর প্রতিষ্ঠার জন্য এত সাহায্য করেছেন, ভারতে এসে থেকেছেন, বেলুড় মঠের জন্য বহু টাঙ্কা দিয়েছেন, তাঁর কোনও উল্লেখ আর পরবর্তীকালে পাওয়া যায় না কেন? সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল? ঝগড়াঝাঁটি? বিশদ বিবরণ কোথাও নেই, শুধু নিবেদিতাক কোনও একটা সময়ে শ্রীমতী মূলারের সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করা হয়েছিল।

যাই হোক, লভনে দ্বিতীয়বার শ্রীমতী মূলারের আশ্রয়ে থাকার সময়ে অনেকরকম সাহায্য পেয়েও তাঁর প্রতি স্বামীজী যে বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না, এর কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় মহেন্দ্রনাথের লেখায়। ঘটনাটি এরকম:

শ্রীমতী মূলারের একটা হামবড়া ও সবজান্তা ভাব ছিল, এই ভাব তিনি বেশি ফলাতেন সারদানন্দ ও মহেন্দ্রনাথের ওপর। ওরা কিছু বলতে গেলেই শ্রীমতী মূলার ধরকে দিয়ে বলতেন, তোমরা কিছু জানো না!

একদিন শ্রীমতী মূলার বলতে লাগলেন, আমি ভারতবর্ষের অনেক হানে ঘুরে বেড়িয়েছি, দেখেছি, রোগা রোগা গরু, রোগা রোগা কুকুর, চারদিকে সবই রোগা। আমরা কিন্তু এমন হতে দিই না। যখন গরু বা ঘোড়া বুড়ো হয়, তখন তাদের জীবনটা একটা বোৰা হয়। তাদের আর বেঁচে থাকবার দরকার কী? তাই আমরা বুড়ো গরু-ঘোড়াকে মেরে ফেলি, তাদের মাংস লোকে খায়। আমরা ইংরেজরা দয়ালু জাতি, আমরা বুড়োদের কষ্ট সহ্য করতে পারি না।

ইংরেজরা খুব দয়ালু জাতি, এই কথাটা বারবার শুনতে শুনতে সারদানন্দ আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তিনি ফস করে বলে ফেললেন, বাপ-মা বুড়োবুড়ি হলেও তো জীবন বড় কষ্টদায়ক হয়। কেন তাদের মেরে ফেলেন না?

শ্রীমতী মূলার বিকট মুখভঙ্গি করে বললেন, আঁ? কী বললে?

শ্রীমতী মূলারের মা বেঁচে আছেন, তাঁকে তিনি বিশেষ ভক্তি-শৰ্কা করেন। সারদানন্দের কথা শুনে তিনি দপদগ্নিয়ে উঠে গেলেন। তারপর আর সারদানন্দ-মহেন্দ্রের সঙ্গে কথাই বলেন না। প্রণাম নিতে চান না, কেমন আছেন জিজ্ঞেস করলে মুখ ফিরিয়ে নেন। সারদানন্দ তো খুব তয় পেয়ে গেলেন, বিবেকানন্দ জানতে পারলে নিশ্চয়ই রাগ করবেন। শ্রীমতী মূলারের মুখে মুখে কথা না বলে চুপ করে শুনে গেলেই হত।

মহেন্দ্র অবশ্য সাজ্জনা দেয়, যেমন কথা, তেমনই তো উত্তর দিয়েছেন। অত ভয় পাবার কী আছে? না-হয় এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব!

দিন তিনেক পরে বিবেকানন্দ ঠিক অস্বাভাবিক অবস্থাটা লক্ষ করলেন। তিনি সারদানন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হ্যাঁ রে পাগলী বুড়ির সঙ্গে কী হয়েছে?’ সারদানন্দ কাঁচুমাচু, তখন মহেন্দ্রনাথ জানিয়ে দিলেন ঘটনাটি।

“স্বামীজী বলিলেন, ‘ও খ্যাপতান মাগীর জ্বালায় অস্থির করে তুলেছে। দ্যাখ শরৎ, এ দেশে যে মাগীরা বে করে না সেগুলো বুড়ি হলে দু’রকম হয়। কতকগুলো মাগী ফেটিয়ে যায় (মোটা হয়), সেগুলো ঠাণ্ডা ভালমানুষ থাকে। কতকগুলো মাগী শুটকে যায়; সে মাগীরা খিটখিটে হয়। এই খ্যাপতান মাগীর জ্বালায় অস্থির করে তুলেছে। ওরে বাপু, তোরা বুড়ি মাগীর সঙ্গে খুব সাবধানে চলবি। ঘরে ও চুকলেই দাঁড়িয়ে উঠবি, কেমন আছেন জিজ্ঞেস করবি, প্যান্টালুনের পকেটে হাত রাখবিনি। বুড়ি যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে, তা বাপু তোরা সন্তুষ্ট করবি। আর পারিনি বাপু, সারাদিন লেকচার করতে হবে, ভিজিটরদের সঙ্গে দেখা করতে হবে, আবার বুড়িকেও সন্তুষ্ট করতে হবে...’।”

মহেন্দ্রনাথ এই সব রচনায় নিজেকে কখনও জাহির করেননি, নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কোনও প্রসঙ্গ আনেননি, এটা একটা বড় শুণ। এমনকী নিজের নাম না দিয়ে সর্বত্রই বলেছেন, বর্তমান লেখক। নিজেকে তিনি আড়াল করে রেখেছেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, স্মৃতিকথায় এই সব খুঁটিলাটি ও সংলাপ কতদূর সত্য, এতে কি কল্পনার কিছু মিশ্রণ আছে?

উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থে মহেন্দ্রনাথের রচনা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি আছে। তবে ঘটনারই উদ্ধৃতি আছে, রঙ-কৌতুক বা সংলাপ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সব রঙ-কৌতুক-সংলাপের সত্যতা সম্পর্কে কোনও প্রতিবাদও আমার চোখে পড়েনি।

লওনে স্বামী বিবেকানন্দ (তিনি খণ্ড) — মহেন্দ্রনাথ দস্ত

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী (তিনি খণ্ড) — মহেন্দ্রনাথ দস্ত

আমার মাস্টারমশাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ম্যার, ভাল আছেন?

হ্যাঁ, এখন ভাল আছি। তুমি কেমন আছ?

শুভ্রবার রাত্তিরে উনি শুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন, অথচ শুভ্রবার সকালেই ওঁর সঙ্গে এই কথা হল। উনি শুধু আমার অগ্রজ সাহিত্যিক নন, আমি সিটি কলেজে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছাত্র ছিলাম কিছুদিনের জন্য, দেখা হলে স্যার বলেই সম্মোধন করতাম। করতাম—এই অতীত ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করতে কীরকম অবিশ্বাস্য লাগছে, সত্যিই আর দেখা হবে না!

পৃথিবীতে ওঁর সূস্থ শেষ দিনটিতে দেখা হয়ে গেল একটা যোগায়োগের ফলে। কয়েকজন মিলে এক জায়গায় কবিতা পাঠের কথা ছিল। আমাকে যখন সকালবেলা ডাকতে আসা হল, তখন নীচে নেমে দেখি, গাড়িতে উনি বসে আছেন। সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখ, পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সজীব কৌতুহল, শুধু চোখের নীচে সামান্য একটু ক্লাস্তির ছাপ—আর কিছু না।

গাড়িতে প্রায় পঞ্চাশ মিনিটের যাত্রা, যেতেও যেতে অনেক গল্প, অনেক প্রসঙ্গ। গাড়িতে ছিলেন রবীন্দ্র সংগীতজ্ঞ সন্তোষ হেনপুপ, কবি মণীন্দ্র রায় ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় খ্যাতনামা সাহিত্যিক এবং খ্যাতনামা শিক্ষক এবং এই দুটি সম্মাই ছিল প্রবল—সুতরাং কথবার্তা এই দু'দিকেই ছাঁয়ে যেতে লাগল। সাম্প্রতিক বিশ্ববৃত্তা, যুব অসন্তোষ, যুনোখুনি—এ সব কথা তো আসবেই। ওঁর কথায় সমালোচনা ছিল, কিন্তু তিঙ্কতা ছিল না—দেশের যুব শক্তির ওপর অসীম বিশ্বাস—এরা কখনও কখনও বিপথে যায়, আবার এরাই দেশের পরিবর্তন আনে। বললেন, কিছু ছেলে উদ্ঘন্ততা দেখাচ্ছে টিকই, কিন্তু পুলিশের শুলি খেয়ে যে অনেক নিরীহ ছাত্র মারা যাচ্ছে, এটা আমি সহিতে পারি না। একজনকে তো জানি, ক্লাস করে সদ্য বেরিয়েছে, আচমকা লাগল পুলিশের শুলি, শেষ হয়ে গেল—কী করে মানব এ ব্যাপার!

আবার বললেন, কিছু ছেলে লেখাপড়া বন্ধ করতে চাইছে, পরীক্ষা বাতিল করতে চাইছে—কিন্তু এটাই পুরো ছাত্র সমাজের ছবি নয়। একদিন ইউনিভার্সিটিতে ঢুকতে যাচ্ছি, দেখি যে রাস্তায় ব্যারিকেড বানানো হচ্ছে, এক্ষুনি দুমদাম শুরু হবে। ক্লাসে শিয়ে ছেলেমেয়েদের বললাম, দ্যাখো গোলমাল হতে পারে—তোমরা যে-যে ইচ্ছে করো বাড়ি চলে যেতে পারো। আশ্চর্য ব্যাপার, একটি ছাত্র বা ছাত্রীও গেল না। সারাক্ষণ ক্লাসে থেকে মনোযোগ দিয়ে পড়া শুনল। আমি দেখেছি তো, একালের ছেলেমেয়েদের সাহসও অনেক বেড়ে গেছে।

আমি গাড়ির সামনের সিটে বসে উসখুস করছিলুম। আর থাকতে না পেরে
বললুম, স্যার, আমি একটু সিগারেট খাব?

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় হেসে বললেন, নিশ্চয়ই! তোমার ঘোলো বছর বয়েস হয়ে
গেছে অনেকদিন! এখন আর ওসব কি! ছেলেবেলায় আমার একজন মাস্টারমশাই
ছিলেন, তাঁর সামনেও আমি সিগারেট খেতাম। প্রথম প্রথম, মাস্টারমশাইকে ঘরে
বসিয়ে আমি বারবার উঠে যেতাম বাইরে। বাইরে দাঁড়িয়ে ছসহাস করে সিগারেট
টেনে আসতাম। মাস্টারমশাই একদিন বললেন, তুই এত ঘন ঘন বাইরে যাস কেন?
তোর কাছে সিগারেট আছে? দে তো আমাকে একটা!... আমার সেই গুরুকে আমি
এখনও দারূণ শ্রদ্ধা করি!

পুজোর সময় নৈনিতাল, রানীক্ষেত্রের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলেন—সেই কথা
উঠল। বললেন, তবে প্রমণের আনন্দ আর সে রকম নেই। রিজার্ভেশানের ঝঝাট,
স্টেশনে গিয়ে বসে থাকা, অসহ্য ভিড়, মানুষের হৃদয়হীনতা, ঘূর্ম, জুয়াচুরি—এসব
দেখলে প্রকৃতির কাছে গিয়েও শাস্তি পাওয়া যায় না। বয়েস যখন কম ছিল তখন
বেড়াতে গিয়ে এত আনন্দ... আমার সবচেয়ে ভাল লাগে সৌওতাল পরগনার নানা
জায়গা—সুনীল, তুমি গেছ ওদিকে?

কে যেন বললেন, ফিরে এসে আপনার তো শরীর অসুস্থ হয়েছিল?

হ্যাঁ, একটু ফুর মতন হয়েছিল—বাইরে থেকে কলকাতায় ফিরলে অনেক সময়
এরকম হয়, তার ওপর কালী পুজোর মাইক্রো উৎপাত—এখন ভাল আছি।

স্পষ্ট মনে আছে, ভাল আছি কথাটাৰ ওপৰ উনি একটু জোর দিয়েছিলেন।

গন্ধব্যাস্তলে পৌছে কবিতা পাঠ। ডেনিই প্রথম পড়লেন, কারণ ওঁকে আবার ফিরে
গিয়ে ইউনিভার্সিটিতে ছাস করতে হবে। একটি কবিতা প্রকৃতি বিষয়ক, আর একটি
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে। খুব সংকোচের সঙ্গে বারবার বলছিলেন, আমি তো অনেকদিন
কবিতা লিখি না—ছেলেবেলায় লিখতাম অজস্র, কিন্তু এতদিনের ব্যবধানে ভাষা
অনেক বদলে গেছে, এখনকার কবিদের সামনে আমার পড়তে লজ্জা হচ্ছে।

কবিতা পাঠ করলেন জড়তাহীন সুললিত কঠে। ওঁর কঠস্বর একটু সরু, কিন্তু
রেকর্ড হ্বার পর মাইক্রোফোনে যখন গমগমে আবৃত্তি ভেসে উঠল, তখন উনি হেসে
বললেন, বাঃ, বেশ তো!

ওঁকে আগে যেতে হবে, উনি সবার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আমাকে বললেন,
সুনীল, একদিন এসো আমার বাড়িতে, কাছেই তো—

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, হ্যাঁ যাব—

কী করে জানব, সেটাই শেষ দেখা—আমার আর যাওয়া হবে না! সেইদিনই
রাত্রে ওঁর মন্তিক্ষে রক্তক্ষরণ হতে থাকে—ওঁকে নিয়ে যাওয়া হয় কারনানি
হাসপাতালে।

সিটি কলেজে আমি কিছুদিন ওঁর ছাত্র ছিলাম। আই এসসি পড়েছিলাম অন্য
কলেজে, তাতে সুবিধে করতে পারিনি—তাই বি এসসি পড়ার বদলে যখন বি এ
পড়া ঠিক হল, তখন অন্য অনেকের আপত্তি না শুনে আমি জোর করে ভর্তি
১৬৮

হয়েছিলাম সিটি কলেজে। একমাত্র কারণ, ওখানে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পড়ান, তাঁকে দেখতে পাব, তাঁর কথা শুনতে পাব। সেই বয়েসে, প্রিয় লেখকের সাম্প্রদ্যের চেয়ে বড় আকর্ষণ আর কিছু হতে পারে না। কত নিদ্রাহীন রাত্তিরে যে-লেখকের বই আমার সঙ্গী, সেই লেখক নিজে আমার সঙ্গে কথা বলবেন, এ কি বিরাট সৌভাগ্য !

ধপধপে ফরসা গায়ের রং, তখন অত্যন্ত ঝর্পবান পুরুষ ছিলেন। ওর স্বভাবে কোনও ভারিকি ভাব ছিল না, অথচ ক্লাসে কেউ কোনওদিন কোনও বিষয় ঘটায়নি, ছাত্রদের আপন করে নিতে জানতেন, সবাইকে করে নিতেন এক আলোচনার অংশীদার। পড়াশুনোয় কোনও নীরস কঠোরতা ছিল না—সাবলীল আবহাওয়ায় সাহিত্য পাঠ হত। মনে আছে, উনি আমাদের রবীন্ননাথ পড়াতেন, মুক্তধারা নাটকটির আলোচনা মন্ত্রমুক্ত হয়ে শুনতাম। আমার মতো ক্লাস-পালানো ছেলেও পারতপক্ষে ওর ক্লাস ফাঁকি দেয়নি।

প্রথম প্রথম যখন ওর ক্লাসের এক কোণে বসে থাকতাম, তখন মনে হত, উনি জানেন না, ওর ক্লাসের একটি ছেলে ওর সব লেখা পড়েছে, এমনকী অনেক লেখা দু'বার তিনবার পড়েছে! কথাটা অতিরিক্ত নয়—আমার যখন কোনও লেখকের লেখা ভাল লাগে তখন তাঁর সমস্ত লেখা যেখান থেকে হোক ঠিক খুঁজেপেতে পড়ে ফেলি। তখন আমি ওর লেখার দারুণ অনুরাগী, উপনিবেশ পড়ে মুক্ত হবার পর একে একে পড়ে ফেলেছি স্বার্ট ও শ্রেষ্ঠী, বৈতালিক শহানন্দা, ট্রফি, শিলালিপি। সেটা উনিশ শো তিপ্পান্ন চুয়াম সালের কথা, কোনও পুজো সংখ্যায় বেরিয়েছে ওর গল্প, ‘আবাদ’, কতবার যে পড়েছিলাম সেট ঘুঁজটা! স্পষ্ট মনে আছে, তখন একটা লঘু দায়িত্বজ্ঞানহীন পত্রিকায় ওর শিলালিপি বইটার নিষ্ক বিদ্বেষপ্রসূত বিরূপ সমালোচনা বেরিয়েছিল—তখন ‘শিলালিপি’ আমার হট ফেতারিট, সেই সমালোচনা পড়ে আমি এমন রেগে গিয়েছিলাম যে, হাতের কাছে পেলে সেই সম্পাদককে হয়তো মেরেই বসতাম।

কিছুদিন ক্লাস চলার পর উনি যখন আমাকে চিনলেন, তখন কিন্তু ওঁকে এইসব কথা কিছুই বলিনি। ওর লেখা নিয়ে কোনওদিন ওর সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি। বস্তুত, কোনও লেখকের সঙ্গে তাঁর লেখা বিষয়ে কীভাবে আলোচনা করতে হয়, তা আমি এখনও জানি না। শিলালিপি বইটা বঙ্গবাঙ্গবদের ধরে ধরে পড়াচ্ছি তখন, কিন্তু সেই বইয়ের লেখকের সামনে সে বিষয়ে একটা কথাও বলতে পারিনি।

অন্যান্য বই নিয়ে, সাহিত্য নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কয়েকবার গেছি ওর পটলডাঙ্গার বাড়িতে। ওই বাড়িতে একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি বড় হয়ে কী হবে? লেখক হবে নাকি? লেখক হবার দুরাকাঙ্ক্ষা আমার তখন ছিল না। আমি বলেছিলাম, না, স্যার, আমার ইচ্ছে করে নানা দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতে। উনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, তারপর বুঝি ফিরে এসে শ্রমণ কাহিনী লিখবে? দেখো লেখক হতে হলে কিন্তু অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে। লেখকের জীবন বড় কষ্টের।

আমি ওর প্রিয় ছাত্রদের অন্তর্গত ছিলাম না। লেখাপড়ায় আমি কোনওদিনই ভাল ছাত্র নই, তা ছাড়া ফোর্থ ইয়ারে উঠে অন্যান্য ব্যাপারে এমন মন্ত হয়ে উঠি যে,

কলেজের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কই চুকে যায়। এখন অবশ্য আফশোস হয়, কেন আর একটু মন দিয়ে লেখাপড়া করিনি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আশ্র্য স্মৃতিশক্তির কথা অনেকেরই জানা। বইয়ের রেফারেন্স, বা কবিতার লাইনই যে শুধু মনে থাকত তাই নয়—মানুষের মুখ ও নাম মনে রাখারও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কলেজ ছাড়ার পাঁচ ছ' বছর বাদে ওর সঙ্গে এক জ্ঞানগায় দেখা। আমার দৃঢ় ধারণা, উনি আমাকে চিনতে পারবেন না। মাত্র বছর দেড়েক ওর ছাত্র ছিলুম, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ফ্লাসেও পড়িনি—আমাকে চিনতে পারার কোনও প্রশ্নই ওঠে না—কিন্তু উনি ঠিক আমাকে দেখেই এক নিমেষও চিন্তা না করে বললেন, কি সুনীল, কেমন আছ? তারপর আমাদের ব্যাচের অন্যান্য ছেলে—ফণিভূষণ আচার্য, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শিবশঙ্কু পাল প্রভৃতির কথাও জিজ্ঞেস করলেন। আমি স্তুতি !

তিনি বছর আগে জলপাইগুড়ির বন্যার পর ওঁকে আর এক ভূমিকায় দেখেছিলাম। উন্নতরবঙ্গের বন্যার পর কলকাতায় সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে পথ-শোভাযাত্রা করে কিছু সাহায্য ও জামাকাপড় সংগ্রহ করার প্রস্তাব উঠেছিল। শ্যামবাজার থেকে শোভাযাত্রা বেরম্বার কথা। গিয়ে দেখি বিশেষ কেউ আসেনি, কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও আশা দেবী ঠিক উপস্থিত। উন্নতরবঙ্গে উনি অনেকদিন কাটিয়েছেন, ওখানকার প্রতি ওর ছিল আন্তরিক টান। সেদিন ছিল প্রচণ্ড রোদ—সেই রোদের মধ্যেই ঘণ্টা চারেক পায়ে হেঁটে ঘুরে সেদিন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও আশা দেবী শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

‘দেশ’ পত্রিকায় উনি সুনন্দর জার্নাল লিখছিলেন প্রায় সাত বছর ধরে। দেশের সমসাময়িক সমস্যা সম্পর্কে উনি বিশেষ সজাগ ছিলেন, অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিল ওর মন, তাই এই দীর্ঘকালেও ওর কখনও বিষয়বস্তুর অভাব হয়নি। এতদিন ধরে এমন বিচিত্র রচনা অব্যাহত রাখার কৃতিত্ব করত্বানি তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু একটি সংখ্যার সুনন্দর জার্নাল পড়ে রীতিমতন চমকে উঠতে হয়। রচনাটি আগামোড়া বিষয় হাহাকারের মতন। আজকের বর্বরতা ও কুচিলীনতায় তিনি ব্যথা বোধ করেছেন, তা ছাড়াও লেখাটিতে নিজের মৃত্যুচিন্তা বড় বেশি উপস্থিত। একাধিক জ্ঞানগায় নিজের অস্তিত্ব বিলোপের কথা উল্লেখ করলেন কী করে? এক জ্ঞানগায় লিখেছেন, ‘আপাতত এই মৃহূর্তে বুক ভাঙা আর্তনাদে আমার গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে: ‘আমি জনমের শোধ ডাকি গো মা তোরে—ইত্যাদি ইত্যাদি।’ এবং পরের সংখ্যা ‘দেশ’-এ যদি সুনন্দর জার্নালের পাতা অদৃশ্য হয়—আশা করি তা হলে আপনারা কেউই বিশ্বিত হবেন না।’ এবং রচনাটি শেষ করতে গিয়ে আবার লিখেছেন, ‘অসুস্থ শরীরে জার্নাল লিখতে লিখতে ভাবছি, পরের সংখ্যায় সুনন্দর পাতাটি যদি না থাকে, তা হলে জানবেন, আর একটি কমনম্যান বাঙালীর অবলুপ্তি বা আত্মবিসর্জন ঘটল।’

মৃত্যুর আগে কি মনের ভেতর তার কোনও বার্তা আসে? জানি না। এটা ভাবতে ভাল লাগে, কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। অসুস্থ শরীরে অনেক সময় মৃত্যুচিন্তা আসে, হয়তো এটা তারই প্রকাশ। সেই অসুখ থেকে তিনি সেরে উঠেছিলেন, শুক্রবার সকালে বাড়িতে আমাকে বলেছিলেন, ভাল আছি।

কিংবা শরীরে অসুখের প্রকোপ বোধহয় তিনি টের পেয়েছিলেন। মৃত্যুকে অনুভব করেছিলেন অবচেতন ভাবে। কিন্তু তিনি হার মানতে চাননি। মৃত্যুকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। গত সংখ্যায় ওই জ্ঞানালের পরেও তিনি আবার লিখেছিলেন, ওইটাই শেষ লেখা নয়। এবং গাড়িতে একটু জোর দিয়ে বলেছিলেন, এখন ভাল আছেন।

তাই রবিবার রাত্রে তাঁর মৃত্যু সংবাদ শনে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি।

অ্যালেন গিন্সবার্গের কবিতা এবং কলকাতা

অ্যালেন গিন্সবার্গ তার বঙ্গ পিটার অরলভস্কিরে নিয়ে কলকাতায় আসে ১৯৬২ সালে। কোনও আমন্ত্রণে নয়, প্রাণের টানে। এর আগে আমেরিকার এক আসরে পরিচয় হবার পর অ্যালেন গিন্সবার্গ বুদ্ধদেব বসুকে বলেছিল, এমনকী আমি পায়ে হেঁটেও ভারতে পৌছতে চাই। সত্যি সত্যি পায়ে হেঁটে আসেনি, তবে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে হিচ হাইক করেছিল। সম্ভল ছিল, কবিতার বই বিক্রির রয়ালটি। কবিতার বই বিক্রির টাকায় বিশ্বজ্ঞান? আমাদের কানে তো অসম্ভব শোনাবেই, সম্পূর্ণ দেশগুলিতেও অস্বাভাবিক। কিন্তু ততদিনে অ্যালেনের 'হাউল' এবং 'কাডিস' নামে দুটি কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে, 'হাউল' সাংঘাতিক জনপ্রিয় হয়েছিল, কয়েক লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছিল, এ রকম শুনেছি। এবং অ্যালেনদের জীবনযাত্রা ছিল অবিশ্বাস্য রকমের অনাড়ম্বর। পায়ে ছেঁড়া জুতো, ধার-করা জ্বামাকাপড় (অ্যালেন এক মৃত বঙ্গুর কিছু পোশাক পেয়েছিল), ভোজনং যত্নত্ব, শয়নং...প্রায় হট মন্দিরে। কলকাতায় অ্যালেন এসে উঠেছিল চাঁদনি চক্রের পেছনে, অতি সস্তা, নোংরা ও গরিবদের মুসলমান হোটেলে। ঘর ভাড়া ছিল কুড়ি টাকা। তখনও হিপি কালচার শুরু হয়নি, কলকাতায় অতি গরিব চেহারার আমেরিকান সাহেব আগে দেখা যায়নি।

হিপি আন্দোলন ছিল যুদ্ধ-বিজ্ঞাপ্তি, ডিয়েতনামে আমেরিকান আক্রমণ সেই সব আমেরিকান যুবকরা সমর্থন করেনি, পরে এটা একটা হজুরা ও সাব-কালচারে পরিণত হয়। অ্যালেনদের গোষ্ঠীটা তার পূর্ববর্তী, ওদের খলা হত বিট জেনারেশন, চলতি কথায় বিটনিক, এরা প্রধানত শিল্পী, কবি, গায়ক, সব রকম প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতাই এদের লক্ষ্য। অ্যালেন মনে করত, যে কবিতা লিখবে টিক করেছে, তার কোনও রকম চাকরি-বাকরি করা উচিত নয়, সে চকিষ ফটাই কবিতার জন্য নিবেদন করবে। লিখে-টিখে যা সামান্য পয়সা পাবে, তা দিয়েই গ্রাসাচ্ছাদন করতে হবে, না কুলোলে কম খাবে, জুতো জামা পরবে না, ট্রাম-বাসে না উঠে হাঁটবে। আমরা যারা সেই সময়কার তরঙ্গ কবি, এই সব কথা শুনে দারশ রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, কবিতা লেখাই তো কবির একমাত্র কাজ, সে কেন ইঙ্গুল মাস্টারি করতে যাবে, কিংবা সংবাদপত্রে হাবিজাবি গদ্য লিখবে।

কিন্তু কবিতা লিখে, সপরিবারে দূরে থাকা, একা একাও বেঁচে থাকা, আমাদের দেশে, উপর্যা দিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়, কাটামুণ্ডের দিবাস্বপ্ন !

সেবারে কলকাতায়, বারাণসীতে ও ভারতের অন্যান্য জায়গায় প্রায় বছরখানেক কাটিয়ে গিয়েছে অ্যালেন ও পিটার। কলকাতায় তার অনেক বঙ্গবন্ধুর জুটে গিয়েছিল, তাদের সঙ্গে নিমতলা শ্রশানঘাটে প্রায়ই আড়া হত। এবং কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে। সেই সময় থেকেই অ্যালেনের অতীন্দ্রিয়বাদের দিকে ঝোঁক চাপে,

সেই জন্য সে দক্ষিণেশ্বরে, তারাপীঠে ঘোরাঘুরি করেছে। এ ছাড়াও বঙ্গদের সঙ্গে গিয়েছিল জামশেদপুরে এক সাহিত্যসভায় যোগ দিতে, সেখান থেকে চাইবাসায় ও পাট্টায়। ওই দুই স্থানে সমীর রায়চৌধুরী ও মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। অ্যালেনের প্রভাবে এবং বিট জেনারেশনের সূত্র ধরে রায়চৌধুরী আত্মব্যুৎপন্ন করে হাঁরি জেনারেশন নামে এক আন্দোলন, কিছুদিনের জন্য বাংলা সাহিত্যে তা বেশ হইচই তুলে দিয়েছিল। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু প্রমুখ কয়েকজন প্রথমদিকে যোগ দিয়েছিল ওই আন্দোলনে, তারপর হঠাৎ পুলিশি হামলা শুরু হতে এরা সরে আসে।

অ্যালেন আবার কলকাতায় ফিরে আসে ১৯৭১ সালে। তখন বাংলাদেশ যুদ্ধ চলছে, শরণার্থীদের দুর্দশা সে নিজের চোখে দেখতে চেয়েছিল। আর কখনও তার আসা হয়নি, যদিও আসার ইচ্ছা আছে, স্মৃতির সরণি বেয়ে সে এদেশে আবার ঘূরতে চায়। কিন্তু আগের মতন কষ্ট করে থাকার মতন বয়েস বা স্বাস্থ্য তার নেই, কোনও সংস্থা থেকে তাকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। আগামী দু'চার বছরের মধ্যে অ্যালেন গিন্সবার্গের পক্ষে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার খুবই সম্ভাবনা আছে। তারপর নিশ্চয়ই তাকে আমন্ত্রণ জানাবার ধূম পড়ে যাবে।

কলকাতা ছাড়াও অ্যালেনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে বেশ কয়েকবার। নিউ ইয়র্কের গ্রিনিচ ভিলেজে ওদের অ্যাপার্টমেন্টে স্নামি বেশ কিছুদিন থেকেছি। আর একবার দেখা হল, যুগোশ্লাভিয়ার এক কর্মসূক্ষ-উৎসবে (তখন যুগোশ্লাভিয়া নামে একটি দেশ ছিল), সেখানে রূপ্ত কবি ভজনেন্দ্রনাথও ছিল, কয়েকদিন খুব আড়া হল। আর একবার আমেরিকায় ভার্যাত-উৎসবে অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে ছ'জন ভারতীয় কবিও প্রেরিত হয়েছেন। সেই দলে দৈবাং আমাকে যুক্ত করা হয়েছিল। আমেরিকার বিভিন্ন শহরে ভারতীয় কবিদের কবিতা পাঠের ব্যবস্থাপনার অনেকখানি দায়িত্ব নিয়েছিল অ্যালেন নিজে। সেটা ১৯৮৬ সাল। সেবারে ভারতীয় কবিরা যে যার মাতৃভাষায় কবিতা পাঠ করেছে, ইংরেজি অনুবাদ পড়ে দিয়েছে স্থানীয় কোনও কবি। আমি কবিতা পড়েছি বাংলায়, সেগুলির ইংরেজি অনুবাদ পড়েছে অ্যালেন। তার মতন একজন প্রখ্যাত কবি আমার মতন একজন অখ্যাত জনের কবিতা পাঠ করেছে প্রকাশ্য সভায়, এতে আমি খুবই লজ্জা পেয়েছি, মরমে মরে গিয়েছি যাকে বলে। আমার নিষেধ না শুনে অ্যালেন নিজেই আগ্রহ করে পড়তে চেয়েছিল।

অ্যালেনের সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে ১৯৯৩ সালে। এর মধ্যে তার অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখন আর ছেঁড়া জামা পরে না, অনিষ্ট সঙ্গেও তার উপার্জন প্রচুর। বই বিক্রির টাকা তো আছেই, তার কবিতা সে গান গেয়ে ক্যাসেট বার করেছে, তারও বিক্রি অনেক। সে নিজের তোলা ছবির একটি অ্যালবাম প্রকাশ করেছে, বিভিন্ন মানুষের পোর্টেট, প্রতি পৃষ্ঠায় তার নিজের হাতের লেখা মন্তব্য। সে অ্যালবামটিও বেস্ট সেলার। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাকে কবিতা পাঠের জন্য ডাকে, হাজার হাজার ডলার সম্মান দক্ষিণা দেয়। এ ছাড়াও সে ব্রুকলিন কলেজের ভিজিটিং প্রফেসর, তার পড়াবার বিষয়বস্তু বিট জেনারেশনের সাহিত্য, অর্থাৎ তার নিজের ও

বঙ্গুবান্ধবদের রচনা। পৃথিবীতে আর কোনও অধ্যাপক এমন চমৎকার বিষয়বস্তু পেয়েছেন কী? অ্যালেন পুরোদস্ত্র সুট-টাই পরে পড়াতে যায়। ম্যানহাটনের একটি আকাশচূম্বী হর্মের চলিশ তলার কক্ষে আমাকে একদিন সে তার ফ্লাসে নিয়ে গিয়েছিল। এক ঘণ্টা করে ফ্লাস, সপ্তাহে দু' দিন। সে জন্যই তাকে যা মাঝে দেওয়া হয়, তা শুলে আমাদের এখানকার অনেক অধ্যাপকের হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে আমি সে অঙ্কটা আর উল্লেখ করলাম না।

অ্যালেনের জীবনযাত্রা এখনও আগের মতনই অনাড়ুবর। উপার্জনের অনেক টাকাই সে বিলিয়ে দেয়। থাকে ১২ নং রাস্তার একটি সাধারণ ফ্ল্যাটে। সম্পূর্ণ মশলা ছাড়া নিরামিষ আহার। সাদা ভাত ও পাতলা ডাল ভালই রাখে, আমাদের খাইয়েছিল। তার ফ্ল্যাটের মধ্যে একটি ছোট ঠাকুরঘর আছে। সেবারে আমাদের সঙ্গে ছিল নবনীতা দেবসেন, সে সেই ঠাকুরঘর দেখে খুবই কৌতুহলী হয়ে উঠেছিল। অ্যালেন অবশ্য এখন হিন্দু অধ্যাত্মবাদ ছেড়ে বৌদ্ধদর্শন ও তাত্ত্বিকতায় আকৃষ্ট। গাঁজা একেবারেই ছাঁয় না, মদ কোনওদিনই খেত না, সিগারেটও ছেড়েছে অতি কষ্টে। সিগারেট ছাড়ার মন্ত্র হিসেবে একটি স্বরচিত গান আমাদের গেয়ে শুনিয়েছিল।

সেবারে অ্যালেনের স্বাস্থ্য ভাল দেখিনি। একটা চোখে থ্রেসিস হয়েছে। কিন্তু প্রথম দেখা হওয়া মাত্রই বঙ্গুত্তের প্রগাঢ় উষ্ণতায় জড়িয়ে ধরা কখনও ভোলার নয়। তারপর সেই অসুস্থ শরীরেই পথে পথে স্নেরা, আর কলকাতার বিভিন্ন পরিচিতজনের খবরাখবর নেওয়া।

১৯৮৬ সালের সেই ভারত উৎসবের সময় অ্যালেন আমাকে তার সম্প্রতি প্রকাশিত 'কালেক্টেড পোয়েম' উপন্থুর দিয়েছিল। আমরা সাধারণত কাউকে বই উপহার দিলে শুধু নামটা লিখে দিই। অ্যালেন আমায় আগেও যত বই পাঠিয়েছে, তাতে নানারকম ছবি এঁকে ও বিচিত্র সব যত্নব্য লিখে দিয়েছে। এই বইতেও ফুল, চাঁদ, তারা এঁকে এক জায়গায় লিখল, 'Happy that we exchange poems about after Quarter Century'.

এই কাব্যসংগ্রহের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮৩৭, যদিও এতে আছে তার ১৯৮০ সাল পর্যন্ত রচিত কবিতাবলি। এমন চমকপ্রদ রকমের সুসম্পাদিত গ্রন্থ আর দেখিনি। পেছন দিকে সংকলিত তথ্যপঞ্জি, যার নাম দেওয়া হয়েছে Appendix, তারই পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯০। এ বই যে-কোনও সম্পাদকের আদর্শ হতে পারে। সম্পাদনা কে করেছেন, তাঁর নাম নেই, হয়তো গ্রন্থকার নিজেই, হ্যাঁ, স্বপন মজুমদারও তাঁর কাছে হার মেনে যাবেন।

এই সুবিশাল গ্রন্থটি এ দেশে সুলভ নয়, কলকাতায় অনেকেই দেখেননি, তাই মাঝে মাঝেই ভেবেছি, এই কাব্যসংগ্রহটি নিয়ে কিছু লেখালিখি করলে মন্দ হয় না। কিন্তু আগে এতখানি ব্যক্তিগত কথাবার্তা লিখলাম কেন? তার কারণ, শুধু কবিতা বিষয়ে পাতার পর পাতা লিখতে আমার ইচ্ছে করে না, কেমন যেন একঘেয়ে মনে হয়। কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধের বই পড়তে গিয়ে দেখেছি, একই কথা বারবার বলা হচ্ছে, কিংবা কবিতার যে-সব ব্যাখ্যার দরকার নেই, তাও বিস্তারিত করা হচ্ছে অকারণে।

তা ছাড়া, এই প্রজন্মের অনেকেই হয়তো আলেন গিন্সবার্গ ও তার বক্সুদের কাব্য আন্দোলনের পটভূমিকা জানে না। সামান্য একটু সূত্র ধরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। মানুষটাকেও চেনা দরকার।

পুরো বইয়ের কবিতাগুলি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সাত কাণ্ড হয়ে যাবে, সে চেষ্টাও আমি করব না। আমি শুধু লিখব আলেন গিন্সবার্গের ভারত, বিশেষত কলকাতার পটভূমিকায় লেখা কবিতাগুলি বিষয়ে।

আলেন গিন্সবার্গের জন্ম নিউ জার্সিতে, ১৯২৬ সালে, অর্থাৎ সদ্য তাঁর ৭০ বছর পূর্ণ হয়েছে। বাবা লুইস গিন্সবার্গও ছিলেন মাঝারি ধরনের কবি। প্রথাগত লিখিক লিখেছেন অনেক। বাবার প্রভাবেই সম্ভবত, আলেন লিখিকের ঘোর শক্র। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই গদ্য কথা বলার ভঙ্গিতে লেখা। আমেরিকান কবিতায় আলেন গিন্সবার্গ নতুন ভাষারীতির প্রবর্তন করেছেন। একথা অনেকে স্বীকার করেন। জনসূত্রে ইতৃদি, মায়ের নাম নায়োমি। মায়ের উদ্দেশেই তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘ কবিতা 'কাডিস' লেখা। এই কবিতায়, অতি সাধারণভাবে, চোখে না দেখা, খবরের কাগজ পড়া ভারতের উল্লেখ আছে।

With your eyes of Russia

With your eyes of no money

With your eyes of false China

With your eyes of Aunt Elanor

With your eyes of starving India

With your eyes pissing in the park

With your eyes of America taking a fall...ইত্যাদি

প্রসঙ্গত বলে দিই, আলেন আমেরিকাকে এত গালাগালি দিয়েছেন, বাবা-মা তুলে গালাগাল দিয়েছেন বলা যায়, কোনও কবি নিজের দেশের এমন নির্মম সমালোচনা করেছেন বলে জানা নেই। তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের নাম 'The Fall of America, Poems of these States.' তাঁর একটি কবিতার কিছু পঞ্জক্ষি:

America when will we end the human war?

Go fuck yourself with your atom bomb...

America when will you be angelic?

When will you take off your clothes?

When will you look at yourself through your grave?

When will you be worthy of your million Trotskyites?

America why are your libraries full of tears?

America when will you send your eggs to India...

আলেন ঢে শুয়েভারাকে নিয়েও কবিতা লিখেছেন। কিন্তু আমেরিকা এমনই এক মজার দেশ যে এরকম একটি প্রতিবাদী কঠিকেও রোধ করার কোনও ব্যবস্থা

সে-দেশে নেই। এক সময় ছিল, য্যাকার্থির আমলে ছিল, কিন্তু ঘাটের দশকে ব্যক্তিস্বাধীনতা চরম অবস্থায় পৌছয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকান সৈন্যদের বর্বর অত্যাচারের কাহিনী আমেরিকান সংবাদপত্রই ফাঁস করে দেয়। অ্যালেনের ক্ষেত্রেও বিচিত্র ব্যাপার ঘটেছে, তাঁর তীব্র প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ফলে প্রথম প্রথম প্রতিষ্ঠান তাঁকে গ্রাহ্য করেনি, কিন্তু কবি হিসেবে তাঁর মৌলিক ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছে। এবং কবি যতই অনিচ্ছুক হোন না কেন, প্রতিষ্ঠান এক সময় তাঁকে গ্রাস করবেই। অ্যালেনকে ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে, আমেরিকান অ্যাকাডেমি অ্যান্ড ইন্সটিউট অফ আর্টস অ্যান্ড লেটার্সের সদস্য করে নেওয়া হয়েছে। অ্যালেনের কাগজপত্র শুছিয়ে রাখা ও চিঠিপত্র লেখার জন্য এখন একজন সেক্রেটারি আছে, সেই সেক্রেটারির মাইনে দিয়ে দেন সরকার।

অন্যান্য আরও কিছু কবির মতো অ্যালেনও মনে করেন, তাঁর সমস্ত কবিতাই আসলে একটি নিরবচ্ছিন্ন কবিতা। অথবা কবিতাই আঞ্চলিকীয়। সেই জন্যই এ সংগ্রহের ভূমিকায় অ্যালেন লিখেছেন, ‘Herein author has assembled all his poetry books published to date rearranged in straight chronological order to compose an autobiography। সেই জন্যই কবিতাগুলি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করলে তাঁর জীবনযাত্রারও পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতে পৌছে অ্যালেন প্রথম যে-দীর্ঘ কবিতাটি লেখেন, সেটা হিন্দু দেবী কালীর উদ্দেশে একটি স্তোত্র, নাম, ‘Stotras to Kali Destroyer of Illusions’. এটা বন্ধেতে বসে লেখা। কলকাতায় এসে যে ছোট কবিতা লিখলেন, সেটার নাম ‘To P.O.!’. এই পি.ও. হচ্ছে অ্যালেনের বক্ষু ও এককালোর শ্যায়সঙ্গী পিটার অরলভন্স। পিটার নিজেও একজন কবি (অ্যালেনের সঙ্গে মাঝেমাঝে কয়েকবার দেখা হলেও পিটারকে ঘিতীয়বার দেখেছি তিরিশ বছর পর। মাঝখানে সে বেশ কিছুদিন মানসিক হাসপাতালে বন্দি হয়ে ছিল। ’৯৩ সালে যখন দেখা হল, তখন সে সুস্থ হয়ে উঠেছে, চেহারার অনেক পরিবর্তন হলেও আগের মতনই কৌতুকপ্রিয়, আমাকে চিনতে পারল ঠিকই, কিন্তু কলকাতার স্মৃতি অনেক ফিকে হয়ে এসেছে)। কলকাতায় সেই ’৬২ সালের ৮ জুলাই অ্যালেন পিটারের উদ্দেশে কবিতাটি লিখেছিল, কারণ, সেদিন পিটারের জন্মদিন। কবিতাটি নিষ্ক গদ্য বর্ণনার মতন, কিন্তু তাতেই অ্যালেনের কবিত্বের জ্ঞান।

কয়েকটি পঞ্জক্ষি এ রকম:

The white washed room, roof
of a third rate Mohammedan hotel,
two beds, blurred fan
whirling over yr brown guiter,
Knapsack open on floor, towel
hanging from chair...

একে তো জুলাই মাসের ভ্যাপসা গরম, তারপর ওই রকম চাপা, অঙ্ককার হোটেলের ঘর। পাখা একটা ঘোরে বটে, কিন্তু তাতে যতটা ঘ্যাড়ঘ্যাড় শব্দ হয়, তার

চেয়ে হাওয়া কম। সুতরাং ভারত সম্পর্কে যতই রোম্যান্টিক মোহ থাকুক, প্রথম প্রথম এই দুই আমেরিকানের পক্ষে গরমের কষ্ট উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কলকাতায় তাই অ্যালেনের দ্বিতীয় কবিতার নাম Heat. এর কিছু অংশ:

Eye like mango flowing orange pus

Ears Durga people vomiting in their sleep

Got huge legs a dozen buses move inside Calcutta

Swallowing mouthful of dead rats...

কলকাতা ছেড়ে দুই বঙ্গুত্তে কিছুদিন বেনারস গিয়ে থাকেন। শহর হিসেবে কলকাতার চেয়ে বেনারস যে অনেক বেশি আকর্ষণীয়, তা স্বীকার করতেই হবে। কলকাতায় এসে আবর্জনার স্তুপ, ভাঙা রাস্তা, ভিধিরি, বেওয়ারিশ কুকুর, এইসবই বেশি চোখে পড়ে, বেনারসেও এই সবই আছে। কিন্তু তার অতিরিক্ত আরও অনেক কিছু আছে। এই শহরের প্রাচীনত্বই একটা রোমাঞ্চ এনে দেয়। গঙ্গার ঘাটগুলিতে দাঁড়ালেই যেন অনুভব করা যায় ঐতিহাসিক প্রবহমানতা।

কাশীতে গিয়ে অ্যালেনের প্রথম কবিতা দশাখ্রমেধ ঘাটে বৃষ্টির বর্ণনা। তখন ফেরুয়ারি মাস, শীতকালের বৃষ্টি। এই পর্যায়ে অ্যালেনের সব কবিতাই নিছক দৃশ্য ও বস্তুর বর্ণনা, যেন সরাসরি গদ্যভাষা, তারই মধ্যে হঠাত হঠাত বাক্যবক্ষের অঙ্গুত মোচড়। এর একটা উদাহরণ তুলে দিচ্ছি:

Because a dog barked at a madman with dirty

wild black hair who rag round

his midriff and water pot in hand

Stopped in midstreet turned round and gazed up at the balconies, window

Shops and City stagery filled with gleem activity

Shrugged and said Jai Shankar! to the imaginary audience of Me's...

উশাদটির বর্ণনা দিতে দিতে তার জয় শংকর বলে চেঁচিয়ে উঠা, তারপরই 'imaginary audience of Me's' হঠাত কবিতাটিকে ঝলসে দেয়।

বেনারসে থাকতে থাকতেই একজনের কাছে অ্যালেনরা কবি উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামসের মৃত্যুসংবাদ পান। আমেরিকার পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে এই ডবলু সি উইলিয়ামসকেই বিট জেনারেশনের কবিতা বিশেষ মান্য করতেন, একথা আমি অ্যালেনের মুখে অনেকবার শুনেছি। এরপরের কবিতাটি তাই 'Death News', তাতে যেমন রয়েছে শৃঙ্খলা সংক্ষার, তেমনই এসেছে কাশীর গঙ্গানদীর কথা।

পরবর্তী কবিতাটি বারাণসীতে বসেই লেখা, কিন্তু গৃহকূট পর্বত বিষয়েই এর নাম: 'Valture Peak: Gridhakuta Hill'। এরপর বারাণসী থেকে কলকাতা ফেরার পথে দুঁজনে পাটলায় থেমেছিলেন, সেই যাত্রায় 'Patna-Benaras Express' নামের কবিতাটি লেখা হয়। দ্বিতীয়বার এসেও অ্যালেন কলকাতায় বেশ কিছুদিন ছিলেন,

কিন্তু কবিতা লেখা হয়েছে একটাই, 'Last Night in Calcutta.'

যতদূর মনে পড়ে, অ্যালেন-পিটারের কলকাতা ত্যাগের আগের রাত্রিটি কাটানো হয়েছিল উৎপলকুমার বসুর বাড়িতে। উৎপল তখন একটি মন্ত বড় ফাঁকা বাড়িতে থাকে, সে বাড়িটি তখন বিক্রির অপেক্ষায়। খুব হইচই-এর পর শেষ রাত্রে যে যেখানে পেরেছে শুয়ে ঘুমিয়েছে। তার কিছুটা বর্ণনা আছে এই কবিতায়:

Pushkin sits of the bookshelf. Shakespear's
Complete works as well as Blake's unread—
O Spirit of Poetry, no use calling on you
babbling in this emptiness furnished with beds
under the bright oval mirror—perfect
night for sleepers to dissolve in tranquil
blackness, and rest there eight hours
Walking to stained fingers, bitter mouth
and lung gripped by Cigarette hunger...

সব মিলিয়ে অ্যালেনের কলকাতায় রাচিত কবিতাগুলি খুব একটা উচ্চাসের নয়। সেই তুলনায় কেনারসে লেখা কবিতাগুলি অনেক বেশি সমৃদ্ধ। কলকাতায় আজ্ঞা হয়েছিল বেশি।

দ্বিতীয়বার একান্তর সালে এসে আক্ষেন একটিমাত্র কবিতা লিখেছিলেন, 'September on Jessore Road'। এই কবিতাটি খুবই বিখ্যাত ও নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অ্যালেনের সমগ্র কবিতাবিলির মধ্যেই এই কবিতাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর আঙ্কিকের পরীক্ষাও চমকপ্রদৰ্শন দারিদ্র্য, হতাশা, নিপীড়ন, অসহায়তার বর্ণনাই হয়ে উঠেছে মন্ত্রের মতন। অ্যালেনের নিজস্ব সুরে, নিজের গলায় গাওয়া এই কবিতাটির ক্যাসেট এবং সি. ডি. পাওয়া যায়। কবিতাটির মধ্যে এক জ্ঞায়গায় আমার নাম আছে, সে কথা চাপা গর্বের সঙ্গে আমি আগে অনেকবার উল্লেখ করেছি। সুতরাং এখন আবার সেই কবিতার উদ্ধৃতি দেওয়া বাঢ়াবাড়ির পর্যায়ে পড়ে যাবে।

অ্যালেন প্রায় বৎসরকালের ভারত পর্যটনে কবিতা কম লিখেছেন, কিন্তু ডায়েরি রাখতেন। সেই গদ্যরচনা 'ইন্ডিয়ান জার্নালস' নামে বই হিসেবে ছাপা হয়েছিল। সে বইতে কলকাতা ও পশ্চিমবাংলার অনেক রেখাচিত্র আছে, শক্তি, সন্দীপন, তারাপদ রায়, মতি নন্দী প্রমুখের উল্লেখ আছে অনেকবার। কিন্তু উদ্ধৃতি দিতে পারছি না, সেই বইটি অ্যালেন যথাসময়ে আমাকে পাঠালেও এখন আমার কাছে নেই। বছর দশকে আগে একটি নতুন লিটল ম্যাগাজিনের তরঙ্গ সম্পাদক আমার বাড়িতে বইখনি দেখে কাকুতি-মিনতি করে চেয়ে নিয়ে যায়। ঠিক চারদিন পরে ফেরত দিয়ে যাবে বলেছিল। আমি সরল বিশ্বাসে অনেককেই বই দিয়ে ফেলি। সেই যুবকটি কিন্তু আর ফিরে আসেনি। পত্রিকাটিরও পরবর্তী কোনও সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। সেই পত্রিকা ও সম্পাদকের নামও আমি ভুলে গেছি। তাকে আর কখনও দেখিনি।

বই মেরে দেওয়া এমন কিছু অভিনব ঘটনা নয়। আমার বাড়িতেও ফেরত

না-দেওয়া অপরের কিছু বই আছে। কিন্তু সেই একটিমাত্র বইয়ের জন্য যুবকটি
কেলই বা তার পত্রিকা বক্ষ করে দিল এবং একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল, তা আমার
কাছে আজও রহস্যময় মনে হয়।

সমরেশদা

সমরেশ বসু আমাদের ঠিক এক দশক আগের লেখক। অর্থাৎ আমরা যখন সদ্য স্কুল ছাড়িয়ে কলেজে এসেছি তখন তিনি উদীয়মান তরুণ লেখক। ‘পরিচয়’ কিংবা ‘দেশ’ ছাড়াও অনেক ছোটখাটো পত্রিকায় তাঁর লেখা বেরছে, যতদূর মনে পড়ে, তাঁর ‘অকালবৃষ্টি’ নামে একটি দুর্ধর্ষ ছোটগল্প কোনও ছোট পত্রিকাতেই প্রথম ছাপা হয়েছিল। আমরা তখন কবিতা নিয়ে মাতামাতি করছি, কবিতার পত্রিকা প্রকাশ করছি; কবিতা সাধারণত গদ্য রচনা বিশেষ পড়ে না, কিন্তু আমি সব পত্র-পত্রিকায় প্রতিটি রচনা তন্মতম করে পড়তাম এবং সমরেশ বসুর অগ্রগতি লক্ষ করেছি।

দেশ পত্রিকায় কালকৃট নামে ধারাবাহিক উপন্যাস ‘অমৃতকুণ্ডের সন্ধানে’ প্রকাশের পরই তরুণ লেখক সমরেশ বসু হয়ে গেলেন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। তখনকার খুব উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের প্রকাশক সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্ত ‘বি টি রোডের ধারে’ উপন্যাসের লেখককে, সোনার কলম পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করলেন, তারাশঙ্কর থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত খ্যাতনামা লেখকেরা সমরেশ বসুকে সাদুর অভ্যর্থনা জানালেন। আমাদের মতন কম্প্যুটাইউনের ছেলে ছোকরারা তাঁকে বরণ করে নিয়েছি আরও আগেই।

কোনও লেখকের রচনা পড়ে মুক্তাজাগলে সেই লেখকের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও জানতে ইচ্ছে করে। সময়ের বসু সম্পর্কে তখন নানা ধরনের সত্য-মিথ্যে গল্প প্রচলিত ছিল। কফি হাউসের আড়তায় তিনি বিশেষ আসতেন না, কিন্তু কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় তাঁকে দেখা যেত প্রায়ই। দৈর্ঘ্যে কিছুটা খাটো, কিন্তু অত্যন্ত রূপবান পুরুষ। মুখখানি সহাস্য। তাঁর প্রতিদিনের পোশাকই নজরে পড়ার মতন। যদিও তাঁর প্রথম যৌবন বেশ দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে, সেই সময়েও তাঁর অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়, কলকাতায় তাঁর কোনও বাসস্থান ছিল না, নৈহাটি থেকে ট্রেনে যাতায়াত করতেন, কিন্তু এক একজন মানুষই থাকে এরকম, পোশাকের সুরুচি সম্পর্কে সজাগ। তাঁকে আমি কোনওদিনই য়লো কিংবা ইন্সি-নষ্ট জামাকাপড় পরতে দেখিনি, সুদৃশ্য পোশাকে তাঁকে মানাতোও খুব।

১৯৬৫ সালে শারদীয় দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ‘বিবর’। সঠিক বছরটা আমার মনে থাকবার কারণ, পরের বছরই ওই শারদীয় সংখ্যায় একটি উপন্যাস লিখে আমি অনধিকারীর মতন গদ্যের জগতে অনুপ্রবেশ করেছিলাম। ‘বিবর’ প্রকাশিত হবার পর সঞ্চোককুমার ঘোষ দেশ পত্রিকায় একটি চিঠি লিখে সেই উপন্যাসের অজ্ঞ প্রশংসা করে জানান যে, তাঁর মতে বিবর দশটি শ্রেষ্ঠ বাংলা উপন্যাসের অন্যতম। প্রায় সমসাময়িক কোনও লেখক সম্পর্কে অপর প্রতিষ্ঠিত কোনও লেখকের এরকম

লিখিত উচ্চাস সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। তারপরেই 'বিবর'কে কেন্দ্র করে বিতর্কের ঘড় ওঠে। পরের বছর প্রজাপতি প্রকাশিত হলে সেই বিতর্ক অন্যদিকে মোড় নেয়। সাহিত্যে ঝীল-অঞ্জীল বিষয়ে আলোচনা-সভা বসে বহু জায়গায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী, এবং অন্যত্র। কেম্ব জানি না, সেইসব সভাতে আমারও ডাক পড়তে লাগল, সেই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়টা জমে ওঠে। যদিও এর আগে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়েছে কয়েকবার, সাগরময় ঘোষের দফতরে, সন্তোষকুমার ঘোষের ঘরের আড়ায়। একবার সন্তোষকুমার আমাকে প্রায় জোর করেই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন নৈহাটিতে সমরেশ বসুর বাড়িতে। তাঁর প্রথম পত্নী গৌরী দেবীর একটি সংগীত প্রতিষ্ঠানের সেদিন বার্ষিক উৎসব, সাগরময় ঘোষ, সুচিত্রা মিত্র প্রমুখ আরও অনেকে গিয়েছিলেন। প্রায় সারারাত খুব হইচই ও ফুর্তি জমেছিল খুব।

ঝীল-অঞ্জীল আলোচনা-সভাগুলিতে সমরেশ বসু প্রতিপক্ষের আক্রমণের উভর দিতেন জোরালো যুক্তি দিয়ে, আমাদের দেশের নির্যাতিত নিরম মানুষদের পোশাক ও মুখের ভাষার উদাহরণ তুলে ধরতেন প্রায়ই। আমি আমার বক্তব্য সেবে দিতাম অনেকটা ঠাণ্ডা ইয়ার্কি করে। আমার ধারণা, বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত যা লেখা হয়েছে তা নিয়ে অঞ্জীলতার প্রসঙ্গই ওঠে না। 'বিবর' 'প্রজাপতি'-কে অঞ্জীল বলা হলে ট্রিপিক অফ ক্যানসার'-কে কী আখ্যা দেওয়া হবে? কিন্তু এইসব আলোচনা-সভা এক এক সময় বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠত, রাজনীতিক্রিয়ত্বে একটা চরমপন্থী হাওয়া বইছে, বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী দু' দিকের রাজনীতিই চলে যাচ্ছে চরমপন্থার দিকে। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, সাহিত্য-সংস্কৃতির সামৰিশতার ব্যাপারে দু' পক্ষই একমত। সমরেশ বসুকে কেউ কেউ শারীরিক আক্রমণেরও ভয় দেখিয়েছিল, কিন্তু তিনি অকুতোভয়, তিনি আবার লিখলেন স্বীকারযোগ্য, পাতক।

সেই সভাসমিতি থেকে বেরিয়ে কোথাও কোথাও আমরা বসতাম একসঙ্গে। তাঁর চেনাশোর পরিধি অনেক বড় হলেও তিনি আকৃষ্ট হলেন আমাদের আড়ায়। মাঝে মাঝেই চলে আসতেন। একদিন তিনি আমাকে বলেছিলেন, আপনাদের আড়ায় পরনিষ্ঠা-পরচর্চা বিশেষ হয় না, এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার! আমাদের আড়ায় রাজনৈতিক ভেদাভেদও ছিল না, বড় কাগজের লেখক আর ছোট কাগজের লেখক বলে কোনও তফাত ছিল না, আমি নিজেই তখনও প্রধানত ছোট কাগজেরই লেখক এবং একটি ছোট পত্রিকার সম্পাদক। রাত্রের দিকে আমরা দল মিলে তাঁকে পৌছে দিতাম শিয়ালদা স্টেশনে, তিনি লাস্ট ট্রেনে নৈহাটি ফিরতেন।

কিছুদিন পর তিনি বালিগঞ্জ স্টেশন রোডে ছোট একটি ফ্ল্যাট নিলেন, সেটাই হল কলকাতায় তাঁর প্রথম আস্তানা। দ্বিতীয়া পত্নী ধরিত্রী অর্থাৎ টুনিকে নিয়ে তাঁর ছোট সংসার। সেই প্রথম দেখি একজন বড় মাপের লেখকের দৈনন্দিন সাহিত্যচর্চা। প্রত্যেকদিন সকালবেলা নিয়ম করে লিখতে বসতেন, দুপুরে প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও খালি গায়ে বসে লিখে যাচ্ছেন, কোনও কোনও দিন আড়ার বোঁকে দুপুরের দিকে চলে গেছি তাঁর ওখানে, তিনি খানিকটা অপ্রস্তুতভাবে হেসে বলতেন, এখন যে তাই

লিখছি! অর্থাৎ স্পষ্ট চলে যাবার ইঙ্গিত! লেখাটা যেন তাঁর প্রতিদিনের সাধনা। যাঁরা অফিসে কাজ করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে কাজে ফাঁকি দেন, কারণ কাজটা তাঁদের নিষ্পত্তি নয়। অন্য একজনও সে-কাজ করে দিতে পারে, কিন্তু লেখক-শিল্পী-বৈজ্ঞানিকদের কাজে ফাঁকি দেবার উপায় নেই।

অনেকের ধারণা, সাহিত্য রচনা বুঝি একটা প্রেরণার ব্যাপার। যখন তখন লিখতে বসলেই কি লেখা হয়? লেখা যখন মাথায় আসবে তখনই তো লিখতে বসা হবে। কিন্তু প্রেরণা জিনিসটা ভূতের মতন যখন তখন মাথায় এসে ভর করে না। সাদা পৃষ্ঠার সামনে বসে তার নিঃশব্দ বন্দনা করতে হয়। লেখকের কাছে যে-কোনও রচনার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ হল প্রথম লাইনটা। কখনও কখনও পথ চলতে চলতে বিদ্যুৎ ঝালকের মতো সেই লাইনটা মাথায় আসতে পারে বটে, আবার অনেক সময় হারিয়েও যায়। সাদা পৃষ্ঠাই সেই লাইনটি খুঁজে পাবার প্রধানতম প্রেরণা। সেই জন্যই, প্রতিদিনই লিখতে না পারলেও বড় লেখকরা নিয়মিত লেখার টেবিলে বসেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ লিখতে বসতেন প্রত্যেকদিন ভোরবেলা। সমরেশ বসুকেই ঢোকাই সামনে সেরকম একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখেছি।

তিনি ঠিকই করে ফেলেছিলেন যে, সাহিত্যকেই সম্বল করে কাটিয়ে দেবেন সারা জীবন। কোনও চাকরি বাকরিতে সময় নষ্ট করবেন না। এই সিদ্ধান্ত সঠিক এবং দুঃসাহসিক। গান বাজনা, ছবি আঁকা, সাহিত্যচৰ্চা এগুলি চরিষ্ণ ঘটাই কাজ, একজন শিল্পীর পক্ষে চুপ করে বসে থাকা স্বাক্ষর আপাত আলস্যও খুব প্রয়োজনীয়, কিংবা ভ্রম কিংবা অন্য কোনও শর্খের চর্চা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিছক শিল্প সাহিত্যের জন্য নিবেদিত হলে এদেশে জীবিকা অর্জন করা যায় না। চিত্রকরকে নিযুক্ত হতে হয় ওযুধ কোম্পানিতে করিকে সংবাদপত্র অফিসে কলম ক্ষইয়ে দিতে হয়, দেবৰত বিশ্বাসের মতন গায়ককে আমি দেখেছি ইলিসওরেল কোম্পানির অফিসে হিসেবপত্রের দেখাশুনোর চাকরিতে। পুরোপুরি সাংসারিক দায়িত্ব নিয়েও শুধু বাংলা লিখে জীবন্যাপনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন এক সময়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের ঢোকে দেখা সময়ে সমরেশ বসু। আমাদের সঙ্গে যখন পরিচয়, তখনও সমরেশ দারিদ্র্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছেন। সেইজন্য তাঁকে লিখতে হয়েছে প্রচুর, স্বনামে এবং কালকৃট নামে ছাড়াও ভ্রম ছস্থানামেও তিনি লিখেছেন, সব লেখাই যে উৎকৃষ্ট হয়েছে তা বলা যায় না, এত লিখলে তা সম্ভবও নয়। আমাদের দেশে সমালোচকরা এমনই অভূত, একজন লেখকের দশটা লেখার মধ্যে যদি চারটি খুব ভাল হয়, তিনটি মাঝারি আর তিনটি নিরেস, তা হলে সমালোচকরা প্রথম চারটি উপেক্ষা করে শেষের তিনটি নিয়েই হঞ্জোড় করেন। সমরেশ এইসব সমালোচকদের কখনও গ্রাহ্য করেননি। তার চেয়েও বড় কথা, সারা বছর যাঁকে এত লিখতে হয়, সেই লেখকও প্রত্যেক বছরই বিষয়বস্তু ও আঙিকে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কিছু লেখার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছেন এবং সার্থক হয়েছেন।

জীবন্যাপনের জন্য এত বেশি লিখতে হলেও তিনি কখনও দাঁতে দাঁত চেপে লেখেননি। তাঁর কমিটমেন্ট ছিল নিজের কাছে, মহাকালের দিকে তিনি অবহেলার

সঙ্গে টুসকি মেরেছেন। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করার পরে সঙ্কেবেলা তিনি অন্য মানুষ। আমি যতদূর জানি, পারতপক্ষে তিনি সঙ্গের পর কলম ধরতেন না। শুনেছি সম্পূর্ণ মহাভারতের বঙ্গনুবাদক এবং টীকাকার হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মশাইও সূর্যাস্তের পর মানুষের মেধাও ঢলে পড়ে মনে করে সঙ্গের পর কিছু লিখতেন না। নৈহাটির কায়স্থ উপন্যাসিকটিও এইদিক থেকে ছিলেন প্রাচীন ব্রাহ্মণদের অনুসারী। সঙ্গের পর সমরেশ বসু ছিলেন অন্য মানুষ। সেজেগুজে বেরতেন, বঙ্গদের সঙ্গে আজ্ঞা দেবার জন্য তাঁর প্রাণ আনচান করত, আজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা, তর্কাতর্কি, গান, কখনও কখনও নাচও। টপ্পা অঙ্গের পুরনো বাংলা গান ও রবীন্দ্রসংগীতে তিনি পারঙ্গম ছিলেন, খুব ফুর্তি হলে দু'একটা লৌকিকন্ত্রেও মেতে উঠতেন। কোনও সন্ধ্যায় উনি চৃপ্চাপ বাড়ি বসে থাকলে উঁর স্ত্রী টুনি ভয় পেয়ে যেতেন। তা হলে কি মানুষটার অসুখ বিসুখ হল নাকি?

বাংলাদেশ যুদ্ধের বছরে আমরা সবাই উদ্বৃত্তিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলাম। সেই যুদ্ধের শেষের দিকে আমরা উন্নেজনার আতিশয়ে সংবাদপত্র অফিসে রাত্রি ভোর করেছি। সংবাদপত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও সমরেশ বসুও আসতেন, তাঁর জন্ম পূর্ববাংলা, শৈশব কেটেছে ঢাকা শহরে, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে তিনি দারুণ আগ্রহী ছিলেন। তারপর আমরা সদমবলে গোল্প স্বাধীন বাংলাদেশে, সেখানে পেয়েছি সমরেশ বসুর প্রবল ঘোবনাটা সামিধ্য। তখন বাংলা সাহিত্যে কোনও রাজা-বাদশা নেই। সমরেশ বসুকেই অনে হত যুবরাজ। দু' দিকের বাংলা সাহিত্য অনুরাগীদের তিনি পরম প্রিয় ছিলেন ‘কোথায় পাবো তারে’, লিখতেন, তিনিই লিখছেন ‘গঙ্গা’; ‘মানুষ রতন’ কিংবা ‘পাড়ি’-এর মতন গল্প তিনি অবহেলায় লিখে ফেলতেন একদিনে।

এর কয়েক বছর পর, আমরা যখন কবিতার ‘কৃষ্ণিবাস’ পত্রিকাটিকে সব-মেলানো মাসিক কবিতা-গদ্যের পত্রিকার রূপ দেবার চেষ্টা করছি, তখন তিনি নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন, আমি এই কাগজে ধারাবাহিক উপন্যাস লিখব। আমাদের সেই অব্যবসায়িক পত্রিকায় টাকা পয়সা দেবার কোনও প্রশ্ন ছিল না। আর সেই সময়ে সমরেশ বসু প্রত্যেক জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকায় অতি আরাধনীয় লেখক, অনেকেই তাঁর লেখা সাধ্যসাধনা করেও পায় না, তবু তিনি কৃষ্ণিবাসে নিজের থেকেই লিখতে চেয়েছিলেন এবং যথাসময়ে ইলস্টলমেট দিতেন।

এই রকম একটা সময়েই তাঁর প্রথম হৃদরোগ হয়। এমন কিছু শুরুতর আঘাত নয়, তবু কোনও অতি সাধারণী চিকিৎসক তাঁকে বলেছিলেন যে, তাঁর পক্ষে সিডি ভাঙ্গা একেবারেই উচিত নয়। কোনও একতলা বাড়িতে তাঁর থাকা দরকার। ততদিনে তাঁর কলকাতার সংসার বালিগঞ্জ স্টেশন রোডের আ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে উঠে এসেছিল সার্কাস রেঞ্জের দোতলা ফ্ল্যাটে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর তাঁকে সেই দোতলা ফ্ল্যাটে ফিরে যেতে হবে; এ ব্যাপারে চিকিৎসকদের বোধহয় আপন্তি ছিল। কিন্তু তঙ্কুনি একতলার ঘর পাওয়া যাবে কোথায়? কৃষ্ণিবাস পত্রিকা ও আমাদের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী কল্যাণ চৌধুরী তখন যোধপুর পার্কে নতুন বাড়ি বানিয়েছেন,

বাড়িটা ফাঁকা, ব্যাপারটা শুনে তিনি তৎক্ষণাত রাজি হলেন, তাঁর সেই বাড়ির একতলার একটি ঘরে সমরেশদাকে রাখা হল। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের যুবরাজ অসুস্থ সেজে সেরকম একটা ফাঁকা বাড়ির একতলার ঘরে থাকতে রাজি হবেন কেন? দু' চারদিনের মধ্যেই তিনি ফিরে গেলেন পার্ক সার্কাসে তাঁর নিজের লেখার টেবিলে।

যাঁর হৃদয় ছড়িয়ে আছে গোটা বাংলা দেশে তথা সারা পৃথিবীতে, তিনি সামান্য হৃদরোগে কাতর হবেন কেন? এরকমই সবাই ভেবেছিল। অচিরেই দেখা গেল, সমরেশ রোগের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অগ্রহ্য করেছেন। তাঁর লেখায় সামান্য মালিন্যও দেখা গেল না। জীবনযাপনে উদ্বামতা কিছুমাত্র কমল না। শুধু সিগারেট ছেড়ে দেবার প্রচেষ্টায় তিনি প্রথম প্রথম আন্ত সিগারেট দু' টুকরো করে খেতেন, তারপর বিড়ি ধরলেন, তারপর তাও ছেড়ে অন্যের জুলান্ত সিগারেট থেকে এক-দু' টান দিতেন। দার্জিলিঙ্গে আরেকবার অসুস্থ হয়ে পড়ার পর তিনি ধূমপান একেবারেই ত্যাগ করেন। এইসব সময়েই তিনি লিখে যাচ্ছেন ‘শিকল ছেড়া হাতের খোঁজে’, ‘মহাকাশের রথের ঘোড়া’ ও ‘টানা-পোড়েন’-এর মতন উপন্যাস।

আশির দশকের গোড়ার দিকে আমরা বুধসন্ধ্যা নামে একটি ঝাবের প্রস্তুত করি। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আজ্ঞা, হাসিঠাটা, গল্প-কবিতা পাঠ, পানাহার, প্রকাশ্যে পরচর্চা এবং সামান্য কিছু সামাজিক দায়িত্ব পালন। আমরা নাটক অভিনয়ের চ্যারিটি শো করে কোনও কোনও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। এই সংস্থার সভাপতি সাগরময় ঘোষ, সহ-সভাপতি সুবিনয় রায় এবং সমরেশ বসু সাগ্রহে হলেন কার্যকরী সম্মিতির সদস্য। আমাদের প্রথম নাটক রবীন্দ্রনাথের ‘মুকুধারা’। নাটকের অভিনয়ের চেয়েও দীর্ঘকালীন মহড়া অনেক বেশি উপভোগ্য, আমরা মহড়াই দিয়েছিলাম প্রায় এক বছর ধরে, সমরেশ নিয়েছিলেন মন্ত্রীর ভূমিকা, নিজের গরজে নিয়মিত আসতেন, বড় সুন্দর কেটেছিল সেই মহড়ার দিনগুলি। যাই হোক, শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রসদনে দু' রাত্তির অভিনয় হয়েছিল সেই নাটকের। প্রথম রাত্তির অভিনয়ে সাগরময় ঘোষ যখন মঞ্চে সংলাপ বলছেন সেই সময় অস্তরাল থেকে অত্যুৎসাহী একজন নির্ধারিত সময়ের আগেই আগুন! আগুন! বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল, সাগরময় ঘোষ তা শুনে সংলাপ বানিয়ে দিলেন, এ কী, এ সময়ে তো আগুন লাগার কথা নয়, কী হল দেখি তো, বলে স্মার্টলি বেরিয়ে এলেন। নাটকের মূল চরিত্র ধনঞ্জয় বৈরাগীবেশী বুদ্ধিদেব গুহ চমৎকার গান গাইতে গাইতে হঠাৎ এক জ্বালায় থেমে গিয়ে মাথা চুলকোতে লাগলেন এবং মন্ত্রীবেশী সমরেশ বসু পার্ট ভুলে গিয়ে তিনপাতা ডিঙিয়ে সংলাপ বলে বিপদে ফেলে দিলেন তাঁর সহ-অভিনেতা জয়স্ত সেনকে। দ্বিতীয় রাতে এসব কিছুই হয়নি, সবই একেবারে নিখুঁত। কিন্তু যারা দু'বারের অনুষ্ঠানই দেখেছিলেন, তাঁদের মতে প্রথম রাতের সব কিছু মিলিয়েই অভিনয় হয়েছিল অনেক বেশি উপভোগ্য।

মঞ্চ-অভিনয়ের সহজাত গুণ ছিল সমরেশ বসুর। তাঁর প্রতিভা যে-কোনও দিকেই বিকশিত হতে পারত। বুধসন্ধ্যার পরবর্তী নাটকগুলিতেও তাঁর অংশ নেবার ইচ্ছে ছিল খুবই, কিন্তু তাঁর শরীর তাঁর মনোবলের সঙ্গে আর তাল দিতে পারছিল না।

আমরা যখন বুধসন্ধ্যার নাটক নিয়ে হইচই করছি, সেই সময়েই তিনি তৈরি হচ্ছেন শিল্পী রামকিশুর বেইজের জীবন নিয়ে একটা কিছু লেখার জন্য। প্রথমে ঠিক করেছিলেন জীবনী লিখবেন। রামকিশুর তখনও জীবিত, তাঁর সঙ্গে বারবার সাক্ষাৎকার হচ্ছে সমরেশ বসুর। রামকিশুরের জীবিতকালেই লেখাটি প্রকাশিত হবার কথা ছিল। কিন্তু তখন স্বয়ং লেখকেরই স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল নয়, সুতরাং তিনি বেশ খানিকটা না লিখে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের জন্য দেবার সাহস পাচ্ছিলেন না। তিনি লিখে চলেছেন, এরই মধ্যে রচনার নামকের আকস্মিক মৃত্যু। পি জি হাসপাতালের গেটে রামকিশুরের মৃতদেহ যখন বার করা হচ্ছে, তখন সমরেশ বসুকে যেন ভেঙে পড়তে দেখেছি। এ যেন শ্রষ্টা ও সৃষ্টির এক চিরস্মৃতি সম্পর্কের ট্যাজেডি। রামকিশুরের এরকম সকৌতুক প্রস্থানে সমরেশ যেন প্রচণ্ড অভিমান বোধ করেছিলেন।

তার পরেই ঠিক হয়, তিনি রামকিশুরের বস্ত্রনিষ্ঠ জীবনী রচনার বদলে তাঁর জীবনী অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করবেন।

‘দেশ’ পত্রিকায় ‘দেখি নাই ফিরে’ ছাপা হতে শুরু করে ‘৮৬ সাল থেকে, তারও বছর দু’-এক আগে তিনি ওই রচনার ছানানা ইনস্টলমেন্ট আমাকে পড়তে দেন। এটা তাঁর স্বত্ত্বাববিরুদ্ধ, তিনি সমরেশ বসু, প্রথম থেকেই তাঁর রচনা প্রেমে পাঠানো হয়, আমরা ছাপা হবার পর পড়ি। কিন্তু রামকিশুর নিয়ে লেখার সময় তিনি অসম্ভব খুতুবুতে হয়ে পড়েছিলেন, প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, এবং শারীরিক অনিষ্টয়তার কারণে প্রায়ই বলতেন, প্রত্যেক সপ্তাহে লিখে দেবার সাহস আর আমি করি না। আগে অনেকখানি লিখে নিষ্ঠিত চাই। নতুন বিষয় নিয়ে লিখেছেন বলেই হয়তো তিনি প্রথম কিছুটা অংশ আমাকে পড়িয়ে মতামত চেয়েছিলেন। তিনি শুরু করেছিলেন ক্লাসিকাল স্টাইলে। একেবারে রামকিশুর বেইজের অস্বৃত্তাস্ত থেকে। আমি আশা করেছিলাম, এই রচনা শুরু হবে রামকিশুরের যৌক্তন থেকে, যখন তাঁর শিল্প-জীবনের শুরু। যখন থেকে তাঁর প্রতি আমাদের আগ্রহ জাগে। এর আগের অংশ নিষ্ঠক তথ্যের খাতিরে কোনও এক জায়গায় ঝ্যাশব্যাকে বলে নিলেই হল।

নতুন দাঁত ওঠা শিশু যেমন সবকিছু কামড়াতে যায়, তেমনি হঠাতে কোনও ভাল বই পড়লে আমার কাছাকাছি সকলকে জানাতে ইচ্ছে করে। এরই মধ্যে আমি বিদেশ থেকে একটি বই নিয়ে আসি, যেটি অগুস্ত রদ্যোর জীবনী-উপন্যাস, নাম, ‘নেকেড কেম আই’। খুবই নাটকীয় ও শিল্প-সমষ্টিত সেই রচনা। একদিন আমার বাড়ির সাক্ষ আড়ায় আমি সাড়স্বরে সেই বইটির আলোচনা শুরু করি। তখনও রদ্যোর কিছু ব্রোঞ্জ কাস্টিং-এর প্রদর্শনী হয়নি কলকাতায়, অনেকেই রদ্যোর শিল্পকীর্তি এবং ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে খুব বেশি অবহিত নন। কিন্তু সমরেশ বসু যেহেতু ভারতের একজন প্রথম শ্রেণীর ভাস্কুলকে নিয়ে লিখেছেন, তিনি রদ্যো সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতেন নিষ্ঠিত, শুধু ওই জীবনী-উপন্যাসটি দেখেননি। তিনি বইখানি আমার কাছে ধার চেয়েছিলেন। তারপর ওই বই ও সমরেশ বসুর প্রস্তাবিত উপন্যাস নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়। অন্য অনেকের সঙ্গেই তিনি এই উপন্যাস নিয়ে আলোচনা

করেছেন এবং আরঙ্গের অংশটি বারবার নতুন করে লিখেছেন।

তিনি ব্যস্ত লেখক, ‘দেখি নাই ফিরে’-র প্রস্তুতিপর্ব এবং রচনার সময়েও তিনি অন্য অনেক উপন্যাস রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। আমাদের দেশে তো এমনটি হবার উপায় নেই যে একজন বড় লেখক শুধু একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী লেখা নিয়েই কয়েকটি বছর নিমগ্ন থাকবেন, তাঁকে আরও অনেক কিছু লিখতেই হবে। রামকিশোর বেইজকে নিয়ে সমরেশ বসু সেই কারণেই দেরি করে লিখতে শুরু করেছেন নিশ্চিত। সেইজন্যই এ-আফশোস কিছুতে যাবার নয় যে, যে উপন্যাসের মালমাশল। সংগ্রহের জন্য তিনি এত পরিশ্রম করলেন, রামকিশোরের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিতে তিনি ছুটে বেরিয়েছেন অসম-মণিপুর থেকে দিল্লি পর্যন্ত বারংবার, যে রচনাটি হতে পারত তাঁর ম্যাগনাম ওপাস, সেটি তিনি শেষ করে যেতে পারলেন না।

তাঁর সঙ্গে দার্জিলিং গিয়ে সকালবেলা প্রাতরাশের সঙ্গে তাঁকে ছসাত রকম ওষুধ খেতে দেখেছি একসঙ্গে। অত ওষুধ দেখে আমাদের ঢোথ ছানাবড়া হবার উপক্রম! তখন হৃদরোগের চেয়েও তাঁর শ্বাসকষ্টই প্রবল। শ্বাসকষ্টের জন্য যাঁকে অতগুলি ট্যাবলেট খেতে হয়, তাঁর পক্ষে তো পাহাড়ি ঠাণ্ডার জায়গায় যাওয়াই উচিত নয়। কিন্তু শরীরে অসুবিধা রইলেও তিনি অসুস্থ হয়ে থাকতে চাননি কিছুতেই। সব ব্যাপারেই তাঁর অদম্য উৎসাহ। সেবারের সেই দার্জিলিং-এর অনুষ্ঠানটির খানিকটা ঐতিহাসিক গুরুত্বও আছে। বছর তিনেক আগে দার্জিলিং শহরের দেড় শো বছর পৃতি উপলক্ষে একটি উৎসব হয়, কলকাতা থেকে একজিল সাহিত্যিক ও সংগীতশিল্পীকে আমন্ত্রণ জানান হয়। বাঙালি ও নেপালি লেখক-শিল্পীদের একসঙ্গে অনুষ্ঠান করার কথা। সেখানে গিয়ে দেখা গেল, দার্জিলিং-এর নেপালি লেখকদের একজনকেও আমরা চিনি না, তাঁরাও আমাদের কানুর সম্পর্কে কিছু জানেন বলে মনে হল না। একই পশ্চিমবাংলার মধ্যে থেকেও পরম্পরার মধ্যে এতখানি দূরত্ব! সেই অনুষ্ঠানে সমরেশ বসু নেপালি ভাষাকে অষ্টম তপসিলের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত বলে মত প্রকাশ করলেন, পরদিন দার্জিলিং-এর নেপালি ভাষার পত্রিকায় তাঁর সেই বক্তব্য শুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছিল। এত করেও অবশ্য নেপালিদের মন পাওয়া যায়নি, পরে শুনেছি, দার্জিলিং-এর উৎসবে বাঙালি লেখক-শিল্পীদের আহান করা হয়েছিল বলে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান হয়েছে, যদিও সুভাষ ঘিসিং-এর নাম তখন একবারও শোনা যায়নি। তারপর থেকে এ পর্যন্ত দার্জিলিং-এ বাঙালিদের আর কোনও প্রকাশ অনুষ্ঠান হতে পারেনি বোধহয়।

ষাট বছরে পা দিয়ে তিনি প্রথম বিদেশে যান, সোভিয়েত ইউনিয়নে, তাও মাত্র সাত দিনের জন্য, একটা বড় দলের সঙ্গে।’ ৮৬ সালে যান ইউরোপ। পশ্চিম জার্মানি, পূর্ব বার্লিন, পূর্ব বার্লিন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ডে আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। আমার গোপনে খুব কষ্ট হত, তাঁর মনের জ্ঞান ও শারীরিক অক্ষমতার দ্রুত দেখে। তাঁর উৎসাহ প্রচুর, সবকিছুই তিনি ঘুরে ঘুরে দেখতে চান, কিন্তু একটু হাঁটাহাঁটি করলেই তাঁর হাঁপ ধরে, একটু ঠাণ্ডা লাগলেই শ্বাসকষ্ট বাড়ে। ইওরোপের শহরগুলিতে ঠাণ্ডাও এড়ানো

যায় না। না হেঁটেও কিছু দেখা যায় না। যজ্ঞগার রেখা ফুটে উঠত তাঁর দুই ভূম্র
মাঝখালে, এক এক সময়ে ধমকে দাঁড়িয়ে তিনি শান্ত গলায় বলতেন, আবার আসতে
হবে, শরীরটা একটু সারিয়ে নিই, রামকিষ্ণরের ওপর সেখাটা শেব করে নিই, তারপর
আবার আসব, সব ভাল করে দেখতে হবে।

শেষ পর্যন্ত তিনি ছিলেন আশাবাদী, সম্বত শেষ নিষ্ঠাস ফেঙ্গার আগের মুহূর্তেও
তিনি মৃত্যুকে বিশ্বাস করতে পারেননি।

সমরেশ ছিলেন আসক্ত, রসিক, আবার উদাসীন, সন্ধ্যাসীও

বেশ রাতের দিকে আমরা কয়েকজন তাঁকে শিয়ালদা স্টেশনে পৌছে দিয়ে আসতে গেছি, তখন লাস্ট ট্রেন সদ্য ছেড়ে দিয়েছে। সমরেশ বসু একটা ছুট লাগালেন, প্ল্যাটফর্ম দিয়ে। তারপর ট্রেনটার সমান্তরালভাবে ছুটতে ছুটতে লাফিয়ে একটা কামরায় উঠে পড়ার আগে একবার আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, কাল দেখা হবে।

এই দৃশ্যটাই মনে পড়ছে বারবার। সুপুরুষ। যৌবনবন্ত, তেজস্বী একজন লেখক, যিনি প্রায় প্রতিদিনই মফস্বল থেকে কলকাতা জয় করতে আসেন। তখন থাকতেন নেহাটিতে। কলকাতায় তাঁকে দেখা যেত কলেজ স্ট্রিটে, কোনও কোর্নও পত্র-পত্রিকার দফতরে, বিভিন্ন আজ্ঞায়। পোশাকের শৌখিনতা ছিল তাঁর, ধূতি-পাঞ্চাবি যখন পরতেন, তখন ধূতিটি কেঁচানো, পাঞ্চাবিটি গিলে করা, প্যান্ট-শার্ট বা সুট যখন পরতেন, তখন তাও নির্খুত, বিশিষ্ট। তবে যে কোনও ভিড়ের মধ্যে তাঁকে যে আলাদাভাবে ঢোকে পড়ত, তার কারণ তাঁর সুন্দর চেহারা বা পোশাকের চাকচিক্য নয়, তাঁর মুখের হাসিটি। আদাব, উরাতিয়া, অঙ্গুল বসন্ত, পাড়ির মতন গল্প তিনি লিখে চলেছেন অনায়াসে। বি টি রোডের খুরে, শ্রীমতী কাফে'র মতন উপন্যাস, ধারালো ঝকঝকে ভাষা, গভীর জীবনবৈশিষ্ট্য, কিন্তু তাঁর ব্যবহার দেখলে মনেই হয় না, সাহিত্য রচনার জন্য দাঁতে দাঁত কামড়ে তাঁকে কোনওরকম সাধনা করতে হয়। তাঁর জীবনযাত্রার মতন সব কিছুই সারঙ্গীল। যদিও আমরা জানতাম, অল্প বয়েসে তাঁকে প্রচুর কষ্ট করতে হয়েছে, এমনকী বস্তিতেও থাকতে হয়েছে এক সময়। ছেটখাটো কাজ করে জীবিকা উপার্জন করেছেন কোনওক্রমে। কিন্তু আমাদের কাছে সেই সব গল্প বলতেন হাসতে হাসতে, যেন সব কিছুই মজার ব্যাপার।

অন্যান্য রচনার মধ্যে হঠাৎ ‘গঙ্গা’ উপন্যাসটি লিখে সাড়া জাগিয়ে দিলেন তিনি। সম্পূর্ণ অন্য স্বাদের লেখা। আমরা শুনেছিলুম, তাঁকে একটি ঘরে বক্ষ করে রেখে সাতদিনের মধ্যে লেখানো হয়েছিল। এটা সত্যি কি মিথ্যে তা জানি না। কিন্তু সমরেশ বসুর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। এই ব্যাপারে ডস্টয়েভস্কির সঙ্গে তাঁর তুলনা দেওয়া যায়, খড়ের গতিতে কোনও লেখা শেষ করছেন। সেই লেখাই কালোক্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রচণ্ড বোমাটি ফাটান ‘বিবর’ উপন্যাস লিখে। বাংলা ভাষায় আর কোনও বই নিয়ে এত উদ্দেজনা, বিতর্ক, পাড়ায় পাড়ায় মিটিং, মামলা-মোকদ্দমা হয়নি। বিবর-প্রজাপতি পাতক-স্বীকারোক্তি, এই চারখনা উপন্যাসে ঝলসে উঠলেন যেন আর একজন সমরেশ বসু। এও যেন ডস্টয়েভস্কির ‘লাঞ্ছিত ও আহত’ যৌবনকে প্রতিশোধ নেবার জন্য ফিরে দাঁড়াতে উদ্বৃক্ষ করার

প্রয়াস। এই উপন্যাস চতুর্ষিমের সমসাময়িক সামাজিক সত্ত্ব চিরাশের দিকে অনেকেই দৃষ্টি দেয়নি। খামোখা অশ্লীলতার অকিঞ্চিত্কর অভিযোগ তুলে হইচই করেছিলেন। কিন্তু এ সবের মধ্যে অশ্লীলতা কোথায়? বাংলায় ও সব কেউ লেখে না। ‘বিবর’ উপন্যাসের কাহিনী আমাকে তেমন আকৃষ্ট করেনি, আমি মুঢ় হয়েছিলুম এর ভাষা-ব্যবহারে। যে উপন্যাসিক সূক্ষ্মভাবে ভাষা নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে না ধান, তিনি একথেয়ে হয়ে যেতে বাধ্য। গ্রাম ও মফস্বল নিয়েই প্রধানত লেখেন যে সমরেশ বসু, তিনি নাগরিক জীবনের হতাশা নিয়ে লিখতে গিয়ে প্রয়োগ করলেন সম্পূর্ণ অন্য ভাষা।

অবশ্য একই কলমে একেবারে আলাদা রকমের ভাষার খেলা তিনি আগেই দেখিয়েছেন কালকুট নামের অনবদ্য লেখাগুলিতে। না জানলে বিশ্বাসই করা শক্ত যে ‘অমৃত কুণ্ডের সঙ্ঘানে’ ও ‘বি টি রোডের ধারে’র লেখক একই ব্যক্তি। কালকুট যেন সংসারে এক সন্ধ্যাসী। যখন তখন ভাষ্যমাণ। সমরেশ বসু তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক এবং আসক্ত, কালকুট রসে-বশে রসিক, উদাসীন। ‘কোথায় পাবো তারে’ নামের সুদীর্ঘ রচনাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার সময়, তিনি এক একটা গ্রাম্য আখড়ার কথা লিখছেন আর আমরা বঙ্গুরা দল বেঁধে সে জায়গাটা দেখতে গেছি। কোনও কোনও জায়গায় তাঁর বর্ণনার সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতা পুরোপুরি মেঝেনি। ফিরে এসে তা নিয়ে অনুযোগ করলে তিনি বাইলদের ধরনের ঝুঁস্যাময় হাসি দিয়ে বলেছিলেন, ঠিক সময়টাতে যাওনি গো বাবু; চোখের দেখা আর মনের দেখা মিলাতে হয় গো! কথাটি ঠিক, নদীর মতন, আকাশের মতন, মানবের মতন, এক একটা বিশেষ স্থানও সব সময় একরকম থাকে না।

লাস্ট ট্রেনের সঙ্গে পাছ্বা দিয়ে ছুটতে ছুটতে একবার মুখ ফিরিয়ে বললেন, কাল দেখা হবে। এই ছবিটাই আবার ফিরে আসছে। একটু একটু করে বয়েস বেড়েছে বটে, কিন্তু মানুষটি যৌবনেরই প্রতিমূর্তি। বছর দশ-এগারো আগে তিনি প্রথম অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু কাটিয়ে উঠলেন সহজেই। যেন অসুখ বিসুখ তো হবেই। তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকারটা কী? লেখায় সামান্য ভাটা পড়েনি। সার্কাস রেঞ্জের ঝ্যাটটা তিনি রেখে দিয়েছিলেন শুধু লেখার জন্য। প্রত্যেকদিন সকালবেলা চলে যেতেন সেখানে। দুপুরের খাবার আসত বাড়ি থেকে। একা বসে বসে তিনি লিখে যাচ্ছেন। প্রায়ই গর্ব করে তিনি বলতেন, ‘আমি প্রত্যেকদিন নটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত লিখি। লেখাটাই আমার কাজ। তিনি সাহেব-বেঁদা ছিলেন না। বিদেশেও বেশি যাননি, কিন্তু এই কথাটা অবিকল সার্থক সাহেব লেখকদের মতন। আমাদের দেশে এখনও অনেকে সাহিত্য রচনাটা শৌখিনতা বলে ধরে নেয়। কিংবা পবিত্র কর্তব্য কিংবা আদর্শের বিলাসিতা। কিন্তু সমরেশ বসু ছিলেন পুরোপুরি লেখক। অল্প বয়েসে রাজনীতি করেছেন, জেল খেটেছেন, কিন্তু একবার সাহিত্য জীবনে চুকে পড়ার পর তিনি সাহিত্য ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামাননি। অন্য কোনও জীবিকাও গ্রহণ করেননি। পরিণত বয়েসে একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক হয়তো কিছুটা সচ্ছলতার মুখ দেখেন, কিন্তু প্রথম দু'তিনটে দশক শুধু বাংলা ভাষায় লিখে সংসার চালানোর চেষ্টা

যে কী দুঃসাধ্য এবং দুঃসাহসের কাজ, তা কে না জানে! এবং তাঁর সংসারটিও
নেহাত ছোট ছিল না।

প্রথমবার হৃদ্রোগের পর তিনি লেখা তো থামানই নি, বরং 'মহাকালের রথের
ঘোড়া' কিংবা 'শিকল ছেঁড়া হাতের খৌঁজে'র মতন বলিষ্ঠ লেখায় হাত দিয়েছেন।
মনের জোরে তিনি কাটিয়ে উঠেছেন শারীরিক বাধা। মনে পড়ে, বছর দেড়েক আগে
আমরা একসঙ্গে গিয়েছিলাম জার্মানিতে। পশ্চিম বার্লিন থেকে দেওয়াল পেরিয়ে
আমরা এসেছি পূর্ব বার্লিনে, সেখানকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি হঁটে হঁটেই দেখতে হয়।
আমাদের পক্ষে গাড়ি জোগাড় করার কোনও উপায় ছিল না। সমরেশ বসুর তখন
ঠাণ্ডা সহ্য হচ্ছে না। শরীরটা বেশ দুর্বল, তবু সব কিছু দেখার জন্য তাঁর অদ্যম
উৎসাহ। রাস্তার ধারের বেঞ্চে একটুখানি বসে জিরিয়ে নিজেন, তারপরই বলেছেন,
চলো চলো, আরও অনেক কিছু বাকি।

রামকিশুরের জীবনী নিয়ে কী পরিশ্রম যে করেছেন, তা তো পাঁচ সাত বছর ধরেই
দেখছি। কোনও তথ্যই বাদ দিতে চান না। রামকিশুরের সমসাময়িক যাঁরা বেঁচে
আছেন, তাঁদের কাছ থেকে মালমশলা সংগ্রহ করার জন্য তিনি শুধু শান্তিনিকেতন
নয়, অসম, দিল্লি, বোম্বাই, বরোদায় কতবার যে ছুটেছেন তার ঠিক নেই। জগদ্দল,
যুগ যুগ জীয়ে, ত্রিখারার মতন বৃহদাকার উপন্যাস তিনি আগেও লিখেছেন বটে, কিন্তু
'দেখি নাই ফিরে' হবে তাঁর ম্যাগনাম ওপাস, তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তো বটেই,
বাংলা সাহিত্যেরও একটি দিকদর্শক গ্রন্থ, এরিয়ে আমরা নিশ্চিত ছিলাম।

ভাস্কর রামকিশুরকে বিষয় হিসেবে নেহে নেবার অনেক কারণ ছিল তো বটেই,
তবে প্রধান কারণ বোধহয় ছবি সম্পর্কে তাঁর দুর্বর্লতা। তিনি নিজেও যে ছবি
আঁকতেন, তা বোধহয় অনেকেরই জানা নেই। তাঁর আঁকা গৌরী বসুর ছবি আমি
দেখেছি। তিনি গানও গাইতেন চমৎকার। বিশেষত টপ্পা অঙ্গের প্রাচীন বাংলা গান
তাঁর গলায় শুনেছি অনেকবার। অভিনয় ক্ষমতা এবং অভিনয়ে উৎসাহ ছিল প্রচুর।
আমাদের ঝাব বুধসন্ধ্যার তিনি শুধু সভাপতি ছিলেন না, অভিনয়ের মহড়া দিয়েছেন
নিয়মিত। মুক্তধারায় তিনি মন্ত্রীর অভিনয় করেছেন দু'বার রবীন্দ্রসদনে। একবার
অবশ্য একটু পার্ট ভুলে গিয়ে মাথা চুলকেছিলেন। পরের বার সেই পার্ট নির্খুতভাবে
মুখস্থ করেছেন মনোযোগী ছাত্রের মতন। 'প্রাণের প্রহরী' নাটকে এক ডাঙ্গারের
ভূমিকা নেবার কথা ছিল তাঁর। নির্ধারিত অভিনয়ের আগে তিনি আর একবার অসুস্থ
হন। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সেই ভূমিকায় অভিনয় করেন। তিনি তাতে বেশ ক্ষুক
হয়েছিলেন। প্রায়ই বলতেন, আবার ওই নাটকটা স্টেজে করো। ওই ডঃ দেবের
ভূমিকা নীরেন্দ্রার বদলে আমিই করব। সেই নাটকের এক জায়গায় ডঃ দেবের
একবার চড় মারার কথা আমাকে। সমরেশ বসু বলতেন, দাঁড়াও না, স্টেজে ওই সময়
সুনীলকে আমি এমন একখানা চড় কষাবো।

সমরেশ বসু আমার কাছে কি শুধু একালের প্রধান লেখক? তিনি আমার
গুরু-বন্ধু-দাদা সব মিলিয়ে অনেক কিছু। যখন তখন তাঁর বাড়িতে গেছি। টুনির
হাতের রান্না খেয়েছি। উনিও আমার বাড়িতে হঠাত হঠাত এসে উপস্থিত হয়েছেন

আজ্জা দিতে। তাঁর উপস্থিতিতে যে-কোনও পরিবেশে সব সময় প্রাণচক্ষল হয়ে উঠত। আমরা তো প্রকৃতপক্ষে এক পরিবারেরই মানুষ। সেই সমরেশ্বরা এখন নার্সিংহোমে অয়ে আছেন নিশ্চাস বজ করে। আঢ়ীয়-বজু-পরিজনেরা জমায়েত হয়েছে সেখানে। আর আমি খসখস করে লিখে যাচ্ছি? তাও 'দিলেন', 'লিখতেন', 'বলতেন', এইসব অভীত ক্রিয়াগদ দিয়ে। সংবাদপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত ধাকলে মানুষ কি এরকম দ্রুদয়ইন হয়ে যায়?

শক্তির সঙ্গে একটি দিন

সকাল সাড়ে দশটা আন্দাজ কেউ আমার নাম ধরে ডাকল। শাস্তিনিকেতনের বাড়িতে আমি তখন কাগজ-কলম খুলে বসেছি, দোতলার ঘরে। কেউ দেখা করতে এলে একতলা থেকে ডাকে কিংবা খবর পাঠায়, এই ডাক দ্বিতীয়বার শুনেই চিনতে পেরেছি শক্তির কঠস্বর, সে সরাসরি ওপরে উঠে আসছে। ঘরে চুকে শক্তি বলল, একী, আজই লেখাপড়া শুরু করে দিয়েছ?

কলম বন্ধ করতে করতে আমি বললাম, কী করি বলো, যাবজ্জীবন দণ্ডিত আসামির মতন অবস্থা যে!

শুভ্রবার ছিল দোল-উৎসব, শনিবারেও অনেক অতিথি ও বন্ধুসমাগম ছিল, লেখাপড়া করার সময় পাইনি, কিন্তু আমার ধারাবাহিক উপন্যাসের কিন্তি লেখার চাপ, নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে একটি পরিচ্ছেদ জমা দিতে হবেই, সুতরাং যদিও রবিবার আমার না-লেখার দিন, তবু জোর করেই নিজেকে বসাতে হয়েছিল লেখার টেবিলে।

শক্তি এসে পড়লে আর লেখালেখির কোনও প্রশ্নই উঠে না।

শক্তি বলল, চলো চলো, উঠে পড়ো, আজ তোমার এখানে কেউ নেই দেখছি, নিরিবিলিতে পাওয়া গেছে, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, কাজের কথা।

আমাদের এখানে সপুত্র মুনমুন-সৌমিত্রি মিত্র অতিথি ছিল, তারা কলকাতায় ফিরে গেছে গতকাল। প্রতিবেশী গীতা-পাঞ্চাসারথি চৌধুরীরাও চলে গেছে ভোরবেলা। বসন্ত উৎসবে যোগ দিতে যারা এসেছিল, তারা অনেকেই ফিরেছে। আজ সকালে আমার বাড়িতে কেউ আসেনি, কাক্ষের আসার কথাও নয়।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শক্তি বলল, কাল সঞ্চেবেলা বাড়ি ছিলে? কাল খুব তোমার এখানে আসার ইচ্ছে ছিল, শর্বরীর বাড়িতে একটা গানের অনুষ্ঠান ছিল। সেখান থেকে টুক করে চলে আসব ভেবেছিলাম, কিন্তু গান অনেকক্ষণ চলল, এত দেরি হয়ে গেল, মীনাঙ্কী আসতে চাইল না। আজ ভোরবেলা মীনাঙ্কী ফিরে গেল কলকাতায়, তারপর দু' চারটে ছেলেমেয়ে এসেছিল কথা বলতে, এক সময় ওদের থামিয়ে আমি একটা সাইকেল রিকশা নিয়ে—

একতলার বারান্দাটাই আড়ায় পক্ষে প্রশংস্ত। কিছু সবুজ, গাছগাছালি দেখা যায়। ডানপাশটায় দিগন্ত পর্যন্ত উদ্ধৃত, একটা ছোট পুকুরে হাঁসেরা প্যাঁক প্যাঁক করছে, শীত চলে গেলেও হৃহৃ বাতাসে তেমন আঁচ নেই। পাশাপাশি দুটি বেতের চেয়ারে বসা গেল। শক্তি একটা নিস্য রঙের পাঞ্জাবি পরে এসেছে, আমার গায়ে শুধু গোঁজি।

শক্তি বেশ উৎফুল্লভাবে বলল, এত নিরিবিলিতে তোমাকে আর স্বাতীকে পাব ভাবিইনি, এরকম তো পাওয়াই যায় না।

এই ক'দিনে শক্তির সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে, ইন্দ্রনাথের বইয়ের দোকানে, রাস্তায়, দোলের উৎসবে, কিন্তু ঠিক আড়া হয়নি। এর মধ্যে এক রাতে যোগেন চৌধুরী ও অন্য রাতে সুবোধ রায়ের বাড়িতে গান ও কবিতা পাঠের আসর জমেছিল, সেসব জায়গাতেও আমরা কাছাকাছি বসেছি বটে, কিন্তু ওসবের মধ্যে তো আড়া চলে না। তা ছাড়া ওই দু' রাতেই শক্তি মীনাক্ষীর সঙ্গে তাড়াতাড়ি গেস্ট হাউসে ফিরে গিয়েছিল।

শক্তি চেঁচিয়ে ডাকল, স্বাতী, ও স্বাতী, এখানে এসে বসো—

স্বাতী এসে বলল, চা খাবেন ?

শক্তি বলল, না, না, চা-টা নয়, সকালের সব চায়ের কোটা শেষ করে ফেলেছি।

স্বাতী বলল, অন্য কিছু কিন্তু দেওয়া হবে না। মীনাক্ষী চলে গেছে, এখন আমি আপনাকে শাসন করব।

শক্তি বলল, আরে না, না, তুমি বসো না ! আজ কাজের কথা বলতে এসেছি। সিরিয়াস কথা।

স্বাতী হেসে ফেলল। শক্তির মুখে কাজের কথায় কেউ তেমন গুরুত্ব দেয় না।

স্বাতী জিজ্ঞেস করল, আপনি তো এখানকার অধ্যাপক। কেমন লাগছে ?

শক্তি জোর দিয়ে বলল, ভাল লাগছে, খুবই ভাল লাগছে। ছেলেমেয়েরা এত ভাল। আমি এখানে বেশ ফুর্তিতে আছি।

আমি বললাম, শুনেছি, তুমি এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের কবিতা লেখা শেখাচ্ছ। আরও কিছু পড়াতে হচ্ছে নাকি ?

শক্তি বলল, থেঁ। আবার কী পড়াছ ? কবিতা পড়া, কবিতা নিয়ে দু' চারটে কথা বলা, এতেই বেশ জমে যায়। তাই বেশি কিছু না। আমি কি খুব সিরিয়াস হতে পারি নাকি ? হ্যাঁ, সিরিয়াস হচ্ছে শরৎ। সব প্লান প্রোগ্রাম ঠিক করে এসেছে, বইপন্থৰ, রোজ সকালে উঠেই কাজে বসে যায়। জানো স্বাতী, শরৎ আর আমি তো পাশাপাশি ঘরে থাকি, তুমি গিয়ে দেখে এসো, শরতের ঘর কেমন সূন্দর গুছনো, সব কিছু ঠিকঠাক, আর আমার ঘর, এলোমেলো, মীনাক্ষী অনেক চেষ্টা করেও গুছোতে পারেনি, কোথায় যে কী থাকে !

স্বাতী বলল, আমি এখানে আসার দিনই পূর্বপল্লী গেস্ট হাউসে আপনার আর শরৎবাবুর খোঁজ করতে গিয়েছিলাম। দু'জনেই ছিলেন না।

শক্তি বলল, হ্যাঁ শুনেছি, পরে খবর পেয়েছি।

আমার দিকে ফিরে বলল, শরৎ খুব বদলে গেছে !

আমি বললাম, আমরা সবাই তো বদলে গেছি। বদলাইনি ?

শক্তি বলল, একটু-আধটু, হ্যাঁ, তা তো হবেই। কিন্তু শরৎ যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। অনেক দূরে সরে গেছে।

আমি বললাম, এক একজন এক একদিকে বদলাবে। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

শক্তি বলল, শরৎ আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এক সময় কত আমোদ-আহুদ হয়েছে, কত জমিয়ে রাখত, ওকে এখনও, মাঝে মাঝে অস্তু, সেইভাবে পেতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু শরৎ এখন আজ্ঞা-হইচই-এর মধ্যে থাকেই না, এড়িয়ে যায়।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুমি কী কাজের কথা বলবে বলছিলে ?

শক্তি বলল, আরে স্বাতীটা আবার ছট করে কোথায় উঠে চলে গেল ? ও মেয়েটা এমন ছটফটে, কোথাও সুস্থির হয়ে বসতে পারে না। স্বাতী শুবে না ?

আমি বললাম, স্বাতী পরে শুবে।

শক্তি বলল, আমি ক'দিন ধরেই ভাবছি, 'কৃষ্ণিবাস' আবার বার করলে কেমন হয় ? বেশ বড় করে, দামামা-জয়টাক বাজিয়ে যদি 'কৃষ্ণিবাস' আবার বেরোয় ? শুধু কবিতার কাগজ। তুমি মাঝখানে যে পাঁচমিশেলি মাসিক কৃষ্ণিবাস করেছিলে, সেরকম না, আগেকার মতন। তুমি আর আমি দু'জনে সম্পাদক, আমি সব ব্যবস্থা করব।

আমি বললাম, 'কৃষ্ণিবাস' যদি আবার বেরোয়, ভালই তো হয়। তবে তুমি একা সম্পাদক হও, আমি না, আমার সম্পাদক হবার শখ মিটে গেছে, শক্তি। অনেক বছর তো—

শক্তি বলল, না, না, তোমাকেও থাকতে হবে। শক্তি-সুনীল, সুনীল-শক্তি ! আমাদের দু'জনের নাম একসঙ্গে থাকলে হাজার হাজার ছেলেমেয়েকে একসঙ্গে টানা যাবে। কবিতা নিয়ে আবার একটা উদ্বাধ নেতৃ শুরু করে দেব।

আমি বললাম, খেৎ, ওরকম যমজপনার ক্ষেমও দরকার নেই। তুমি একাই যথেষ্ট। তুমার কী লিখেছিল মনে আছে ?

শক্তি হা-হা করে হেসে উঠল।

অকাল-প্রয়াত কবি তুষার রায়, সেরল ও কল্পনা-নিবাসী, ধীমান ও উদাসীন, মৃত্যু-বিলাসী ও রসিকতা-প্রিয় তুষার ছিল আমাদের দু'জনেরই বিশেষ মেহভাজন। ছোটখাট্টো চেহারা, তুষারকে মনে হত আমাদের চেয়ে অন্তত বছর দশেকের ছেট, যদিও মৃত্যুর পর জানা গিয়েছিল তুষার ছিল ঠিক আমার সমবয়েসি। তুষার মুখে মুখে তাৎক্ষণিক ছড়া বানিয়ে মুক্ষ করত আমাদের। ময়দানের মুক্ত মেলায় এক পুলিশের প্রতি তুষারের সেই বিখ্যাত উক্তি, 'পুলিশ, কবিকে দেখে টুপিটা তুই খুলিস !'

শক্তি আর আমার কবিতা একসঙ্গে মিলিয়ে যখন 'যুগলবন্দী' নামে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়, তখন তুষার কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে বসে ছড়া বানিয়েছিল, 'সুনীল-শক্তি যুগলবন্দী/পয়সা লোটার নতুন ফন্ডি !' সে ছড়া শুনে আমরা দু'জনেই হেসেছিলাম খুব। সেই 'যুগলবন্দী'র জন্য আমরা দু' পাঁচ টাকাও পেয়েছিলাম কিনা সন্দেহ !

শক্তি বলল, ঠিক আছে, তুমি যদি আমার ওপর পুরো ভারটা দিতে চাও—

আমি বললাম, তুমি শরৎকে সঙ্গে নিতে পারো। আমি যখন বিদেশে ছিলাম, তখন শরৎ কিছুদিন 'কৃষ্ণিবাস' সম্পাদনা করেছে, তা ছাড়া প্রায় আগামোড়াই 'কৃষ্ণিবাস' পরিচালনার ব্যাপারে শরৎ অনেকখানি যুক্ত ছিল, ওর অনেক অভিজ্ঞতা আছে—

সিগারেট ধরাবার জন্য একটুখানি সময় নিয়ে শক্তি বলল, শরৎ বোধ হয় আমার

সঙ্গে মিলেমিশে কিছু করতে চাইবে না। বুঝলে না, ঠিক টেম্পোরামেন্টের মিল হবে না। শরৎ এমনিতে খুবই ভাল, ও লিখবে, আমি বললে নিশ্চিত সবাই লিখবে, আমি একাই দায়িত্ব নিতে পারব। আমি বিজ্ঞাপন চাইলে কেউ না বলে না! আমি তো বিজ্ঞাপন লাইনের প্রায় সবাইকে চিনি।

শুধু বিজ্ঞাপন লাইন কেন, শক্তির চেমাণুনোর পরিধি বিস্ময়কর। আমি সকলের সঙ্গে সহজ খোলামেলাভাবে মিশতে পারি না, ছেলেবেলার লাজুকতা এখনও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারিনি, কারুর সঙ্গে নতুন পরিচয়ের পর আড়ষ্টতা কাটাতে আমার অনেক সময় লাগে, এটা আমার দোষ আমি জানি। শক্তি ঠিক এর বিপরীত। পাঁচ-দশ মিনিট আলাপের পরই সে যে-কারুকে বলতে পারে, তোর বাড়িতে আজকে আমি ভাত খাব! অল্প সময়ের মধ্যে অস্তরঙ্গ হয়ে ওঠার অসাধারণ শৃণ আছে ওর চরিত্রে। আর কত লোকের যে নাম মনে রাখতে পারে! আনন্দবাজারে যোগ দেবার পরে বেশ কয়েক বছর আমি সেখানকার কোনও টেলিফোন অপারেটরের নাম জানতাম না। কারণ তাঁদের কখনও চোখে দেখিনি, শুধু গলার আওয়াজ শুনেছি। আর শক্তি ফোন তুলে নম্বর চাইবার আগে অপারেটরের গলা শুনেই বলত, কে, অমুক, কেমন আছ, তোমার ছেলে স্কুলে ভর্তি হয়েছে, আর তোমার মেয়ের জিনিস হয়েছিল, এখন ভাল আছে? অর্থাৎ অপারেটরের শুধু নাম নয়, তাঁদের পারিবারিক, এমনকী হাঁড়ির খবর পর্যন্ত শক্তি জানে। সকলের সঙ্গে এমন আপন-আপন ব্যবহারের জন্য শক্তি কবিতার সঙ্গে সম্পর্কহীন বহু মানুষের প্রিয়। এমনকী যাদের বাড়িতে অসময়ে উপস্থিত হয়ে শক্তি অনেক উৎপাত করেছে, তারাও শক্তিকে ভালবাসত।

আমি বললাম, বিজ্ঞাপন লাইনে, পুলিশ লাইনে, ট্যাঙ্কি ড্রাইভারদের লাইনে তোমাকে কে না চেনে!

শক্তি বলল, আমার হাজার পাঁচেক টাকা মাসে মাসে অন্তত দরকার। রিটায়ার করেছি, বাড়ির খরচ চলে যাবে। কিন্তু আমার নিজস্ব হাতখরচ, এটা সেটা চাই। সৌমিত্রদের ‘বিনোদন’ নতুন কাগজ, ওদের কাছে তো টাকা চাইতে পারি না। ‘কৃতিবাস’-এর জন্য ভাল বিজ্ঞাপন জোগাড় করে, সব খরচ-খরচা মিটিয়ে আমার নিজেরটাও চলে যাবে, কী বলো!

আমি বললাম, তা যেতে পারে, অসম্ভব কিছু নয়।

শক্তি বলল, অন্য বস্তুরা, যারা রিটায়ার করেছে, তারা খবরের কাগজে টুকিটাকি গদ্য লিখে কিছু রোজগার করে। সন্দীপন ব্যাটা আগে লিখতেই চাইত না, এখন প্রায়ই তো ওর লেখা দেবি। আমার গদ্য লিখতে ইচ্ছে করে না।

আমি বললাম, আগে তো অনেক লিখেছ। উপন্যাসও কয়েকটা।

শক্তি বলল, হ্যাঁ লিখেছি। এখন আর একদম ইচ্ছে করে না।

শক্তি আনন্দবাজার ও দেশ পুজো সংখ্যায় উপন্যাস লিখেছে, ‘অবনী বাড়ি আছে’ আর ‘দাঁড়াবার জায়গা’। সবসুন্দৰ ওর উপন্যাসের সংখ্যা আট। তার মধ্যে ‘হাই সোসাইটি’ নামে একটা উপন্যাসের বীভৎস মলাট দেখে আমি পড়িনি। ওটা বোধ হয়

ওর একসময়কার চৱম অর্থাভাবে কমার্শিয়াল উপন্যাস লেখার ব্যর্থ চেষ্টা। ওর প্রথম উপন্যাস 'কুমোতলা'ই আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল। অল্প বয়েসে পড়ার সেই মুক্তির স্মৃতি আছে। পরে সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে দ্বিতীয়বার পড়া হয়নি। ওই উপন্যাসে শক্তি একেবারে দেশি, গ্রাম্য শব্দ চমৎকার ব্যবহার করেছিল, একটা নতুন গদ্য ভাষা হতে পারত, কিন্তু সেদিকে আর গেল না। মাসিক কৃতিবাস প্রকাশের সময় একবার শক্তি নিজেই বলেছিল, শারদীয় সংখ্যায় কবিতার বদলে উপন্যাস লিখবে। আধখানা লেখার পর বলেছিল, আর লিখতে ভাল লাগছে না। সেটা সেইরকম অসমাপ্ত অবস্থাতেই ছাপা হয়েছিল।

শ্বাতী এই সময় বারান্দায় ফিরে এসে বলল, শক্তি, আপনি দুপুরে এখানেই থেয়ে নেবেন। বোয়াল মাছ খান? সুনীলের খুব প্রিয়। অবশ্য অন্য মাছও আছে।

শক্তি বলল, আমি সব মাছ খাই। বোয়াল চমৎকার। দুপুরবেলা তোমার এখানে থেয়ে খানিকটা ঘূমিয়ে নিলে বেশ হত। বিকেলে কবিতা পাঠ আছে, একসঙ্গে যেতাম। কিন্তু না গো, আজ খাব না। আজ্ঞ ফিরতেই হবে। বাবুই আসবে, গেস্ট হাউসে ও কি একা একা খাবে? মীনাক্ষী চলে গেছে, মেয়ে আসছে। ওরা সর্বক্ষণ এখানে আমাকে কেউ না কেউ পাহারা দেবে। বয়েস হয়েছে তো, এখন আর আমাকে একা রাখতে ওরা ভরসা পায় না।

তারপর দুর্ঘটিতে ঢোক ছেট করে বদ্ধজি, তা হলে এবার একটু হয়ে যাক! কী আছে দাও না। আমরা দুই ভাই মিলে একটু চকচক করে খাই।

শ্বাতী সঙ্গে সঙ্গে গলা চড়িয়ে বলল, শ্ব, না, ওসব হবে না। চা দিতে পারি।

শক্তি বলল, আহা, তুমি তো শোনোনি। এইমাত্র আমরা ঠিক করেছি আবার কৃতিবাস বার করব। ফাইনাল হঞ্জে গেছে। এটা সেলিব্রেট করতে হবে না? সুনীলও খাবে বলেছে।

আমি কৃত্রিম আপনিতে বলে উঠলাম, অ্যাই, আমি মোটেই বলিনি, আমি দিনের বেলা খাই না।

মদ্যপান বিষয়ে আমাদের কোনওদিনই সুকোছাপা নেই। খেতে ভাল লাগে, বেশ একটা সাময়িক উত্সুক্তি হয়। উচু গলায় হাস্য-পরিহাস ও গান-টান গাইতে ইচ্ছে করে, খাব না কেন? এক সময় খুব বাড়াবাড়ি হয়েছে বটে, সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা কোনওরকম বাহবিচার ছিল না, মৃত্যু-বুকির রোমাঞ্চও উপভোগ করা গেছে। এখন আর সে-রকমটা নেই। লেখালেখির চাপ খুব বেড়ে যাওয়ায় আমি ঠিক করেছিলাম, দিনের বেলা মদ্য স্পর্শ করব না। নিজেকে এমনই সংযত করেছি যে, কোনও নির্জন ডাকবাংলাতে সম্পূর্ণ একা একা কাটাবার সময়েও আমি সঙ্গের পর ঘন ঘড়ি দেখেছি, বাধা দেবার কেউ নেই, তবু রাত আটটার আগে বোতল খুলিনি। আনন্দবাজারে যোগদানের পর প্রথম প্রথম শক্তি আমাকে দিনের বেলাতেও নিয়ে যাবার জন্য টানাটানি ও কাকুতি-মিনতি করত, আমি দশবারের মধ্যে অন্তত আটবার ওকে প্রত্যাখ্যান করতে সমর্থ হয়েছি। সম্প্রতি শক্তিও অনেক কমিয়ে দিয়েছে, বছরে দু' তিনিদিন ছাড়া তেমন আর পাগলামি করে না। এমনও দেখেছি সম্প্রতি, কোনও

সান্ধ্য আজডায় শক্তি আমার আগেই গোলাস উলটে দিয়ে স্বেচ্ছায় বাড়ি ফিরে গেছে। ইদানীং অনেকেই শক্তিকে দেখে মনে করে, এক যায়াবর সন্ধ্যাসী ফিরে এসেছে সংসারে।

স্বাতীর সঙ্গে শক্তির প্রায়ই একটা মধুর খুনসুটি চলে। স্বাতী যতই আপন্তি করুক, খুব একটা ব্যক্তিত্ব ওর গলায় ফোটে না। শক্তিও স্বাতীকে নানারকম তোয়াজ করে ও ভূজুং-ভাজুং দিয়ে শেষপর্যন্ত ঠিক আদায় করে নেয়।

শক্তি আমার দিকে ফিরে বলল, সুনীল, রবিবার কিংবা ছুটির দিনে তো তোমার ওই নিয়মটা খাটে না। আমি জানি না? আজ রবিবার, আমি ঠিক হিসেব করে এসেছি।

নিজের স্ত্রীর কাছে সাধু সাজবার জন্য আমি বললাম, শক্তি যখন এত করে বলছে, দাও একটু। কৃতিবাসের ব্যাপারটা তো সেলিব্রেট করা যেতেই পারে। শক্তির সঙ্গে এত নিরিবিলিতেও অনেকদিন বসা হয়নি।

স্বাতী বলল, তা হলে ঠিক দুটো। তার বেশি নয়। তারপর আমি বোতল সরিয়ে নিয়ে যাব।

শক্তি বলল, আড়াই! আধখানা প্রেস দিও!

ভোদকা ফুরিয়ে গেছে, রামের বোতল এল। শক্তি বেশি খুশি হল, ও রামনিষ্ঠ। কিছুদিন আগে কোনও একটি পত্রিকায় ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে শক্তি বলেছে, আরও অনেকদিন বাঁচতে চাই, বাঁচব, আরও অনেকদিন রাম খাব।

ঢালাঢালির ভারটা বরাবার শক্তিই দেয়। দু' এক চুমুক দেবার পর হঠাৎ ও বেশ জোর ধমকের ভঙ্গিতে বলল, সুনীল, তুমি এত গদ্য লেখ কেন? আর কত লিখবে? এবার ছাড়ো তো! ওফ, এত গদ্য, এত গদ্য, এ যে কুলির কাজ!

আমি একটা দীর্ঘস্থান ফেলে বললাম, ছাড়তে তো খুব ইচ্ছে হয়। মাঝে মাঝে ভাবি, গদ্য একেবারে ছেড়ে দিয়ে আবার শুধু কবিতাই লিখব। সত্যিই গদ্য লেখা ছেড়ে দেব।

শক্তি বলল, হ্যে, তুমি পারবে? রাশি রাশি গদ্য লেখার পর কেউ আবার কবিতার কাছে ফিরে আসতে পারে?

আমি বললাম, ট্যাম্স হার্ডি পেরেছিলেন। 'জুড দ্য অবক্ষিওর'-এর পর তিনি আর উপন্যাস লেখেননি, বাকি জীবন শুধু কবিতাই লিখেছেন।

শক্তি বলল, ওসব হার্ডি-ফার্ডি ছাড়ো তো! তুমি পারবে না। তুমি ছাড়তে চাইলেও সম্পাদকরা তোমাকে ছাড়বে না। তোমাকে দিয়ে গদ্য লেখাবেই।

আমি বললাম, অর্থাৎ বলতে চাও, আমি যাবজ্জীবন বন্দি?

শক্তি বলল, আগে আমি অনেককে কী বলতাম জানো? ভাগিস সুনীল গদ্যের দিকে বেশিটা চলে গেছে, ও যদি শুধু কবিতা লিখত, তা হলে ওর সঙ্গে হয়তো আমার রেষারেষি লেগে যেত। এখন আর তা মনে হয় না। এখন কোনও পত্র-পত্রিকায় যখন তোমার কবিতা পড়ি, তোমারটাই পড়ি, তখন খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠি। মনে মনে ভাবি, সুনীল লিখেছে, তা হলে আমাকেও লিখতে হবে। তোমার

কবিতা পড়লে আমার উপকার হয়।

আমি বললাম, সেগুলো এমন কিছু পড়বার মতন হয় না।

শক্তি চূপ করে খানিকক্ষণ চেয়ে রাইল দূরের দিকে। আমাদের আজ্ঞায় সাধারণত সাহিত্য-কবিতা নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয় না। শক্তি অনেক লোকজনের সঙ্গ পছন্দ করে। অন্যরা কেউ সাহিত্য-প্রসঙ্গ তুললে শক্তি ধরক দেয়। অন্য কাঙুর মুখের ওপর ‘ধ্যার ব্যাটা, তুই কিছু লিখতে পারিস না’, এরকম কথা একমাত্র শক্তির পক্ষেই বলা সম্ভব।

শক্তি খানিকটা অন্যমনস্কভাবে বলল, একটা কথা বলব তোমায়, সত্ত্বি কথা বলব? আজকাল আমার কী যে হয়েছে, কবিতা লিখতেও আলস্য লাগে। মনে হয়, অনেক তো লিখেছি, আর কী হবে? কবিতা লিখতে লিখতে একদিন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এরকম আমার আগে কখনও হয়নি। এখন একটা কবিতা পাঁচ-সাত লাইন লেখার পরই মনে হয়, এই যথেষ্ট হয়েছে, আর লেখার দরকার নেই। অথচ আগে এক একদিনে পাঁচটা সাতটা কবিতা লিখেছি। চাইবাসায় সমীরের ওখানে এক এক দুপুরে পাগলের মতন লিখে গেছি। হিজলিতে মানবের কোয়ার্টারে যখন ছিলাম, সেই যে সেবারে মনে আছে, তুমি ফিরে চলে এলে, মানব সারা দুপুর থাকত না। একটা কাগজ টেনে নিয়ে খসখস করে লিখে ফেললাম, ‘অবনী বাড়ি আছো’, সেটা শেষ করেই ‘আমি স্বেচ্ছাচারী’, তারপর আরও একটা। অথচ এখন লিখতে ইচ্ছেই করে না। কবিতা লিখতে লিখতে মাঝপঝঝ ঘুম, এরকম আমার জীবনে কখনও হয়নি।

আমি বললাম, এখানে তোমার অস্তিক সময়, মাঝে মাঝে দেখবে আজ্ঞা দেবার লোক নেই, তখন লিখতে পারো।

জানলা দিয়ে স্বাতী বলল, শক্তি, শাস্তিনিকেতনে এসে দেখছি, আপনার চেহারা আবার ভাল হয়েছে, ভাল দেখাচ্ছে। এখানে বসে বসে অনেক কবিতা লিখে ফেলুন।

শক্তি বলল, হ্যাঁ, এখানে দারুণ ভাল আছি, বুঝলে? এখানে লিখব। আর ওই কবিতার ‘কৃষ্ণিবাস’ আবার বার করলে একটা বেশ জোশ আসবে, আবার অনেক মজা হবে। আমার ওইসবও দরকার।

স্বাতী বলল, রোদ বাড়ছে, এবার উঠে পড়ুন। এখানে থেকে যেতে পারলেই ভাল হত।

শক্তি বলল, দাঁড়াও, ওই যে আড়াইয়ের হাফটা এখনও বাকি আছে। থাকার যে উপায় নেই, বাবুই এসে পড়বে দুপুরের ট্রেনে—

স্বাতী বলল, আপনার মেয়েটা কী ভাল হয়েছে। যেমন সুন্দর ঘ্যবহার, লেখাপড়াতেও এত ভাল।

শক্তি বলল, বাবুই জিওগ্রাফিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে জানো তো? ও তো পড়াশুনোতে ভালই, নিজের মনে পড়ে, চিন্তা ছিল তাতারকে নিয়ে। তাতারও হায়ার সেকেন্ডারি ভালভাবে পাস করে গিয়ে আমাদের খুব অবাক করে দিয়েছে। হ্যাঁ গো, আমার ছেলেমেয়ে দুটো ভাল হয়েছে। আগেরবার আমি শাস্তিনিকেতন থেকে বাড়ি

গেছি, তাতার বাজার থেকে চুনো মাছ কিনে এনেছে, জানে যে বাবা চুনো মাছ ভালবাসে, এখানকার গেস্ট হাউসে তো ওসব পাওয়া যায় না, আমি যা যা ভালবাসি, বাড়িতে তাই রাখা করে রেখেছে। তোমাদের ছেলে পুপলুও...পুপলুকে আমি এত পছন্দ করি...

আমাদের এ পাড়ায় গাড়ি-টাড়ি বিশেষ আসে না। শাস্তিনিকেতন ক্যাম্পাস থেকে অনেক দূরে, বেশির ভাগ সময়ই নির্জন শুনশান, লোকজনও দেখা যায় না প্রায়। হঠাৎ একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। কথা থামিয়ে আমরা তাকিয়ে রইলাম সেদিকে।

এদিক ওদিক ঘূরে-ফিরে গাড়িটা এ বাড়ির গেটের সামনেই থামল।

দেখা গেল, গাড়ি ভর্তি অনেক লোকজন। একজন শুধু নেমে জিঞ্জেস করল, এখানে কি শক্তি চট্টোপাধ্যায় আছেন?

সেই ব্যক্তিকে চিনি, অচিন্ত্য শুণ্ট, একজন প্রকাশক, রশীদের বাড়ির আজডায় অনেকবার দেখেছি। গাড়িটার দিকে তাকিয়ে শক্তি বলল, যাক, আমাকে আর এই রোদুরের মধ্যে হেঁটে গিয়ে সাইকেল রিকশা খুঁজতে হবে না। এদের গাড়িতে ফেরা যাবে।

কাছে এসে অচিন্ত্য বিনীতভাবে বলল, পূর্বপন্থী গেস্ট হাউসে খবর পেলাম শক্তিদা এখানে এসেছেন। শক্তিদা, আমরা দিস্ত্রিব জন্য শাস্তিনিকেতনের শুপর একটা ডকুমেন্টারি তুলছি, আপনি এখানে পড়াশুন, আপনারও করেকটা শট নেব।

শক্তি উদারভাবে বলল, নিয়ে নাও, এই তো আমি আর সুনীল আছি, আমাদের দুঁজনের নিয়ে নাও।

আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম, ধৈ! আমার নেবে কেন? শক্তি, তুমি এখানে অধ্যাপক হিসেবে ক্লাস নিতে শুরু করেছ, আমি তো এখনও জন্মেন করিনি, এবাবে আমি এমনিই বেড়াতে এসেছি।

অচিন্ত্য বলল, হ্যাঁ শক্তিদা, আপনি ক্লাসে পড়াশুন বা কবিতা পাঠ করছেন, সেই সময়কার ছবি তুলব।

শক্তি বলল, আমাকে টাকা দিতে হবে কিন্ত। বিনা পয়সাম আমি আর ছবি-টবি তোলাতে রাজি নই।

টাকার প্রসঙ্গটা একটু আগেও উঠেছিল। হাত-খরচের ব্যাপারটা শুরু মাথায় ঘূরছে। আমাকে বলেছিল, এখন কোনও কবি সম্মলনে ডাকলেই আমি টাকা চাইব। যে-কোনও ফাংশনে গেলেই আমার টাকা চাই। সুনীল, তুমি যেন আবার ব্যাগড়া দিও না।

আমি বলেছিলাম, আমি ব্যাগড়া দিতে যাব কেন! কিছু পেলে তো ভালই।

শক্তি বলেছিল, তোমাকে জানি তো, ভদ্রতা করে বলে বসবে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, কিছু দিতে হবে না। তুমি চুপ করে থাকবে, যা বলার আমি বলব। দেবে না কেন? গায়ক-টায়কদের টাকা দেয়, আবৃষ্ণিওয়ালারাও টাকা পায়, কবিরা পাবে না? না দিতে চায় তো যাব না। কেন খামোকা কষ্ট করে গিয়ে কবিতা পড়ব? ওসব আগে

অনেক হয়েছে। এই তো সেদিন হলদিয়া গেলাম, আগেই বলেছি, আমাকে হাজার টাকা দিতে হবে, ওরা দিয়েওছে।

শক্তি আমাকে কয়েক জ্যাগায় টাকা পাইয়ে দিয়েছে, এ কথাও ঠিক। আমাদের দু'জনের কবিতা পাঠের ক্যাসেট হয়েছে অনেকগুলো। আলাদাভাবেও হয়েছে। ওসব জ্যাগায় রেকর্ডিং-এর সময় বলে যে, পরে টাকা (রয়ালটিউন নয়, সশ্বানদক্ষিণা) দেবে, তারপর আর অনেকেরই পাস্তা পাওয়া যায় না, এমনকী ক্যাসেটটাও পাই না। কিন্তু শক্তির সঙ্গে গেলে ও শর্ত করে নেয়, আমার আর সুনীলের টাকাটা আগে দিয়ে দাও, নইলে রেকর্ডিং হবে না।

অচিন্ত্য নিচু গলায় বলল, নিচ্ছয়ই সাধ্যমত্ত দেব।

বেলা হয়ে গেছে, এবার উঠতে হবে। শক্তি হঠাৎ খাবার ঘরে গিয়ে বলল, স্বাতী, তোমার বাড়িতে আজ দুপুরে খাওয়া গেল না, কিন্তু বোয়াল মাছের কথা শুনে লোভ হচ্ছে। শুধু দু' পিস মাছ দাও তো, চট করে খেয়ে যাই!

বিকেলবেলা বিষ্বভারতীর বাংলা বিভাগে তিন ভিজিটিং প্রফেসরের কবিতা পাঠের কথা। আমি একটু দেরিতে পৌছেছি, ততক্ষণে শরৎ ও শক্তি এসে গেছে। অস্থায়ী উপাচার্য শিশির মুখোপাধ্যায়, রেজিস্ট্রার প্রণবানন্দ যশ, বাংলা বিভাগীয় প্রধান অমিত্রসুন ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা সবাই উপস্থিত। ছোট, ঘরোয়া আসর, ছাত্র-ছাত্রী বা বাইরের ঝুঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। কফি-জলপানের পর শক্তি জিঞ্জেস করল শরৎ, তুমি আগে পড়বে? শরৎ বলল, শক্তি, তুমিই শুরু করো।

সঙ্গে সঙ্গে শক্তি একটা বইয়ের মাঝখান খুলে যে কবিতা প্রথম চোখে পড়ল, সেটাই পড়তে লাগল। শক্তির পাঠ শুনতে শুনতে আমার বিস্ময়ও বাঢ়তে লাগল ক্রমেই। একটার পর একটা পড়ে যাচ্ছে, এত ভরাট গলায়, এত বিশুদ্ধ স্বরে, এমন নিবিষ্টভাবে আমি বহুদিন শক্তিকে কবিতা পড়তে দেখিনি। ইদানীং ও কবিতা পাঠ সম্পর্কে খানিকটা উদাসীন হয়ে গিয়েছিল, কোথাও দুটো-তিনটোর বেশি পড়তেই চাইত না। কয়েক বছর আগে গৌহাটিতে একটা বড় আসরে শক্তি এমনই অনাচার করেছিল যে, মঞ্চে দাঁড়িয়ে কবিতা পড়তেই পারেনি, হাত থেকে খসে পড়েছিল বই। সেদিন শক্তিকে আমি খুব বকুনি দিয়েছিলাম।

আজ এই ছোট ঘরে শক্তি যেন দশ বছর আগেকার বয়েসে ফিরে গেছে, গলায় সেই জ্বর ও তশ্বায়তা। লক্ষ করলাম, দু' একজন অধ্যাপিকার ঠেটি নড়ছে, অর্থাৎ শক্তির ওই সব কবিতা ওঁদের মুখস্থ। শক্তি কিন্তু খুব চেনা ও জনপ্রিয় কবিতাগুলো পড়ছে না। শক্তির 'অকনী বাড়ি আছো' শুনলে আমার কানে আঙুল দিতে ইচ্ছে করে, কেননা আমি অস্তত হাজারবার শুনতে বাধ্য হয়েছি, যেমন আমার 'কেউ কথা রাখেনি' শুনলেই শক্তি বলে, খেৎ, আর পারি না, শুনতে কান পচে গেছে।

শক্তি পড়েই চলেছে, অস্তত কুড়িটা কবিতা শেষ হবার পর ওর বঙ্গ সত্য সাঁই পাশ থেকে কলুইয়ের খোঁচা মেরে মদু স্বরে বলল, শক্তি, এবার অন্যদের সুযোগ দাও!

যেন একটা ঘোর ভেঙে গেল, শক্তি মুখ তুলে বলল, ও, আচ্ছা, শেষ করছি!
‘আনন্দভৈরবীটা পড়ি?

আমি আপনি জানলাম। শক্তিই পড়ুক না, ওর পড়তে ভাল লাগছে, আজ
শক্তিরই দিন হোক, আমার এবং শরতের পাঠ না হলৈই বা ক্ষতি কী? শক্তির এত
সুন্দর পাঠ শুনতে শুনতে আমারও নেশা লেগে যাচ্ছিল। আমাদের প্রত্যেকের কবিতা
অবশ্যই আলাদা, কিন্তু একটা যেন যৌথ প্রয়াসেরও ব্যাপার আছে। শক্তির এই সব
কবিতা রচনার ইতিহাস জানি, অনেক কবিতা ছাপার আগে শুনেছি কিংবা প্রফু
দেখেছি। কৃতিবাসের আমলে আমরা যে-কেউ একটা বিশেষ ভাল কবিতা লিখলে
সবাই গবিত বোধ করতাম।

আজ শক্তিরই একক আসর হলে ঠিক হত, তা অবশ্য হল না, আমাদের
দুঃজ্ঞনকেও পড়তে হল। কফি পানের পর অন্যদের অনুরোধে শুরু হল আর একপ্রস্তু
কবিতা পাঠ, শক্তি এবার পড়ল চতুর্দশপদী সংগ্রহ থেকে প্লাটেরো সিরিজ। কিন্তু
আগেকার সেই তশ্যাতা আর ফিরে এল না।

সভা ভঙ্গ হতেই শক্তি আমাকে বলল, চলো, একবার গেস্ট হাউসে যাই, বাবুই
দুপুরে আসেনি। যদি এর মধ্যে এসে পড়ে?

আমি বললাম, এর পরের ট্রেন বিশ্বভারতী প্যাসেঞ্জার, পৌছবে সওয়া আটটায়।
এখন তো সাতটা বাজে।

শক্তি ব্যস্ত হয়ে বলল, বলা যায় না, যদি লোকাল ট্রেন-ফ্রেন ধরে চলে আসে।
একবার দেখে আসি।

হেঁটে যাব না রিকশায় যাব এই সিয়ে আলোচনা করছি, শিশির মুখোপাধ্যায়
বললেন, আমার গাড়িটা দিছি, আপনাদের পৌছে দিয়ে আসবে।

শক্তি বলল, ভালই হল। আমার এখন আর হাঁটতে ইচ্ছে করে না। শিশির,
তোমার গাড়িটা আমরা কিছুক্ষণ রেখে দেব, খানিক বাদে আমাদের বুলবুলের
বাড়িতে পৌছে দিয়ে আসবে?

শরৎকুমারকে তখন দেখা গেল না, সে তখন বাইরে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কিছু
আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তখনি গেস্ট হাউসে ফেরার তাড়া নেই।

বলাই বাহ্য, বাবুই এখনও এসে পৌছয়নি। মীনাক্ষী নিষ্কয়ই ঘরটা গুছিয়ে
রেখেছিল, শক্তি এর মধ্যেই যথেষ্ট এলোমেলো করে ফেলতে পেরেছে। ভালই
দেখাক্ষে।

শক্তি বলল, আমার হিসিও পেয়ে গিয়েছিল। ওদের ওখানে সিগারেট-ফিগারেট
খাওয়া যায় না। বাথরুম আছে কিনা কে জানে। এখানে কিছুক্ষণ বসে যাই।

আমি বললাম, শক্তি, তুমি শিশির মুখোপাধ্যায়কে তুমি তুমি বলেছিলে। আগের
ভাইস চ্যাঙ্গেলার সব্যসাচী ভট্টাচার্যকেও তুমি বলতে, মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে তুমি
বলে নাম ধরে ডাকো। এই তো কিছুদিন আগেও ভাবতাম, মন্ত্রী, ভাইস চ্যাঙ্গেলার
ঠিক সব বিশাল বিশাল লোক, ধরা-ছেঁয়া যায় না, এখন এঁদের নাম ধরে ডাকা, তুমি
বলা, আমরা কোথায় পৌছলাম! একেবারে বুড়ো হয়ে গেলাম নাকি!

শক্তি অট্টাহাস্য করে বলল, আরে শিশির তো বিটুর বদ্ধ, আমার অনেকদিনের চেনা! আর বুদ্ধকেও বছৎ দিন ধরে চিনি, আমাকে শক্তিদ্বা বলে, ওকে নাম ধরে ডাকব না? তুমি মানতে চাও না, কিন্তু আমরা বুড়ো হচ্ছি তো বটেই! একদিন ট্রামে উঠতে যাচ্ছি, আমার মাথার পাকা চুল দেখে একজন আমায় দাদু বলে ডাকল! তোমার অবশ্য চুল অতটা পাকেনি, শুধু ভুলপি-পাকা! দাঁড়াও না, আরও তো অনেক বছর বাঁচব, ইভিয়ার প্রাইম মিনিস্টারকেও একদিন কাঁধ চাপড়ে তুমি তুমি করব!

এ সৌভাগ্য অবশ্য আমার হবে না। খুব পরিচিতের সঙ্গেও আমি আপনি থেকে তুমিতে নামতে পারি না। শক্তির সঙ্গে শীর্ষেন্দু-দিয়েন্দুদের তুই-তুই সম্পর্ক। আমার অনেক সমসাময়িক বন্ধুকেই আমি এখনও আপনি বলি, এটা একটা লজ্জার বিষয়! বয়োজ্ঞেষ্টদেরও চট করে দাদা বলতে পারি না। শক্তি অনেক মেয়েকে মা মা বলে। অপর্ণা সেনকেও ‘আয় মা’ বলে ডাকে। আমার মুখ দিয়ে মা, মাসি-পিসি, বোনটি ধরনের সম্মোধন জীবনে বেরুবে না।

শক্তি বলল, রাম খাবে? আমার কাছে একটা ছেট বোতল আছে, তাও অর্ধেকটা।

আমি বললাম, না, শক্তি, এখন আর আমি রাম খাব না।

শক্তি তবু বলল, এসো না। একটু একটু করে—

আমি প্রবলভাবে মাথা নাড়লাম।

শক্তি আর পেড়াপিড়ি করল না। কিন্তু অস্থিরভাবে বলল, তা হলে এখন কী করি? বুলবুলের বাড়িতে যাওয়ার তো দেরি আছে।

তারপরেই গান ধরল:

ভেবেছিলেম ঘরে রাবো, ক্ষেত্রাও যাবো না

ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশি বলো কী করি

ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশি...

মারিলো মরি আমায়...

এটা শক্তির প্রিয় গান। পুরোটা গাইল না। হঠাত থেমে গিয়ে বলল, এই গোস্ট হাউসটা এমনিতে খারাপ না, চলে যাচ্ছে, কিন্তু একটা জিনিস দ্যাখো, ঘরের সঙ্গে কোনও বারান্দা নেই। শুধু একটা ঘর। সারাক্ষণ মানুষ ঘরের মধ্যে বসে থাকতে পারে? রাস্তিরে এসে ঘুমোনো যায়, কিন্তু অন্য সময়, একটা বারান্দা থাকলে দিব্যি বাইরেটা দেখতে দেখতে সময় কাটানো যেত। দোতলার শুপর এতগুলো ঘর বানিয়েছে, অথচ দ্যাখো একটাও বাইরের দিকের বারান্দা নেই।

অভিযোগটা আমার যুক্তিযুক্ত মনে হল। রতন কৃষ্ণের সামনে টানা বারান্দা রয়েছে। সেখানে চেয়ার টেনে বসে দিব্যি আজড়া দেওয়া যায়। এখানেও প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে একটা করে ছেট বারান্দা অনায়াসেই রাখা যেত। পয়সার অভাব, না কল্পনাশক্তির অভাব?

শক্তি বলল, বেশিক্ষণ ঘরের মধ্যে বসে থাকলে আমার দমবন্ধ লাগে, শুইজন্যই আমি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াই। কেউ কেউ অবশ্য সারাদিন ঘরে বসে পড়াশুনো করে। আমার ভাল লাগে না।

আমি বললাম, শক্তি, তুমি আজ কী দারুণ কবিতা পড়লে। একেবারে ইনস্পায়ার্ড
যাকে বলে। তারপর আমার আর পড়তেই ইচ্ছে করছিল না।

শক্তি মুখ নিচু করে বলল, এক একসময় মনে হয় কী জানো, এই যে এত লিখেছি,
তা কি হয়েছে কিছু? এই পদ্যগুলো টিকবে? আবার এক একদিন, যেমন আজকে,
পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল, মন্দ লিখিনি। কী করে যে লিখেছি নিজেই জানি না, যেন
ম্যাজিকের মতন এক একটা শব্দ এসেছে, উশাদের মতন লিখে গেছি, আজ নিজের
পদ্যগুলোই আমার কাছে নতুন, অচেনা মনে হচ্ছিল, সেইজন্যই পড়ে যাচ্ছিলাম।
আচ্ছা সুনীল, বলো তো, এই যে এখনকার ছেলেরা লিখছে, জয়, জয়দেব। আমরা
কি ওদের মতন আর লিখতে পারছি?

আমি বললাম, এখনকার ছেলেরা এবং মেয়েরাও কয়েকজন বেশ ভাল লিখছে।
নতুন রকম লিখছে, কিন্তু আমরা ওদের মতন লিখতে যাব কেন? তুমি তোমার মতন
লিখবে, আমি আমার মতন লিখব। আমি সাহিত্যজগতে কোনও প্রতিযোগিতায়
বিশ্বাস করি না। অল্পবয়েসি কারূর কোনও কবিতা পড়ে যদি মুক্ষ হই, তখন আমার
নিজেরও লেখার ইচ্ছে হয়, অনেক সময় ইচ্ছেটাই হয়, কিন্তু লিখি না, কিংবা
লিখলেও সেই লেখার সময় অন্য কাঙ্ক্রু কথা তো মনে থাকে না।

শক্তি বলল, তুমি তো গ্যাজারাং গ্যাজারাং করে দিস্তে দিস্তে গদ্য লিখেই চলেছ,
অন্যদের লেখা পড়ো কখন?

আমি বললাম, না শক্তি, ও কথা বলো না। তোমায় চেয়ে এখনও আমি তের বেশি
কবিতা পড়ি, অনেক কিছুই পড়ি, তুমি কেউ পড়তেই চাও না।

শক্তি হাসতে হাসতে বলল, ওই যে তুমি বললে, আমি আমার মতন, তুমি
তোমার মতন। চলো, চলো, এবার উঠে পড়ি!

আমি বললাম, এখনও তো দেরি আছে।

শক্তি আর মানল না, উঠে দাঁড়াল।

আজ রাতে বুলবুলের বাড়িতে চাঁদের আলোয় শিকনিক, সেখানে আমাদের
দু'জনেরই নেমস্তুর আছে। সমরেশ বসুর বড় মেয়ে বুলবুলকে চিনি প্রায় বাচ্চা বয়েস
থেকে, বড় ভাল গান গায়। বুলবুল আজ তার বাড়িতে ছাত্রছাত্রীদের নাচ-গানের
আয়োজন করেছে, সেইসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া।

গাড়িতে উঠে, পূর্বপল্লী ছাড়াবার পর শক্তি বলল, বাতাসে একটা ফুলের গন্ধ
পাচ? কী ফুল বলো তো?

একটা ফুলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ঠিক চেনা যাচ্ছে না। এই সময়
শিমুল আর পলাশই বেশি ফোটে। গাঢ় লাল রঙের ফুলে গন্ধ থাকে না। একটা
বাড়িতে বাতাবিলেবু গাছে ফুল ফুটতে দেখেছি, বেশ মিষ্টি গন্ধ। বললাম, বাতাবি
ফুল?

শক্তি ঘাড় নেড়ে বলল, নাঃ নাঃ! মহুয়া ফুলের মতন মনে হচ্ছে।

আমি বললাম, শাস্তিনিকেতনে মহুয়া ফুল কোথায় পাবে? এখানে আমি মহুয়া
গাছ দেখিনি। অন্য কোনও ফুল হবে।

শক্তি বলল, ক'দিন আগে রামপুরহাট গিয়েছিলাম, বুঝলে ! গাড়িতে করে ফেরার সময় রাস্তায় এক জায়গায় মহুয়া ফুলের গন্ধ পেতেই আমি চেঁচিয়ে অর্জর দিলাম, থামো, থামো, এখানে থামো। ঠিক মহুয়া ফুলের গাছ আছে, কাছেই একটা মহুয়ার দোকান। ফার্স্ট ক্লাস মহুয়া খেলাম। তুমি কতদিন মহুয়া খাওনি ?

আমি বললাম, তা অনেকদিন খাইনি বটে। অন্তত বছর পাঁচেক তো হবেই। শেষবার সেই বাড়িগ্রামে—

শক্তি বলল, মনে আছে, হেসাডিতে, ওফ, মহুয়ার আন্দ করেছি—

কিছুক্ষণ চলল হেসাডির গুৱ ও সন্দীপনের নানান বীরত্ব কাহিনী।

বুলবুলের বাড়ির কাছে গাড়ি থেকে নামবার পর ড্রাইভারটি বিনীতভাবে বললেন, স্যার, উনি ঠিকই বলেছেন, গাড়ির মধ্যে কিছু মহুয়ার ফুল রেখেছি, উনি সেই গন্ধ পেয়েছেন।

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম, শাস্তিনিকেতনে মহুয়া গাছ আছে নাকি ?

ড্রাইভার বললেন, হ্যাঁ, আছে কয়েকটা।

শক্তি সগর্বে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দেখলে, দেখলে, আমার ভুল হয় না। তুমি কিসু গন্ধ ঢেনো না ! কোথায় বাতাবির ফুল, কোথায় মহুয়া !

বুলবুলের বাড়িতে চুকে দেখা গেল, তখনও কিছু শুরু হয়নি, উদ্যোগ-আয়োজন কিছু বাকি আছে। বুলবুল বলল, আপনারা বরং বুলাদার বাড়িতে গিয়ে কিছুক্ষণ বসুন, আমি ডেকে পাঠাব।

গাড়িটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, হেঁটে যেতে হবে। অবশ্য বুলাদার বাড়ি বেশি দূর নয়, একটি ছেলেকে পথপ্রদর্শক হিসেবে সঙ্গে নেওয়া হল।

একটুখানি গিয়েই শক্তি বলল, খোঁ ! আজকাল আর হাঁটতে একদম ভাল লাগে না।

দোতলার ওপর অপেক্ষা করছিলেন বুলাদা আর মন্টুদা। এই দু'জনকেই ডাকনামে সবাই চেনে। পোশাকি নাম অনেকে জানেই না। বুলাদার গায়ের রং ফরসা, মাথার চুল সাদা, দেখলে মনে হয় টুকুকুকে পাকা ফলের মতন বুড়ো, আসলে অত্যন্ত তারঝ্যময় মানুষ। আর মন্টুদার বয়েস সন্তরের কাছাকাছি হলেও শাস্তিনিকেতনের সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। দু'জনেই ভাল গান গাইতে পারেন, যে কোনও আড়ার আসর জমিয়ে দেন।

দোতলায় উঠে এসে শক্তি বলল, এইটুকু হেঁটেই হাঁপিয়ে গেলাম কেন ? বুকে যেন চাপ লাগছে।

বুলাদা বললেন, গ্যাস হয়েছে নাকি ? অ্যান্টাসিড খাবে ?

শক্তি বলল, নাঃ, আমার ওসব কিছু হয় না। হাঁট-ফাঁট সব ভাল আছে। এখন ঠিক হয়ে গেছি।

বুলাদা তবু কয়েকটা অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট এনে দিলেন, শক্তি খেল না, পকেটে রেখে দিল।

বুলাদা এবং মন্টুদা দু'জনেই শক্তিকে খুব ভালবাসেন। মন্টুদা বললেন, শক্তি

একটা টিভি টিম তোমাকে নিয়ে শুটিং করবে নাকি শুলুম। তুমি শাস্তিনিকেতনে যতদিন থাকবে, আমাকে তোমার লোকাল গার্জেন করে দাও। টাকা-পয়সার ব্যাপার-স্যাপার সব আমি সামলাব। তুমি তো আপনভোলা, ওসব পারবে না।

বুলাদা বললেন, আমি হব মন্টুর অ্যাসিস্ট্যান্ট—

শক্তি খুব হাসতে লাগল। একটু পরে বারান্দার সেই আজ্ঞায় এসে যোগ দিলেন বুলাদার স্ত্রী এবং স্বাতী। মাঝে মাঝে গান ও হাস্যপরিহাস। বুলবুলের দৃত এসে বারবার তাড়া দিচ্ছে, তবু আমাদের আজ্ঞা ভাঙে না।

বুলবুলের বাড়িতে যখন ফিরে এলাম, তখন ছাত্র-ছাত্রীদের নাচগানের অনুষ্ঠান প্রায় শেষ পর্যায়ে। সামনে শতরঞ্জি পাতা, পেছনে আমাদের জন্য চেয়ার দেওয়া হয়েছে। আকাশে বসন্তের চাঁদ ঠিকঠাক আলো দিচ্ছে। এই সময়কার বাতাস বড় মধুময়।

শক্তি চেয়ারে বসল না। ও নাচ-টাচ বিশেষ পছন্দ করে না কোনওদিনই। ওর নেশা রবীন্দ্রসংগীতে। সুকষ্টের রবীন্দ্রসংগীত ও মন্ত্রমুক্তের মতন শোনে। বাঙালিদের নাচে আমারও অবশ্য আপ্রহ নেই, এবং ইদানীং বহুক্ষণ রবীন্দ্রসংগীতগুলিতেও আর রস পাই না। যে-সব গান খুব কম গাওয়া হয়, কিংবা রাগ-নির্ভর, বরং সেগুলি ভাল লাগে। তবে অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েরা যাই-ই করুক, তাদের মুখে যে তীব্রতা ফুটে ওঠে, সেটা দেখে মুঞ্চ হই।

একটি অচেনা যুবকের সঙ্গে শক্তি কথা বলে চলেছে, একসময় ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, কী কথা তাহার সাথে, তার সাথে? শক্তি বলল, এই ছেলেটি ডাক্তার। দারুণ ছেলে, ওর সঙ্গে আলোচনা করছি, ভাবছি এখানে থাকতে থাকতে একধার সব চেক-আপ করিয়ে নেব। এখানে তো অনেক সময় পাওয়া যাবে। বুলবুল কখন গাইবে?

বুলবুলের একটা বড় ঘুণ, আজ গাইতে পারব না, গলা ভাল নেই, এই ধরনের কথা কখনও বলে না। আমরা অনুরোধ করলেই গায়। আরও গান হল, তারপর খোলা আকাশের নীচে পাত পেড়ে খেতে বসা হল। এক-একদিন শক্তি রাস্তিরের দিকে কিছু খেতে চায় না, এক-একদিন বেশ চেটেপুটে থায়। আজ ছাত্র-ছাত্রীদের রামায় বেশ ভাল স্বাদ হয়েছে, শক্তি বেশ মন দিয়ে খেল সব পদ।

রাত হয়েছে বেশ, ছেলেমেয়েরা বিদায় নিচ্ছে দ্রুত।

বুলাদার বাড়ি কাছেই, মন্টুদার সাইকেল আছে। স্বাতী একটি চেনা রিকশাওয়ালাকে এনে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, আমরা সেটাতেই ফিরব। শক্তি যাবে কী করে? এখান থেকে পূর্বপল্লী যথেষ্ট দূর, এ সময় রিকশা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। ঠিক হল যে, আমাদের রিকশা শক্তিকে পৌছে দিয়ে আসবে, ততক্ষণ আমরা এখানে অপেক্ষা করব।

এই সময় একজন ভদ্রমহিলা, এখানকার কোনও ছাত্রীর মা, আমাকে এসে বললেন, আমাদের সঙ্গে গাড়ি আছে, আপনাদের বাড়ি পৌছে দিতে পারি।

আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, বাঃ, এ তো খুব ভাল প্রস্তাব। আমাদের পৌছে দিতে

হবে না, আমাদের সঙ্গে রিকশা আছে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে পূর্বপল্লীতে নামিয়ে
দেবেন একটু?

তিনি বললেন, নিশ্চয়ই। আমরা ওইদিকেই যাব।

শক্তি আমার দিকে ফিরে বলল, আজ দেখা যাচ্ছে আমার গাড়ির ভাগ্য খুব ভাল।
তারপর জিঞ্জেস করল, তুমি আর স্বাতী কাল সকালেই ফিরে যাবে?

আমি বললাম, ফিরতেই হবে, উপায় নেই।

শক্তি বলল, দিন সাতেক বাদে আমিও একবার কলকাতায় যাচ্ছি। তখন
কৃষ্ণিবাসের ব্যাপারটা একেবারে পাকাপাকি করে ফেলতে হবে। সময় নষ্ট করে লাভ
নেই, এই পঁচিশে বৈশাখ থেকেই—। সুনীল, দেখো, আমি এমন কাগজ করব যে,
আবার একটা তুলকালাম শুরু হয়ে যাবে।

মাঝে ভ্যানে উঠে শক্তি জানলা দিয়ে আমাদের দিকে হাত নাড়ল।

শক্তির সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা।

এরপর চতুর্থ দিন সকাল ছটার একটু পরে, তখনও আমার ঘূম ভাঙেনি, স্বাতীই
টেলিফোনের শব্দে জেগে উঠে দুঃসংবাদটি আগে শোনে। স্বাতীর অবিশ্বাস ও প্রায়
দমবন্ধ করা গলার আওয়াজ শুনে আমি ধড়মড় করে উঠে বসি।

আমার ধারণা, আমি কঠিন ধরনের মানুষ। সবরকম অবস্থার সম্মুখীন হয়ে সবকিছু
সহ্য করতে পারি। কিন্তু শক্তি আর নেই শুনেই আমার মাথাটা ঘুরতে থাকে, হয়তো
একটুক্ষণের জন্য আমার চেতনা লোপ পেয়েছিল।

সে যাই হোক। অনেকদিন পর ওই উনিশে মার্চ শক্তির সঙ্গে আমি প্রায় সারা দিন
কাটিয়েছি, সেই স্মৃতিটাই আমি হ্বহু রেখে দিতে চাই।

ତିଲାର ଓପର ଥେକେ ଶକ୍ତିକେ ଡାନା ମେଲେ ଉଡ଼ିତେ ଦେଖେଛି

ଏହି ତୋ କିଛୁକଣ ଆଗେ ଶକ୍ତିର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରତେ ଶିଯେଛିଲାମ ହାଓଡ଼ା ସ୍ଟେଶନେ । ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଏକସ୍ପ୍ରେସେ ବିକେଳ ପୌନେ ଚାରଟେଯ ଫିରେ ଏହି ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତିର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ହଲ ନା । ଟ୍ରେନ ଥେକେ ନିଜେ ନାମଲ ନା ଶକ୍ତି, ତାକେ ନାମାନ୍ତର ହଲ, ସେ ଆର ଶକ୍ତି ନୟ, ଶକ୍ତିର ଶରୀର ।

ଏକ ପଲକେର ବେଶି ତାର ମୁଖେର ଦିକେ ତାକାତେ ପାରିନି । ଶକ୍ତି ଆର ନେଇ ? ଏହି ସବ ବ୍ୟାପାରେ ଆମି ବୁବ ଦୂରଳ । ଭୋର ଛଟାଯ ଯଥନ ଟେଲିଫୋନେ ଖବରଟା ପ୍ରଥମ ଶୁଣି, ତଥନ ଆମାର ମାଥା ଘୁରେ ଶିଯେଛିଲ, ଏ ଯେନ ଆମାରଇ ମୃତ୍ୟୁ-ଶେଳେର ମତନ । ମାଝେ ମାଝେ ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେ କଥା ହୁତ, ଆମି ଆଗେ ଚଲେ ଗେଲେ ଶକ୍ତି ଆମାର ଅବିଚୂଯାରି ଦୂର୍ଚାର ଛତ୍ର ଲିଖତେ ବାଧ୍ୟ ହବେ, ଆର ଓ ଚଲେ ଗେଲେ ଆମି । ଶକ୍ତି ହାସତେ ହାସତେ ବଲତ, ଆମି ତୋମାର ଚେଯେ ତେବେ ବେଶି ଦିନ ବାଁଚିବ, ବୁଝଲେ ! ମନେ ମନେ ଆମି ଜାନତାମ, ସେଟାଇ ସ୍ଵାଭାବିକ, ଆମାରଇ ଆଗେ ଯାଓୟାର କଥା । ହଠାଏ ଶକ୍ତି ଏ କୀ ଭେଲ୍‌କି ଦେଖାଲ ?

ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କେ କିଛୁ ଲିଖତେ ହବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉଟି ? ସଂବାଦପତ୍ରେର ସଙ୍ଗେ ସଂୟୁକ୍ତ ଥାକଲେ ଏ ରକମ ଦାଯିତ୍ବ କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ନିତେଇ ହୁଣ୍ଡା ଭାବଛି କୀ ଲିଖିବ, କୋଥା ଥେକେ ଶୁରୁ କରବ, ମାଝେ ମାଝେ ଚୋଖେଓ କିଛୁ ଦେଖତେ ପାଇଁ ନା । ପ୍ରାୟ ବେଯାଲିଶ ବହର ଆଗେ, ଧୂତିର ଓପରେ ଶାର୍ଟ ପରା ସଦ୍ୟ କୈଶୋରଣୀୟ ବୟସେ ପରିଚିଯ, ତାରପର ଥେକେ ସୁଖେ-ଦୁଃଖେ ଏକସଙ୍ଗେ ବହୁ ଘୋରାଘୁରିଛିଲା ହଲ । ତାର କତଟା ଦେଖା ଯାଯା ? ଏହି ତୋ ସେ-ଦିନ, ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ଆଗେ ଶାନ୍ତିନିକେତନେଇ ଓର ସଙ୍ଗେ କାଟାଲାମ ସକାଳ ଥେକେ ସାରା ଦିନ, ମଧ୍ୟ ରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ସ୍ଵାନ୍ତ୍ୟ ବେଶ ଚମରକାର, ଅନେକ ବ୍ୟାପାରେ ଟଗବଗେ ଉତ୍ସାହ, ପ୍ରଥମେଇ ଆମାକେ ବଲଲ, ତୋମାର ସଙ୍ଗେ ବିଶେଷ କାଜେର କଥା ଆଛେ । ଶକ୍ତିର ସଙ୍ଗେ କାଜେର କଥା ? ଆମାର କୌତୁକ ଉଡ଼ିଯେ ନିଯେ ସେ ବଲଲ, ଏସୋ, ଆମରା ଆବାର ‘କୃତ୍ସିବାସ’ ବାର କରି । ଏଥନ ଏକଟାଓ ଭାଲ କବିତା-ପତ୍ରିକା ନେଇ ।

ଏହି ‘କୃତ୍ସିବାସ’ ପତ୍ରିକାର ସୂତ୍ରେଇ ଶକ୍ତିର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମ ଯୋଗାଯୋଗ । କଲେଜ ଷ୍ଟ୍ରିଟ କିମ୍ବା ହାଉସେ ଉଦ୍ଦୀଯମାନ କବି ଓ ଗର୍ଜକାରଦେର ଆଲାଦା ଆଲାଦା ଟେବିଲ । ଏକ-ଏକଟା ଟେବିଲ ଆବାର ଏକ-ଏକଟି ଲିଟଲ ମ୍ୟାଗାଞ୍ଜିନେର କାର୍ଯ୍ୟଲୟଓ ବଟେ ! ଶକ୍ତି ତଥନ ବସତ ଗଦ୍ୟ ଲେଖକଦେର ଟେବିଲେ, ଶୁଲିଙ୍କ ସମାଦାର ଏହି ଛଦ୍ମନାମେ ଟୁକିଟାକି ଗଦ୍ୟ ଲିଖେ, ‘କୃଯୋତ୍ସା’ ନାମେ ଏକଟି ଉପନ୍ୟାସ ମକଶୋ କରେଛେ, କବିତାର ଧାରେକାହେ ନେଇ । କ୍ରମଶ ଦେଖା ଗେଲ, କବିରାଇ ଦଲେ ଭାରୀ, ତାଦେର ଉଦ୍ଦୀପନା ବେଶ । ଏକଦିନ ଶୁଟ୍ଟିଶୁଟ୍ଟି ପାଯେ ଶକ୍ତି ଏସେ ବସଲ ଆମାଦେର ଟେବିଲେ । ଗାଲ ଭର୍ତ୍ତି ଦାଡ଼ି, ସିଗାରେଟେର ବଦଲେ ବିଡ଼ି ଖାଯ, ସେଟାଇ ଛିଲ ଶୌଖିନତା । କିନ୍ତୁ କୃତ୍ସିବାସେର ଦଲେ ଯୋଗ ଦିତେ ଗେଲେ ତୋ ଯୋଗ୍ୟତାର ପରିଚିଯ ଦିତେ ହବେ । ଠିକ ପ୍ରଥମ କବିତାଟିଟିତେ ନୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ କବିତାତେଇ ଶକ୍ତି ଚମକିପଦ

প্রতিভাব পরিচয় দিয়েছে। অচিরে বোৰা গেল, শক্তি বাংলা কবিতায় একটি বড় আসন দখল করতে এসেছে।

সেই ‘কৃষ্ণবাস’ আবার এতকাল বাদে প্রকাশিত হবে শক্তির সম্পাদনায়, এ প্রস্তাবে আমিও উন্মেষিত। এই উপলক্ষে সেলিব্রেট করা যায়।

সদ্য ষাট পেরিয়েছে শক্তি, এর অনেক আগোই তার মৃত্যু ঘটে যেতে পারত। অনেকবার নিজের জীবন নিয়ে দারুণ ঝুঁকি নিয়েছে শক্তি। একটা বয়েস পর্যন্ত মৃত্যু নিয়ে বেশ ছেলেখেলা করা যায়, তার চেয়েও অনেক বেশি বয়েস পর্যন্ত শক্তি সেই খেলা খেলেছে। রাস্তিরবেলা অঙ্ককার গভীর সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে সে, লাফ দিয়ে আগুন পার হয়েছে, লুটোপুটি খেয়েছে ধুলোয়। কবিতা তার জীবন যাপনের অঙ্গ। গানের গলা বেশ ভাল, শক্তির অন্যতম প্রিয় গান, ‘আমি জেনেশনে বিষ করেছি পান’। বিয়ে করে সংসারী হয়েছে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের ভালবেসেছে, তয় পেয়েছে, স্নেহ দিয়েছে, আবার কখনও কখনও সে দারুণ অসংসারী, তার বুকের মধ্যে ছটফট করত একটা ঈগল পাখি। হ্যাঁ, টিলার ওপর থেকে আমি ডানা মেলে উড়তে দেখেছি শক্তিকে, ভাসতে ভাসতে কোথায় চলে গেছে, আবার মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে রক্তাঞ্চলও হয়েছে। এক বন্ধুকে হাওড়া স্টেশনে পৌছে দিতে গিয়ে শক্তি নিজেও ট্রেনে চেপে বসল একবার, তারপর নিরুদ্ধিষ্ঠ হয়ে গেল। কয়েক মাস পরে আমি আর সন্দীপন শুকে খুঁজতে গেলাম চাইবাসায়। এখন সোন্তুন হয় যেন গঁজের মতন। শক্তির এ ধরনের আচরণকে অনেকে দায়িত্বান্তরীণতা বলে বকুনি দিয়েছে। কিন্তু ওই কয়েক মাসে শক্তি যে কবিতাগুলি লিখেছে, তা যে-কোনও সাহিত্যে অমর হয়ে থাকার যোগ্য। সাবধানী, একটুমুগ্ধ সংসারী, নিরিঘংজীবন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্য নয়, মানুষ তো জীবনে বিভিন্ন রকম পরিপূর্ণতা খোঁজে, কবিতার মধ্যে ডুবে থাকাই শক্তির পরিপূর্ণতা।

পরিণত বয়েসে বিদেশ ঘুরে এসে শক্তি প্রায়ই বলত, এখন আমার খুব বাঁচতে ইচ্ছে হয়। যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব? এই কিন্তুটা বেশ জোরালো হয়ে উঠেছিল। প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে বলতে শুরু করেছিল, না, এখন যাব না, কিছুতেই যাব না। যখন সে এইরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখনই হঠাতে এ কী হয়ে গেল আজ ভোরে?

ভেবেছিলাম কিছুই লিখতে পারব না, তবু এই তো অনেকটা লেখা হয়ে গেল। মাঝে মাঝে অতীত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ফেলেছি? শক্তি এখনও শুয়ে আছে বরফ ঘরে, কিন্তু সে শক্তি নয়, শক্তি-হীন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের দেহ...

শক্তি নেই?

শক্তির কবিতা

আমার সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে শক্তি বলেছে যে, কবিতা লেখার ব্যাপারে ও আমাকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়! শক্তির আমাকে ভয় পাবার তো কোনও কারণ নেই। একমাত্র আমাকেই বা কেন? এ কথাটা ও ঘোঁকের মাথায় বলে ফেলেছে। ওর মধ্যে এক এক সময়, নানা ধরনের ঘোঁক ঝুঁড়ে বসে—আমার সম্বন্ধে ওই কথাটিও এক ধরনের ঘোঁক মাত্র।

তা ছাড়া, কবিতা লেখাটা তো প্রতিযোগিতা নয়। এখানে কেউ ফার্স্ট হয় না, সেকেন্ড হয় না। একজন কবি সারাজীবন লেখার পরে তার মূল্যায়ন হয়। জীবিত অবস্থায় কোনও কবি কারও থেকে বড় নয়, ছেট নয়। প্রত্যেকেই আলাদা। একসময় শক্তি ও আমাকে 'কৃত্তিবাস-গোষ্ঠী'র বলে চিহ্নিত করা হয়। আসলে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সেইসব হইহই দিনগুলো, কবিতা পাঠ, একসঙ্গে ঘোরাফেরা এসবের জন্যই গোষ্ঠী কথাটি চলে এসেছে। কিন্তু কবিতা লেখার ক্ষেত্রে শক্তি ও আমি সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের দু'জনের স্বভাবেও অনেক অলিল, তবু কোথাও একটা নিবিড় যোগসূত্রও আছে বোধহয়।

শক্তি যেভাবে কবিতায় শব্দ ব্যবহার করে, সেরকমভাবে আর কেউ পারে না। একেবারে ম্যাজিকের মতো শব্দ ব্যবহার শক্তিকে বলা উচিত শব্দের প্রভু। আমার কবিতা অনেক সময়েই বিষয় নির্ভর শক্তির কবিতা প্রধানত ধ্বনি নির্ভর। প্রত্যেকটি শব্দ অন্য একটি শব্দের পাশে তার চরিত্র বদলে ফেলে, ধ্বনিত এই মায়া জগতে শক্তি নিমজ্জিত। এই জন্যই ওর কবিতা আমার খুব প্রিয়।

প্রত্যেক কবির কাছেই কোনও বিশেষ শব্দ বা বিষয় প্রিয় হয়ে ওঠে। শক্তির কবিতায় পাথর শব্দটি প্রচুর এসেছে। আসছেও। তবু ওর কবিতায় শব্দটি কখনও পৌনঃপুনিকতা-দৃষ্ট নয়। পাথরকেও নানাভাবে কবিতায় ব্যবহার করেছে। এরকম আরও কিছু কিছু বিশেষ শব্দকে ও ইচ্ছেমতন ঘোরায় ফেরায়।

মনে আছে, 'সুবর্ণরেখার জন্ম' নামে শক্তি একটি কবিতা লিখে আমাকে পড়িয়েছিল—একেবারে আমাদের প্রথম লেখালেখির সময়ে, কবিতাটি ভাল লাগে, কৃত্তিবাসে ছাপাই। একেবারে গোড়ার দিকে শক্তি গল্প উপন্যাস লিখত, তারপর আসে কবিতার জগতে। ওর প্রথম দিকের কবিতার মধ্যে জীবনানন্দের প্রভাব ছিল অল্প বিস্তর। ওর 'অনন্ত নক্ষত্রবীৰি' পড়ে আমি ওকে সে কথা বলেছিলুম। অবশ্য সে সময় জীবনানন্দ আমাদের অনেককেই আচম্ভ করেছিলেন। ক্রমে শক্তি একেবারে নিজস্ব স্টাইল ও নিজস্ব শব্দে কবিতাকে নিবিড় করে ধরে ফেলে।

শক্তির কবিতায় আর একটা আশ্চর্য গুণ হল বক্তব্যের দিকে মনোযোগ না দিয়ে

শক্তি কাব্যসুবিমা নির্মাণের ব্যাপারেই বেশি নিমগ্ন, তবু শক্তির কবিতায় নরম সরম
কাব্য কাব্য ভাব নেই, ওর প্রত্যেকটি কবিতাই জোরাল। প্রতিটি লাইনে ঝকঝকে
ধার। কোনও কবিতাতেই বাহল্য নেই, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টানটান বাঁধ। স্বভাব
কবির মতন শক্তি লিখতেও পারে অজ্ঞ, আমাদের অজ্ঞ বয়েসে শক্তি এক একদিনে
পাঁচ-সাতটা কবিতা লিখেছে, কিন্তু ওর কোনও কবিতাই দুর্বল নয়, শুরু ব্যবহারে
কোথাও ভুল নেই। এতগুলো বছর ধরে শক্তি ওর জীবনটাকেই মিশিয়ে দিয়েছে
কবিতার মধ্যে।

ওর জীবন যাপনের অতর্কিত অভ্যাসের মতোই কবিতার মধ্যে নতুন বাক্যবক্ষের
আকস্মিক ব্যবহার পাঠক হিসেবে আমাকেও চমকে দেয়। শক্তির বেশ কয়েকটি
কবিতা পড়ে আমার মনে হয়েছে, আহা, আমি যদি এরকম লিখতে পারতুম!

খেলাছলে দিনগুলি

শক্তির প্রসঙ্গে কিছু বলতে গেলে আমরা অনেকেই ফিরে যাই আমাদের প্রথম যৌবনের দিনগুলিতে। নানা দুরস্তপনার কথাই বেশি মনে পড়ে। শক্তি আপাদমন্ত্রক কবি, কিন্তু তার কবিতা সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা হয় না, তার জীবনের রোমহর্ষক ঘটনাবলীর কথাই এসে পড়ে অনবরত। অবশ্য কবিতা সম্পর্কে ভাল লাগা—মন্দ লাগা ছাড়া আর কীই বা বেশি বলা যায়। সমসাময়িক বা সমবয়েসি কবি-লেখকদের পারস্পরিক রচনার বিশ্লেষণ করার রেওয়াজ নেই। অরূপ বয়েসে আমরা নিজেদের সকলের লেখা যেমন মন দিয়ে পড়তাম, বিনা দ্বিধায় পরিষ্কার মতামত জানাতে দ্বিধা করতাম না, এখন আর তা সম্ভব নয়। সহজে অন্যের রচনার বিষয়ে মুখ খুলি না। কেউ কেউ অন্য কারুর লেখা পড়েই দেখে না। জীবন এই ভাবেই বদলায়।

বৃদ্ধদেব বসু এক জ্ঞানগায় বলেছিলেন যে, ~~সন্ম~~ কৈশোর-উত্তীর্ণ বয়েসে ছুটির দুপুর কাটাবার জন্য অলস ভাবে যে কিছু কিছু কবিতা লিখেছি, পরবর্তী কালে পশ্চিত-গবেষকরা যে সেই সব কবিতা নিয়ে সাথা দামাবেন, তা কে জানত ! শক্তিও মাঝে মাঝেই বলত, ভাগিস কবিতা লিখেছিলুম, তাই তো এত কাণ্ড হল ! মন-মন কাজে এমনিই তো কবিতা লিখতে শুরু করেছিলুম, ভবিষ্যতে কী হবে, কিছুই তো ভাবিনি !

সত্ত্বাই তাই, শুরু হয়েছিল প্রায় খেলাছলে। অনেকে যখন বলে, কবিতা লিখতে হয় বুকের রক্ত দিয়ে, কিংবা কবিতা লিখে সমাজটা বদলে দিতে হবে কিংবা কবিতা লিখে যেন সাত পুরুষকে ধন্য করে দেওয়া হয়েছে, তখন আমার গোপনে হাসি পায়। আমরা তো সে রকম কিছুই ভাবিনি। আমরা শুরু করেছিলাম, প্রায় বলতে গেলে, বছুত্তের টানে। অস্তরালে কোনও কোনও নায়ী ছিল হয়তো, কিন্তু প্রথম দিকে তা খুবই গোপন। এই তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ধূতি আর শার্ট পরা কুড়ি-বাইশ বছরের শক্তি, মুখে দাঢ়ি, ঘন ঘন বিড়ি খায়, কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে অন্য একটা দলের সঙ্গে বসে থাকে, কীসব গদ্দ-টদ্দ লেখে। আমরা ‘কৃষ্ণবাস’ পত্রিকা প্রকাশের পর শক্তির টেবিল বদলাল, একদিন লাঞ্জুক মুখে একটা চতুর্দশপদী লিখে এনে শোনাল।

আরও দেখতে পাচ্ছি দেশবন্ধু পার্কের আজ্ঞা, খুবই পবিত্র ও সুকুমার দশ-বারোটি ছোকরা, নেশা বলতে শুধু সিগারেট টানা, আর কোনও কোনওদিন অঙ্ককার গাঢ় হলে জামা-কাপড় খুলে, উদোম হয়ে ওই পার্কের পুকুরে কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে নেওয়া। কারুরই বাড়িতে আলাদা কোনও বৈঠকখানা ছিল না, তাই দেশবন্ধু পার্কের আজ্ঞায় বিকেলের আলো স্নান হবার আগে কেউ কেউ পকেট থেকে ভাঁজ করা কাগজ বার করে একটা-দুটো কবিতা পড়ে শোনাত। যেদিন আমার কবিতা

নেই, সেদিন অন্যদের কবিতা শুনতে শুনতে মনে হত, আজই বাড়ি ফিরে রাত্রে কিছু একটা লিখে ফেলতেই হবে। একজনের কবিতা আর একজনকে প্রেরণা দেয়, যদিও দু' জনের কাব্যভাষা একেবারে আলাদা।

ঘরোয়া আড়ায় কবিতা পড়ার সময় শক্তি বরাবরই লাঞ্ছুক ছিল। আমরা সবাই তাই। যা লিখছি তা সত্যিকারের কবিতা হয়ে উঠছে কিনা তা নিয়ে সৎস্থায়। এখন যখন মাঝে মাঝে শুনি, কেউ কেউ নিজের মুখেই বলে, আমি একটা দারুণ কবিতা লিখেছি, কিংবা আমার এই লেখাটা একেবারে নতুন ধরনের, তখন অবাক হই। আমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেউ এই ধরনের কথা বললে তাকে নির্ঘাত গণ-চাঁচি খেতে হত! শক্তি একই দিনে দু'-তিনটে কবিতা লিখে আনত। ও প্রথমে কেন গদ্দের দিকে গিয়েছিল জানি না, শক্তির ভেতরে অনেক কবিতা জমে ছিল, কাব্য-আঙ্গিকও তৈরি হয়ে গিয়েছিল আগেই, সে জন্য শক্তিকে হাত মকশো করতে হয়নি, অনর্গল চমৎকার কবিতা লিখে গেছে। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের প্রথম দিকে অনেক দুর্বল কবিতা আছে, কিন্তু শক্তির সে রকম দুর্বল কবিতা একটাও নেই।

কবিতা লেখার সঙ্গে পাঠক-আকর্ষণ করার কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। একজন নতুন কবির রচনা অন্যান্য কবিদের কীরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। খেলাচ্ছলে শুরু করা এই যে আমাদের কবিতা, কৃতিবাস এবং সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকায় তার দাপাদাপি স্থানে অগ্রবর্তী কবিরা বেশ যেন বিচলিত বোধ করেছিলেন। তাতে আমরা বেশ মজা পেয়েছিলাম। শক্তি সেই মজাটাকে অনেকদূর টেনে নিয়ে যায়। স্মাকসবি ফারমার না ওই ধরনের কী যেন একটা কোম্পানিতে অ্যাপ্রেটিস হয়ে চুকেছিল শক্তি, ধার করা প্যাট-কোট পরে অফিস যাওয়া-আসা শুরু করেছিল সবেমাত্র, একদিন সে সেই পোশাক খুলে ফেলে বলল, দূর ছাই। আমাদের মধ্যে শক্তির প্রথম বা একমাত্র যে পোশাক খুলেছে। ঠিকই করে ফেলল, কবিতাই লিখবে শুধু, আর কিছু না!

এত বড় ঝুঁকি আর কেউ নেয়নি, এ এক সাংঘাতিক জুয়া খেলা। নিজের জীবনটাকেই শক্তি বাজি ফেলল। যদি দৈবাং কোনও দুর্ঘটনায় ওর কলম শুকিয়ে যেত, তা হলে ওর স্থান হত কোথায়? আস্তকেন্দ্রিকতার চরমে পৌছতে হয়েছিল ওকে, মা-ভাই-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-বন্ধু-পরিজনের কথাও কখনও কখনও মুছে ফেলতে হয়েছিল মন থেকে। এ জন্য শক্তিকে অনেক উন্মুক্তিও করতে হয়েছে, কিন্তু সব পরাজয়ের প্রতিশোধ খুঁজেছে কবিতায়। পাহাড়ের ভয়ংকর খাদের পাশ দিয়ে হেঁটে গেছে শক্তি, যে কোনও মুহূর্তে মরণ-বাঁপ দিতে পারত, কিন্তু সে উঁচু দিকেই গেছে, মাঝে মাঝে পথ হারিয়ে শূরুপাক খেয়েছে বটে, তবু নেমে আসেনি, সেইখানেই তার জয়। পেছনে ফেরার রাস্তাই সে ভুলে গিয়েছিল।

'কমলা-কাঞ্চনে ভরা মোসল বাজার
স্বপ্নের ভিতরে, পথে অসংখ্য হোঁচট খায় চাঁদ
রাত্রিবেলা
পেছনে যাবার রাস্তা নেই...'

শক্তিকে আমি কখনও ঈর্ষা করিনি। ঈর্ষা প্রবৃত্তিটাই বোধহয় আমার মধ্যে খুব কম। সে জন্যও অনেকে রাগ করে। একমাত্র প্রেমের ক্ষেত্রে ছাড়া, খ্যাতি-ফ্যাশনের মতন তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ঈর্ষা করা আমার মতে ছেটলোকি ব্যাপার। নারী-ঘটিত কারণে শক্তির সঙ্গে আমার কখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি, শক্তির আবার ওই প্রবৃত্তিটা কম। শক্তির কবিতার স্টাইল আমার প্রথম থেকেই খুব পছন্দ, যদিও আমি নিজে সে রকম লিখি না। ‘শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম’, এ রকম লাইন আমি লিখেছি, কিন্তু নিজের কাছে এ প্রতিশ্রূতি রক্ষা করিনি, অন্য দিকে চলে গেছি। ওই লাইনটি বরং শক্তির ক্ষেত্রে সত্য। ভয়ংকর খাদের কিনারা ধরে হেঁটে যাওয়া, আমিও দু-একবার গেছি অবশ্য, কিন্তু শক্তির মতন অত দীর্ঘদিন ধরে আমার সাধ্য ছিল না। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে শক্তি মাঝে মাঝে দূম করে যে স্বর্গীয় পাগলামি নিয়ে আসে, তা আমার আয়ন্তের বাইরে। শক্তি এমন কিছু কিছু জিনিস পারে, যা আমি পারি না। অবশ্য, আমিও এমন দুটো-একটা ব্যাপার পারি, যা শক্তি পারবে না!

বেশ কয়েকটা বছর একসঙ্গে চলার পর আমি বুঝে গিয়েছিলাম, শক্তির পাশাপাশি আমি অনবরত পাহাড়ে ঢুকতে পারব না, আমাকে কিছুদিন মরুভূমির ভেতর দিয়ে যেতে হবে, রাশি রাশি বালি সরিয়ে খুঁজতে হবে জল। আমি সরে গেছি, নিজের কাছে এই হার মানা স্বীকার করে নিয়েছি, সুতরাং ঈর্ষার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। অনেকেই একসঙ্গে শক্তি-সুনীল বা সুনীল শক্তি নাম দুটি উচ্চারণ করে, শুধু শক্তি আর আমার কবিতা নিয়ে এক সময়ে বেরিয়েছিল ‘যুগলবন্দী’, পরে বেরিয়েছে ‘সুন্দর রহস্যময়’। কিন্তু গদ্যের জগতে আমাকে এত দাপাদাপি করতে হয়েছে যে, কবিতার কাছে আমি সম্পূর্ণ হৃদয় সম্পর্শ করতে পারিনি, আর শক্তি গদ্য থেকে একেবারেই সরে গিয়ে কবিতাকেই করেছে হৃদয়েশ্বরী। দূর থেকে আমি মুক্ষ হয়ে দেখেছি শক্তির বিপজ্জনক আরোহণ, শক্তি পেরে যাচ্ছে দেখে আমার শিহরন হয়েছে।

মাঝে মাঝে মরণ বাঁপ দেবার জন্য ভয় দেখিয়ে শক্তির খলখল হাসি, ওঃ তা কি ভোলা যায় কখনও? যেন সে আমার দিকেই তাকিয়ে হেসেছে। আমি হাত তুলে ব্যাকুল ভাবে বলেছি, না, না, ঝাঁপিয়ো না শক্তি, অন্যদিকে ফেরো। তোমার না পারাটা আমারও ব্যর্থতা।

শক্তির প্রতি ভালবাসা আমার বরাবরই আছে। মনে হয়, শক্তিও তা জানে। শুধু একটাই ভুল হয়ে গেল। শক্তি বরাবরই বলত, ও আমার থেকে বেশি দিন বাঁচবে, আমিও তা মেনে নিয়েছিলাম। সেটা কি শুধু কবিতায় বেঁচে থাকা, শারীরিক ভাবেও নয়? এটা একেবারেই ঠিক হল না!

যদি

দে গুরুর গা ধূইয়ে।

আমি একেবারে সর্বাঙ্গে চমকে উঠলাম। প্রচণ্ড হংকার দিয়ে কবি গা-ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে স্বাভাবিক চোখ মেলে তাকালেন। তারপর বিরক্তি মেশানো গলায় বললেন, ‘এ কী—এত মালা-টালা দিয়ে এমন জবরং করে সাজিয়েছ কেন আমায় ? কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে আমায় বলি দেবে নাকি ? এত বেলা হল, চা-টাও দেয়নি, খিদে পেয়ে গেছে। কালী কুল দে মা, নুন দিয়ে থাই। ওরে, চা-টা দিবি নাকি ?’

‘আমার তখন আনন্দবিশ্বয়ে চূড়ান্ত অবস্থা।

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম এইমাত্র জ্ঞান ফিরে সুস্থ হয়ে উঠলেন, আমারই চোখের সামনে। তাঁর চোখে-মুখে আগেকার সেই বিখ্যাত তেজ ও উজ্জ্বলতা। সারা দেশের লোককে এ সুসংবাদ আমিই প্রথম জানাব, এই আনন্দে আমারই তখন উশ্চাদ হয়ে যাবার মতন অবস্থা।

কবির জ্ঞান ফিরে আসবার পর প্রথম ইন্টারভিউ ছাপাবার কৃতিত্বও আমার।

কবি এখন হাসিমুখে গলা থেকে ফুরেরি মালাগুলো খুলে ফেলেছেন এবং গুণ্ণন করে গান করছেন—‘বাগিচায় বুলবুলি শুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল’—সেই ভরাট প্রাণবন্ত কষ্টস্বর। আমি প্রক্ষেপ থেকে খাতা-পেশিল বার করছিলুম, তিনি আমাকে এই প্রথম লক্ষ করে ধমকে বললেন, ‘এই ছোঁড়া, তুমি এখানে কী করছ ? আঁ ?’

আমি থতমত খেয়ে বললুম, ‘কিছু না, মানে, আপনার একটা অটোগ্রাফ নিতে এসেছি, আর যদি দু’ লাইন কবিতা লিখে দেন।’

‘এখন হবে না, যাও ভাগো। অটোগ্রাফ দিতে দিতে হাত ব্যথা হয়ে গেল, আবার কবিতা... হবে না, অটোগ্রাফ নেবে তো মেয়েরা, তোমার দরকার কী হে ? এখন সময় নেই !’

আমি তবু চুপ করে বসে রইলুম। নজরুল আপন মনেই বললেন, ইস, এত দেরি হয়ে গেল ! নেপেনকে নিয়ে পশ্চিতেরি যাবার কথা ছিল, শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করব—’

আমি ভয়ে-ভয়ে বললুম, ‘নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলছেন ?’

‘হ্যাঁ। চেন নাকি ?’

‘আজ্ঞে চিনি। কিন্তু তিনি বেঁচে নেই। শ্রীঅরবিন্দও—’

‘আঁ, নৃপেন বেঁচে নেই ? কী বলো ? কবে মরল ? আমি তখন কোথায় ছিলাম ?’

কবির গলায় অসহায় আর্তনাদ ফুটে উঠল। মানুষকে দুঃখের খবর শোনাবার

অভ্যেস আমারও নেই। আমিও খানিকটা অসহায় বোধ করতে লাগলুম। তবু মনুষরে বললুম, ‘আপনি একটানা অনেকদিন ঘূর্মিয়ে ছিলেন। অনেকদিন। এর মধ্যে অনেক কিছু বদলে গেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে—’

‘হয়েছে? গেছে সাহেব ব্যাটারা? কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙ্গেছে? সত্যি? তা হলে তো ফুর্তি করতে হয় একটু আজ। পশ্চিমের থাক, তা হলে আজ অচিন্ত্য আর প্রেমেনকে ডেকে একবার ঢাকা ঘূরে আসি। ওখানে বুদ্ধদেব আছে—’

আমি বললাম, ‘বুদ্ধদেব বসু ঢাকা ছেড়েছেন বছদিন। তা ছাড়া পাকিস্তান—’

‘পাকিস্তান? ইকবালের সেই পাকিস্তান? হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ! জিম্মা-গাঞ্জীজীর ঝাগড়া আজও মেটেনি?’

‘ঝাগড়া মিটেছে কিনা জানি না, তবে ওঁরা কেউই আর ইহলোকে নেই।’

‘নেই? তবে পাকিস্তান কীভাবে?’

‘পাকিস্তান ওঁরা বেঁচে থাকতেই হয়ে গেছে। পূর্বে বাংলা পশ্চিমে পাঞ্চাব আর সিঙ্গু নিয়ে পাকিস্তান হয়েছে অনেকদিন আগে। গত বছর ওদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধও হয়ে গেল।’

‘যুদ্ধ হয়ে গেল মানে? পূর্ব-বাংলার সঙ্গে পশ্চিম-বাংলা যুদ্ধ করবে? চালাকি পেয়েছ? তুমি কে হে ছোকরা? সত্যি করে বলো তো, ব্রিটিশের স্পাই নও তো?’

আমি বিষণ্ণ হেসে বললুম, ‘পূর্ব-বাংলার সঙ্গে আমাদের হাতাহাতি যুদ্ধ হয়নি বটে, কিন্তু এটা এখন একটা আলাদা দেশ। এখানকার সঙ্গে এখানকার যাতায়াত বন্ধ। এখানকার বই ওরা পড়তে পায় না। ওদের বইও আমরা পাই না।’

‘এরা আর ওরা? তুমি এখানে থেকে ভাগো তো। যত সব মিথ্যে কথা শোনাতে এসেছ। আমি আজকের ট্রেনেই ঢাকা যাব, দেখি কে আমায় আটকায়! আমি, জসীমউদ্দিন, গোলাম মুস্তাফা, প্রেমেন, শৈলজাকে সঙ্গে নিয়ে যাব, ওখান থেকে অজিত, পরিমল, মোহিতলালকে সঙ্গে নিয়ে ফিরব, দেখি কে কী করে। তুমি এখন সরে পড়।’ আমি বললুম, ‘আপনি আমার ওপর অকারণে রাগ করছেন, কিন্তু কথাগুলো সত্যি। আপনি যে ট্রেনে চাপবেন, সে-রকম সরাসরি কোনও ট্রেনই চলে না আজকাল আর। ওদেশের সঙ্গে আমাদের দেশের যোগাযোগ সত্যিই একেবারে বন্ধ। আর যাঁদের নাম করছেন, তাঁরা অনেকেই দেশ বদলেছেন। অবশ্য আপনি যদি যেতে চান, তা হলে দুই সরকারের মধ্যে লেখালেখি করে আপনার জন্য একটা কোনও বন্দোবস্ত...।’

কবি এবার খানিকটা হতাশ চোখে তাকালেন। দীর্ঘনিশ্চাস ফেলে বললেন, ‘এতদিন সত্যিই ঘূর্মিয়ে ছিলুম। তুমি শুধু আমায় খারাপ খবর শোনাচ্ছ। ভাল খবর কিছু নেই?’

আমি চিন্তিতভাবে বললুম, ‘ভাল খবর? হ্যাঁ, মানে, এই তো দুর্গাপুরে বিরাট ইস্পাত কারখানা হয়েছে, কলকাতায় অনেক বড় বড় বাড়ি উঠেছে—’

তাকিয়ে দেখি কবি আবার অবসন্নভাবে হেলান নিয়ে কীসব বিড়বিড় করতে-করতে হাত দিয়ে ফুলগুলো ছিড়ছেন।